দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোরালো কিআ

আগস্ট ২০১৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২২, পঞ্চাশ টাকা
বর্ষ ২ ● সংখ্যা ১১

সত্যিকারের স্বপ্ন দেখো

এ পি জে আবদুল কালাম তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। শিক্ষক একটা পাখি এঁকে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কালাম, কখনো কি উড়তে পারবে এই পাখির মতো?' সেই থেকে ছোট্ট কালামের মনে একটা স্বপ্ন বাসা বাঁধল। আকাশে ওড়ার স্বপ্ন। স্বপ্ন সত্যি করার জন্য অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারের সন্তান আবদুল কালাম। খবরের কাগজ বিক্রি করতে শুরু করেছিলেন মাত্র আট বছর বয়সে। হতে চেয়েছিলেন যুদ্ধবিমানের পাইলট। শেষমেশ হয়েছিলেন রকেটবিজ্ঞানী। ভারতের প্রথম মহাকাশযান তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা ছিল তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমের এই মানুষটির।

২০০২ সালে ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন কালাম। হয়ে ওঠেন 'জনতার রাষ্ট্রপতি'। গত ২৭ জুলাই ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলং শহরের একটি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন বহু পরিচয়ে পরিচিত এই কীর্তিমান। ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে এসে তিনি বলেছিলেন, 'সব সময় জীবনের অনেক বড় লক্ষ্য রাখব। মনে রাখব, ছোট লক্ষ্য অপরাধের সমান।'

তোমরাও নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখো। স্বপ্ন দেখতেন এ পি জে আবদুল কালামও। স্বপ্নের আশ্চর্য সুন্দর অর্থটাও বলে গেছেন তিনি, 'ঘুমের মধ্যে যেটা দেখো সেটা স্বপ্ন নয়, যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না সেটাই স্বপ্ন।' অতএব স্বপ্ন দেখা বন্ধ করো না; সেই স্বপ্নটাই দেখো, যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেবে না!

ভালো থেকো সবাই।

কিআ

সম্পাদক : আনিসুল হক
নির্বাহী সম্পাদক : সিমু নাসের
সম্পাদনা দল : আদনান মুকিত, মহিতুল আলম
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা : রশিদুর রহমান সবুর
বিপণন ব্যবস্থাপনা : এ বি এম জাকারিয়া
মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : শামসুল হক
গ্রাফিকস : মনিরুল ইসলাম
প্রচ্ছদ : সাদাত

প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রোফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ কর্তৃক মুদ্রিত। যোগাযোগ : কিশোর আলো, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১। ফ্যাক্স : ৯১২১০৫২।
ই-মেইল : editor@kishoralo.com, ফেসবুক : facebook.com/kishor.alo

পরিবেশক : প্রথমা ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

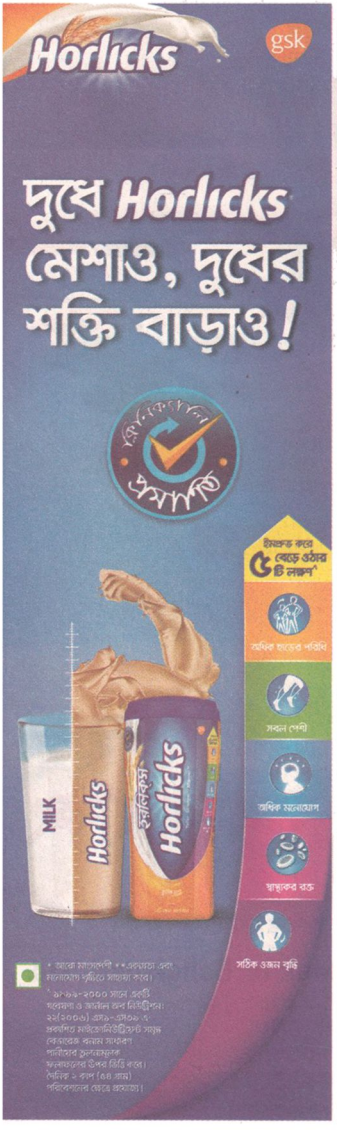

সূচিপত্র

৩৯

প্রচ্ছদ রচনা
২২ আবদুল্লাহ মামুর : ৩০ বছরে তিন গোয়েন্দা
৩৯ রকিব হাসান : তিন গোয়েন্দার তিরিশ বছরে

বিশেষ গোয়েন্দা গল্প
৪২ রকিব হাসান : ভুট্টা খেতের ভূত

সাক্ষাৎকার
৫১ রকিব হাসান, লেখক

কিশোর কবিতা
১৫ সিকদার নাজমুল হক : ঘরছাড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস
৭৪ মুহম্মদ জাফর ইকবাল : তিতুনি এবং তিতুনি

ধারাবাহিক কমিকস
১০২ শাহরিয়ার : সোমোর মঙ্গল অভিযান

গল্প
১১৬ আনিসুল হক : বুবলিদের এক বিকেল
১০৮ মেহেদী হক : শিকারী লুলেং

শুদ্ধ বলি শুদ্ধ লিখি
১৬ আখতারুজ্জামান আজাদ : আমরা যারা 'পরা' ও 'পড়া'কে গুলিয়ে ফেলি

১০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

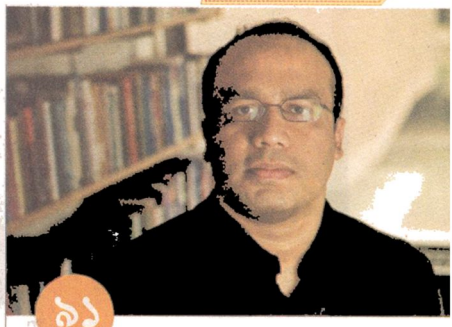

৯১

বাংলার বিজ্ঞানী
৯১ মুনির হাসান : অধরা কণার বিজ্ঞানী
জাহিদ হাসান

গুণীজন
১১২ সুফিয়া কামাল—সবুজ দ্বীপের মতো

অর্থনীতি
৭২ শওকত হোসেন : শায়েস্তা খাঁর এক টাকা

ইতিহাস
১৮ আবুল বাসার : হিরোশিমা ট্র্যাজেডি
মানবতার লজ্জা

মহাকাশ
১১৪ নিউ হরাইজনের যাত্রাচিত্র

প্রয়াণ
৬৯ আর্চি-ভেরোনিকা-বেটি আছে টম নেই

চলচ্চিত্র
৯৬ ওয়াহিদ ইবনে রেজা : আমিও কাজ করি
হলিউডে

গেম রিভিউ
৮৯ ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানস : যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

৮৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

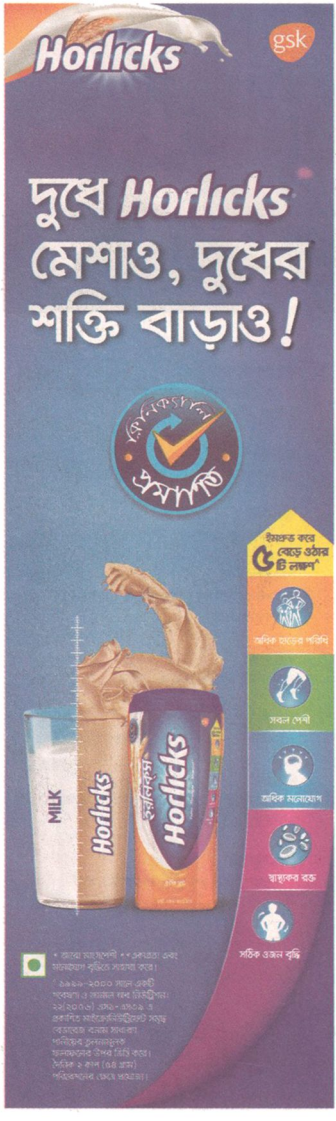

সূচিপত্র

১২১

সংগীত
৮৪ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র

শখের দুনিয়া
৮৬ স্কেল মডেলিংয়ের ছোট দুনিয়ায়

জেনে রাখা ভালো
১০০ ফল আর সবজির মধ্যেপার্থক্য কী?

দেশে দেশে
১০৬ বেলুন উৎসব

খেলা
১২১ নাইর ইকবাল : ঐ নূতনের কেতন ওড়ে

নিয়মিত বিভাগ
৮ চিঠিপত্তর ১০ লেখালেখির ভুবন
১১ বিনোদন ১২ এ মাসে
১৭ বিজ্ঞানের টুকিটাকি ৬৪ আমরা সবাই রাজা
৭০ এসো নিজে করি ৮২ পড়তে পারো
৮৩ মনোবন্ধু ৮৮ স্কুলের তারকা
১১৮ খেলা ১২৪ কুইজ ১২৮ অরিগ্যামি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় কিআ ভাইয়া

আমি চাই কিআতে ঘোড়া সম্পর্কে কিছু ছাপা হোক। ঘোড়া দেখতে কোন রঙের, ঘোড়ার বাচ্চা কোথায় কিনতে পাওয়া যায় তার ঠিকানা, ঘোড়ার বাচ্চার কত দাম হবে, কত বড় হবে—সবই যেন থাকে। তোমরা তো প্রাণী সম্পর্কে অনেক কিছুই ছাপো, ঘোড়া সম্পর্কেও কেন ছাপাবে না? আর হ্যাঁ, বিড়াল সম্পর্কেও কিছু ছাপাবে। আমি কিন্তু বিড়ালের ভক্ত। বিড়াল কী রঙের, কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, বিড়ালের বাচ্চা জন্মের কয় মাস পর থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়—এগুলো ছাপাবে।

মির্জা সামিত
পঞ্চম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর মডেল কলেজ, ঢাকা।

কিআ : ঘোড়া পাওয়া যায় দাবার বোর্ডে। বড় বোর্ড হলে বড় ঘোড়া, আর ছোট বোর্ডে ছোট ঘোড়া—মানে ঘোড়ার বাচ্চা আরকি! তবে তোমার বাকি প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে হলে একটা 'ঘোড়াসংখ্যা' আর একটা 'বিড়ালসংখ্যা' বের করতে হবে। আপাতত তোমার বাসার আশপাশে যে বিড়ালছানাগুলো আছে, সেগুলো পুষতে থাকো। আমরা দেখি ঘোড়া কোথায় কিনতে পাওয়া যায়!

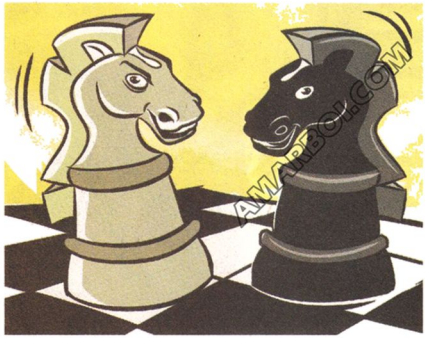

প্রিয় কিআ ভাইয়া

জুলাই মাসের কিশোর আলোর আমরা সবাই রাজা বিভাগে 'ছোট ভাইয়ের বিপদ' গল্পটি আমার লেখা। কিন্তু ভুলবশত সেখানে অন্য কারও নাম ছাপা হয়েছে।

কান্তাময়ী স্নেহা
নবম শ্রেণি, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।

কিআ : এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'ছোট ভাইয়ের বিপদ' গল্পটি লিখেছে কান্তাময়ী স্নেহা। আমরা আমাদের ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

প্রিয় কিআ ভাইয়া

আচ্ছা, আমরা যারা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় থাকি, তারা কি কিআ বুক ক্লাব গঠন করতে পারব? যদি করি, তবে কি আমাদের বুক ক্লাবের কথা কিআতে ছাপা হবে?

রাশিদ আরিফ
গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

কিআ : বিশ্বের যেকোনো স্থানেই কিআ বুক ক্লাব গঠন করা যাবে। এ বিষয়ে রাষ্ট্র বা সমাজের কোনো বাধা নেই। তবে শুধু খুলে বসে বসে চানাচুর খেলেই হবে না, বই পড়াসহ বিভিন্ন কার্যক্রমও থাকতে হবে। বুক ক্লাব খুলে ক্লাবের কার্যক্রমের বিস্তারিত খবর পাঠিয়ে দাও আমাদের ঠিকানায়।

প্রিয় কিআ ভাইয়া

কিশোর আলোর একটি ওয়েবসাইট থাকলে খুব ভালো হতো। তাহলে আমার মতো যারা ফেসবুক ব্যবহার করে না, তারাও বিভিন্ন আপডেট পেত এবং মিটিংয়ে যাওয়ার রেজিস্ট্রেশন করতে পারত। আর ভাইয়া, কিআ থেকে একটি সাইকেল র‌্যালির আয়োজন করা যায়?

আলিসা জাওয়াদ
নবম শ্রেণি, উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।

কিআ : তা তো ভালো হতোই। চিন্তার কোনো কারণ নেই, ওয়েবসাইটের কাজ মহাসমারোহে চলছে। অচিরেই ওয়েবসাইটের শুভমুক্তি হবে। আর তোমরা সবাই চাইলে সাইকেল র‌্যালিও করা যায়। আগে ওয়েবসাইটটা ঠিকমতো করে নেই, নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় কিআ ভাইয়া
বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমার আম্মু আমাকে চিঠি পাঠাতে দেয় না। তবু আমি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পোস্ট অফিসে চিঠি পাঠাতে যাই। তবু যদি তুমি আমার চিঠি না ছাপাও, তাহলে আম্মু ও আমি খুব মন খারাপ করব।

ইফতেখার আহমেদ
চতুর্থ শ্রেণি, মুকুল নিকেতন, ময়মনসিংহ।

কিআ : বৃষ্টি তো আর বন্ধ করা সম্ভব না, আমি বরং চিঠিটাই ছাপাই। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। তবে বৃষ্টিতে ভিজে চিঠি পাঠানোর দরকার নেই। ঠান্ডা-জ্বর তো আর কিশোর আলো বুঝবে না।

প্রিয় কিআ ভাইয়া
গত সংখ্যার কমিকসগুলো অনেক মজার ছিল। বিশেষ করে 'অলস পটল' কমিকসটি। এমন কমিকস আরও দিতে হবে।

ঐশ্বর্য
ষষ্ঠ শ্রেণি, পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, পাবনা।

কিআ : আচ্ছা। প্রয়োজনে আস্ত একটা কমিকস সংখ্যাই করে ফেলব। দেখি কত কমিকস পড়তে পারো!

প্রিয় কিআ ভাইয়া
আমি ভীষণ খুশি যে তুমি আমার কথা রেখেছ এবং গোয়েন্দা গল্প ছেপেছ। অনেক দিন পর রকিব হাসানের একটা গোয়েন্দা গল্প পেলাম। তুমি রকিব হাসান স্যারকে বলে দিয়ো, তিনি যেন কিআতে গোয়েন্দা গল্প লেখা বন্ধ না করেন।

মো. এহসানুল মাহবুব
অষ্টম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর।

কিআ : গত সংখ্যায় তো শুধু গল্প ছেপেছি, এবার রকিব হাসানের গল্প, সাক্ষাৎকার সবই থাকছে। ওগুলো আগে পড়ো। শুধু চিঠিপত্তর বিভাগে পড়ে থাকলে হবে?

প্রিয় কিআ ভাইয়া
তুমি 'জাফর ইকবাল' সংখ্যা বের করেছ। কিন্তু 'হুমায়ূন আহমেদ' সংখ্যা কিংবা 'আহসান হাবীব' সংখ্যা বের করোনি। যদি বের করতে, খুব খুশি হতাম।

নাজমুস সাকিব
শিবচর নন্দকুমার মডেল ইনস্টিটিউশন, মাদারীপুর।

কিআ : করব, করব। এত তাড়া কিসের? প্রবাদটি নিশ্চয়ই পড়েছ, 'সবুরে মেওয়া ফলে'।

প্রিয় কিআ ভাইয়া
তোমাদের ঈদসংখ্যা আমার খুব ভালো লেগেছে। এখানে আমার প্রিয় গোয়েন্দা সিরিজ দেওয়া হয়েছে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

তাশদীদ
কুইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

কিআ : ইয়ে...কী দরকার ছিল ধন্যবাদের? তোমরা দেখছি আমাকে বিখ্যাত না বানিয়ে ছাড়বে না!

প্রিয় কিআ ভাইয়া
আমার স্বপ্ন আমি বড় হয়ে ডাক্তার নইলে ক্রিকেটার হব। কিন্তু কোনটা হব ঠিক করতে পারছি না। একটু সাহায্য করবে?

নাদিম তানভীর
পঞ্চম শ্রেণি, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, ঢাকা।

কিআ : তুমি জাতীয় ক্রিকেট দলের ফিজিও হতে পারো। মাঠে থাকা আর ডাক্তারি—দুটোই করতে পারবে তাহলে।

তোমার চিঠি পাঠাও এই ঠিকানায়

চিঠিপত্তর, কিশোর আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। editor@kishoralo.com
ফেসবুক : www.facebook.com/kishor.alo

অলংকরণ : **জুনায়েদ**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম নিয়ে নয় দ্বিধা

Jeff Kinney. 'উইম্পি কিডস' সিরিজের জনপ্রিয় লেখক। লেখকের নামের উচ্চারণ কী হবে? জেফ কিনে, জেফ কাইনি নাকি জেফ কিনি? এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলে ঢুঁ মারো teachingbooks.net/pronunciations.cgi ঠিকানায়। ২০০৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ লাখ পাঠক লেখকদের নামের আসল উচ্চারণের জন্য বেছে নিয়েছে এই সাইটটি। হতাশ হয়নি কেউই। কদিন আগে দুই হাজার লেখকের নামের উচ্চারণের অডিও প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের এই ওয়েবসাইট। তবে আসল মজা অন্য জায়গায়; অডিওতে নামগুলো উচ্চারণ করেছেন স্বয়ং লেখকেরাই। ফলে কোনোরকম সন্দেহের অবকাশই নেই উচ্চারণ নিয়ে। কেবল উচ্চারণই নয়, ৫০ সেকেন্ড বা তারও কম সময়ের এই অডিওগুলোতে লেখকেরা জানিয়েছেন তাঁদের নামের ইতিহাস। কে নাম রেখেছিল, নামটা তাঁদের কতটা পছন্দ—এমন মজার সব বিষয়ও জানা যাবে সেখানে।
সূত্র : সিবিসিবুকস ডটকম

AMARBOI.COM

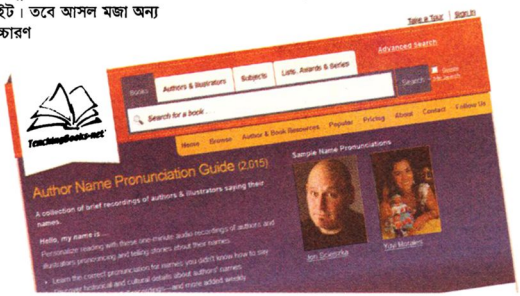

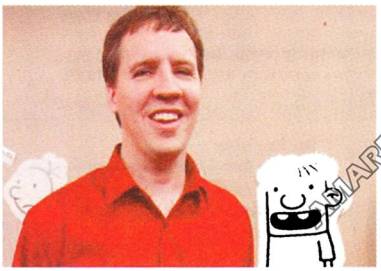

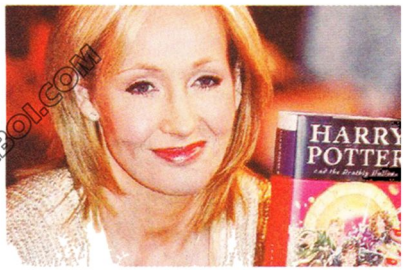

বেশি আয়ের লেখক

সম্প্রতি *ফোর্বস* ম্যাগাজিন দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি আয় করা লেখকদের তালিকা প্রকাশ করেছে। ১৫ জনের ছোট সেই তালিকায় শিশু-কিশোরদের জন্য লেখেন—এমন লেখকেরাও আছেন ওপরের দিকেই। তাঁদের মধ্যে জেফ কিনি ও জে কে রাওলিংয়ের নাম আমাদের অনেকেরই জানা। জেফ কিনির আয় বছরে আড়াই কোটি ডলার। ২০১১ সালে 'উইম্পি কিড' সিরিজের *ক্যাবিন ফেভার* বিক্রির তালিকায় ছিল সবার ওপরে। মোট বিক্রি হয়েছিল ৩৩ লাখ কপি! বইটি অবলম্বনে তৈরি করা হয়েছিল *ডগ ডেস* সিনেমা। মুক্তির পয়লা সপ্তাহেই সেটি আয় করেছিল দেড় কোটি ডলার! তালিকার ১১ নম্বরে জায়গা পেয়েছেন *হ্যারি পটার*-এর লেখক জে কে রাওলিং। বছরে ১৭ মিলিয়ন ডলার জমা হয় তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। হ্যারি পটার সিরিজ শেষ না হলে হয়তো অঙ্কটা আরও অনেক বেশিই হতো। তবে খুব শিগগিরই বড়দের জন্য লিখতে বসছেন এই লেখক। আর তার জন্যই অগ্রিম টাকা গুনে নিয়েছেন প্রকাশকদের কাছ থেকে। এ ছাড়া হ্যারি পটারকে নিয়ে ওয়েবসাইট 'পটারমোর' থেকে আসা আয়টাও মন্দ নয়। সূত্র : ফোর্বস ডটকম

'বড় রহস্যগুলো সব সময় লুকিয়ে থাকে সবচেয়ে অচিন্তনীয় জায়গায়!'
রোয়াল্ড ডাল, *চার্লি ইন দ্য চকলেট ফ্যাক্টরি* বই থেকে

প্রকৃত বন্ধুরা কখনোই কোনো কিছু চায় না।
উইলিয়াম পেনে ডু বয়েস
বিয়ার সার্কাস বই থেকে

গ্রন্থনা : **মাহফুজ রহমান**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনপ্রিয় টিভি রেসলিং শো 'ডব্লিউডব্লিউএফ'-এর বিভিন্ন রেসলারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের থিম সংয়ে গান গেয়ে মিডলে গান তৈরি করেছেন বাংলাদেশের কিছু তরুণ শিল্পী। গানগুলোয় ছিলেন পরাহো ব্যান্ডের রাহুল, ওউন্ডের রাতুল, পাওয়ারসার্জের জামশেদ ও সাবেক পাওয়ারসার্জ সদস্য সেজান। গানটি দেখতে পাবে তোমরা এই লিংকে : https://goo.gl/rlexIN

ইনফেক্টেটেডদের জন্য খুশির খবর। নতুন অ্যালবামের কাজ শুরু করেছে জনপ্রিয় আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ড আর্বোভাইরাস। অনেকগুলো গানই তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে! গানগুলো এই বছরই প্রকাশ করতে পারবে বলে আশা করছেন ব্যান্ডের সদস্যরা। তবে শুরুতে অ্যালবামের একটি গানের মিউজিক ভিডিও প্রকাশ পাবে কোরবানি ঈদের আগেই!

গেল জুলাই মাসে পাঁচ বছর পূর্ণ হলো জনপ্রিয় আইরিশ বয় ব্যান্ড ওয়ান ডিরেকশনের। এ উপলক্ষে গ্রুপের হ্যারি স্টাইলস টুইটারে ব্যান্ড-ভক্তদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ২০১০ সালে গানের রিয়েলিটি শো এক্স ফ্যাক্টরে গঠিত হয় ওয়ান ডিরেকশন। বিচারক সাইমন কোয়েল মূল ভূমিকা রাখেন এতে। গেল মে মাসে ব্যান্ডটির অন্যতম জনপ্রিয় সদস্য জায়ান মালিক ব্যান্ড ত্যাগ করেন। বর্তমানে হ্যারি ছাড়াও ব্যান্ডের বাকি তিন সদস্য হলেন লিয়াম, নিয়াল ও টমলিনসন।

AMARBOI.COM

'শার্লক' টিভি সিরিজ-ভক্তদের একটু চমকে দিতে এই ডিসেম্বরেই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ক্রিসমাস স্পেশাল একটি পর্ব। এখানে গোয়েন্দা শার্লক ও তার সহকারী ওয়াটসনকে দেখা যাবে ভিক্টোরিয়ান যুগের সাজে। যুক্তরাষ্ট্রের সান ডিয়াগো কমিকনে সেই পর্বের একটি ট্রেইলারও প্রকাশিত হয়েছে। দেখা যাক, কেমন লাগে পুরোনো সাজে নতুন শার্লককে দেখতে।

'ড্রাগন বল জি' অ্যানিমেটা নিশ্চয়ই অনেক প্রিয়? সুখবর হলো, গত ৪ আগস্ট প্রকাশিত হয়েছে 'ড্রাগন বল জি'-এর নতুন ছবি : *ড্রাগন বল জি : রেজারাকশন এফ*। এতে ভিলেন ফ্রিজাকেও পাওয়া যাবে! এ ছাড়া ৪ আগস্ট জনপ্রিয় কার্টুন শন দ্য শিপের নতুন ছবি মুক্তি পেয়েছে। দুদিন বাদেই কমিক সিরিজ 'ফ্যান্টাসটিক ফোর'-এর নতুন ছবিও মুক্তি পাচ্ছে।

গ্রন্থনা : **ইসতিয়াক হোসেন**, তথ্যসূত্র : এএফপি, টাইম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগস্ট

১ আগস্ট

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

১৯৭১ সালের ১ আগস্ট। বাংলাদেশে তখন চলছে মহান মুক্তিযুদ্ধ। উত্তাল সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। ভারতীয় সংগীতসাধক পণ্ডিত রবিশঙ্কর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বজনমত গড়ে তোলা এবং শরণার্থীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য আয়োজন করেছিলেন অবিস্মরণীয় ওই কনসার্ট। সঙ্গে ছিলেন তাঁর শিষ্য-বন্ধু বিশ্বখ্যাত ব্যান্ড বিটলসের শিল্পী জর্জ হ্যারিসন। তাঁদের পাশাপাশি যুক্ত ছিলেন বিশ্বখ্যাত সব শিল্পী—বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রেস্টন, রিঙ্গো স্টার, লিওন রাসেল, ওস্তাদ আলী আকবর ও ওস্তাদ আল্লারাখা।

২ আগস্ট

নেলসন ম্যান্ডেলা কারারুদ্ধ

মাদিবা, সবাই যাঁকে চেনে নেলসন ম্যান্ডেলা নামে। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপতি। তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত। তার আগে ম্যান্ডেলা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে। ১৯৬২ সালের এই দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং অন্তর্ঘাতসহ নানা অপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। ২৭ বছর কারাগারের চার দেয়ালে রুদ্ধ ছিলেন এই নেতা। এর অধিকাংশ সময়ই ছিলেন রোবেন দ্বীপে। অবশেষে ১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারিতে আসে সেই শুভদিন। কারামুক্ত হন মাদিবা। তারপর তিনি তাঁর দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় অংশ নেন। ফলে দেশটিতে অবসান হয় বর্ণবাদের। ১৯৯৪ সালে সব বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র।

AMARBOI.COM

আন্তর্জাতিক বন্ধু দিবসের শুরু

১৯৩০ সালে প্রথম বন্ধু দিবস উদ্‌যাপনের চিন্তা করেন হলমার্ক কার্ডসের প্রতিষ্ঠাতা জয়েস হল। তারপর থেকে আগস্ট মাসের প্রথম রোববার দুনিয়ার নানা প্রান্তের মানুষ বন্ধুদের কার্ড ও ফুল উপহার দিতে শুরু করে। কেবল উপহারই নয়, বন্ধুদের নিয়ে হরেক আয়োজনের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করে দুনিয়ার নানা বয়সী মানুষ।

৪ আগস্ট

কিশোর কুমারের জন্ম

১৯৪৮ সালে *জিদ্দি* সিনেমায় গেয়েছিলেন 'মরণে কি দোয়াঁয়ে কিঁউ মঙ্গু' গানটি। সেই শুরু, এরপর একসময় কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন কিশোর কুমার। বলিউডের 'অলরাউন্ডার' বললেও এতটুকু ভুল হবে না। তাঁর গান এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে, অভিনয় দেখেও মুগ্ধ না হয়ে পারে না কেউ। গান লিখেছেন, চিত্রনাট্য লিখেছেন, সুর ও পরিচালনাও করেছেন। তবে কখনো গান শেখেননি কিশোর কুমার। গানে ছিল না কোনো প্রশিক্ষণ, অভিনয়েও নয়। কখনো কাজ করেননি কারও সহকারী হিসেবেও। অথচ ইংরেজিসহ ১০টি ভাষায় কিশোর কুমার প্রায় ২ হাজার ৯০০ গান করেছেন। এর মধ্যে ২ হাজার ৬০০ গান হিন্দি ছবির। এখন পর্যন্ত বলিউডের সবচেয়ে সফল 'প্লেব্যাক সিঙ্গার'দের তালিকায় তাঁর নামটা ওপরের দিকেই আছে। ভারতের মধ্যপ্রদেশে ১৯২৯ সালের এই দিনে জন্মেছিলেন এই শিল্পী। মারা গেছেন ১৯৮৭ সালের ১৩ অক্টোবর।

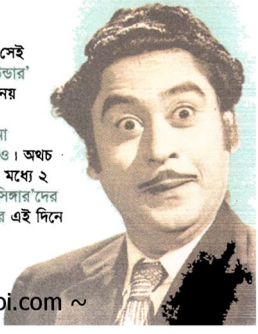

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭ আগস্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ

বর্ষা ছিল তাঁর প্রিয় ঋতু। বলা হয়, বাংলার বর্ষাকে নবরূপে আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। সেই প্রিয় ঋতুতেই চিরবিদায় নিয়েছিলেন আধুনিক বাঙালির রুচির নির্মাতা, বাঙালির প্রতিটি মুহূর্তের আবেগের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ (১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট) মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল তাঁর। সমগ্র বাংলা সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলা রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভার স্পর্শে রবির কিরণের মতোই দীপ্তিমান হয়ে উঠছিল। তাঁর কালজয়ী অমূল্য রচনাসম্ভার মানবতার জয়গানে চিরভাস্বর। প্রায় একক কৃতিত্বে তিনি বাংলা সাহিত্যসম্ভার পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের দরবারে। এর স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১৩ সালে প্রথম বাঙালি হিসেবে পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উদ্বোধন

আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা নিদর্শন দেখতে হলে আমরা কোথায় যাই? এক ঝলকে সব দেখতে-বুঝতে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিকল্প আর কী হতে পারে! প্রাচীন যুগ থেকে আজকের বাংলাদেশ যতগুলো অধ্যায় পার করেছে, তার প্রায় সব কটির চিহ্নই ধরে রেখেছে জাতীয় জাদুঘর। নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং তা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণা করাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আগে পরিচিত ছিল ঢাকা জাদুঘর নামে। ১৯১৩ সালের এই দিনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটি কক্ষে এর উদ্বোধন করেন সে সময়ের বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সরকার ঢাকা জাদুঘরকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হিসেবে ঘোষণা করে।

AMARBOI.COM

১০ আগস্ট

এস এম সুলতানের জন্ম

বাংলাদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান। বাংলার কৃষক-শ্রমজীবী মানুষ তাঁর ছবিতে অবয়ব পেয়েছে নতুন রূপে, অনন্য আকার-গড়নে। সুলতানের জন্ম ১৯২৪ সালের এই দিনে, নড়াইলের মাসিমদিয়া গ্রামে। পুরো নাম শেখ মোহাম্মদ সুলতান। ডাকনাম লালমিয়া। ১৯৪৬ সালে ভারতের সিমলায় প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী হয় তাঁর। ১৯৫০ সালে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এমব্যাংকমেন্টে আয়োজিত দলগত প্রদর্শনীতে পাবলো পিকাসো, সালভাদর দালি প্রমুখ শিল্পীর সঙ্গে সুলতানের ছবিও প্রদর্শিত হয়। ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর যশোরের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যান এই শিল্পী।

১১ আগস্ট

'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশিত

কেবল কবিতাই নয়, পত্রিকা প্রকাশ করেও সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিতেই ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট নজরুল প্রকাশ করেন ধূমকেতু পত্রিকা। অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল সেটি। বিপ্লব, কৃষক, মজদুর ও মধ্যবিত্তের জাগরণই ছিল এর মূল লক্ষ্য। প্রথম সংখ্যায়ই প্রকাশিত হয় নজরুলের বিখ্যাত সেই কবিতা—'ধূমকেতু'। পত্রিকাটি শুরুতে ফুলস্কেপ কাগজের চার পৃষ্ঠায় এবং পরে আট পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বাণী দিয়ে ধূমকেতুকে অভিনন্দন জানান, যা প্রতি সংখ্যায় পত্রিকার শিরোনামের নিচে ছাপা হতো।

১৫ আগস্ট

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত

১৯৭৫ সালের এই দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয়েকজন চক্রান্তকারী সেনাসদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও ঘাতকের বুলেটে নিহত হন তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেসা মুজিব; ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল; পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল; ভাই শেখ আবু নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, ভাগনে শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি। বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচাতে ছুটে আসা কর্নেল জামিলও নিহত হন সেদিন। দেশের বাইরে থাকায় ঘাতক চক্রের হাত থেকে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত সেই সব খুনি দীর্ঘদিন বিচারের আওতাবহির্ভূত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা সচল হয়। ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি আদালতের রায় অনুযায়ী খুনিদের কয়েকজনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ w[illegible]boi.com ~

১৬ আগস্ট

'গীতাঞ্জলি'র প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গীতাঞ্জলি* বইটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালের এই দিনে। মোট ১৫৭টি গীতিকবিতার সংকলন এটি। বেশির ভাগ কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ নিজে সুরারোপ করেছিলেন। ১৯০৮ থেকে ১৯০৯ সালে কবিতাগুলো প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের *সং অফারিংস* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। এতে *গীতাঞ্জলি* ও সমসাময়িক **আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের কবিতা অনুবাদ করে প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ। আর ওই বইটির জন্য** সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার **পান ১৯১৩ সালে।**

১৮ আগস্ট

ব্রজেন দাসের ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি

ধলেশ্বরী আর ইছামতী ছিল তাঁর বন্ধু। সাঁতরে নদীর এপার-ওপার হওয়া তাঁর কাছে ছিল একেবারেই 'পানির মতো সোজা'! আক্ষরিক অর্থেই পানির পোকা ছিলেন ব্রজেন দাস। বিখ্যাত এই সাঁতারুর জন্ম ১৯২৭ সালের ৯ ডিসেম্বর, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায়। তবে ব্রজেন দাসের কথা উঠলেই আমাদের মনে পড়ে ইংলিশ চ্যানেলের কথা। কারণ, দক্ষিণ এশিয়ার সাঁতারুদের মধ্যে তিনিই প্রথম সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন। সেটা ১৯৫৮ সালের এই দিনের কথা। আর তার ফলে বিশ্ব ক্রীড়াজগতে বাঙালির সাফল্যের প্রথম স্বীকৃতিও আদায় করেছিলেন ব্রজেন দাস।

২৬ আগস্ট

মাদার তেরেসার জন্ম

মাদার তেরেসা ছিলেন সারা বিশ্বের অবহেলিত মানুষের 'মা'। অবহেলিত মানুষের পাশে পরম মমতা নিয়ে দাঁড়াবেন বলেই সুদূর আলবেনিয়া ছেড়ে তিনি চলে এসেছিলেন কলকাতায়। ১৯৫০ সালে কলকাতায় 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' নামের সংস্থার মাধ্যমে অবহেলিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান তিনি। আজ সেই মিশনারিজ অব চ্যারিটি বিশ্বের প্রায় ১২৩টি দেশে ৬১০টি মিশনে কাজ করছে। মাদার তেরেসার জন্ম মেসিডোনিয়ার স্কোপজে শহরে, ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট। ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে দরিদ্র, এতিম ও দুস্থ মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন ৪৫ বছরের বেশি সময় ধরে। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান ১৯৭৯ সালে। ১৯৮০ সালে পান ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন'। ১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মারা যান এই মহীয়সী নারী।

AMARBOI.COM

২৯ আগস্ট

কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু

মানবতার জয়গানে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। লিখেছেন, 'গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান...'। মানবতা ও সাম্যের কবি, গানের বুলবুল কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ সালের ২৪ **মে**), পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান **জেলার আসানসোল** মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। সব রকমের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবি **'চির** উন্নত মম **শির'** বলে আজীবন সংগ্রাম **করে গেছেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ছিল শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির জন্য।** মানবতার মুক্তির **পাশাপাশি** সাম্প্রদায়িকতা, **ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার,** কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধেও ছিলেন সোচ্চার। মহান মুক্তিযুদ্ধের **সময় তাঁর** গান, কবিতা সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে দেশের মুক্তিকামী মানুষকে। **তাঁর** চেতনা ও আদর্শ চিরভাস্বর হয়ে আছে আমাদের জীবনে। ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকার তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসে। ঢাকায় তদানীন্তন পিজি হাসপাতালে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট (১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ **ভাদ্র**) পৃথিবী **থেকে বিদায় নেন আমাদের জাতীয় কবি।**

কিআ প্রতিবেদক, সূত্র: হিস্টোরি চ্যানেল, উইকিপিডিয়া ও বাংলাপিডিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরছাড়া

সিকদার নাজমুল হক

দূরে মিশে গেছে পায়ে চলা পথ, কাশবন একধারে,
সাদা শাড়ি পরে কাশের বালিকা একটানা মাথা নাড়ে।
পথের কিনারে নীল হয়ে থাকে ফণীমনসার পাতা,
বাবলার সারি আকাশের পাড়ে মেলে ধরে নীল ছাতা।
আমাকে তখন হাতছানি দেয় ওই নদী মধুমতি,
ঘরে ফিরে আজ নাই-বা গেলাম, কী এমন হবে ক্ষতি?

পথের কিনারে নিচু হয়ে নামে কৃষ্ণচূড়ার ডাল,
আবির রাঙানো ফুলের মুকুলে আকাশ হয়েছে লাল।
মেঘের কিনারে রোদের ছটায় আলো করে ঝিলমিল,
আকাশের নীলে থির হয়ে থাকে একটি ভুবনচিল।
আমাকে তখন পিছু ডাকে শুধু লাল নীল প্রজাপতি,
ঘরে ফিরে আজ নাই-বা গেলাম, কী এমন হবে ক্ষতি?

সারা মাঠজুড়ে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে নিঝুম দুপুরবেলা—
পাড়ার ছেলেরা খেলছে পুকুরে ডুব-সাঁতারের খেলা।
ওই তো আকাশে বেশ তো জমেছে ঘুড়িদের কাটাকাটি,
তাই দেখে দেখে মেঠো পথ ধরে আনমনে শুধু হাঁটি।
বিকেল ফুরোলে সূর্যের গাড়ি আকাশে টানবে যতি,
ঘরে ফিরে আজ নাই-বা গেলাম, কী এমন হবে ক্ষতি?

সন্ধ্যা নামলে আকাশের পাড়ে তারা জ্বলে থোকা থোকা,
তখন আমার চারপাশে ওড়ে হাজারো জোনাক পোকা।
মেঘের ওপাশে কী যেন কখন উঁকি মারে ভরা চাঁদ,
আকাশে মেঘের লুটোপুটি খেলা, জোছনা ভেঙেছে বাঁধ।
থমথমে রাতে সব নিঝঝুম, বাতাস থামায় গতি,
ঘরে ফিরে আজ নাই-বা গেলাম, কী এমন হবে ক্ষতি?

তোমরা সবাই বড় ঘরকুনো, ঘরে ফিরবার তাড়া,
কী এমন ক্ষতি আমি যদি হই ভবঘুরে, ঘরছাড়া?

অলংকরণ : তুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যারা 'পরা' ও 'পড়া'কে গুলিয়ে ফেলি

আখতারুজ্জামান আজাদ

লিখতে গিয়ে আমরা প্রায়ই বানান ভুল করি। কেউ করি না জেনে, আবার কেউ জানার পরও ভুল করি। কিন্তু শুদ্ধ মানুষ হতে গেলে আমাদের লেখা শুদ্ধ হতে হবে; মাকে-মাতৃভূমিকে ভালোবাসার পাশাপাশি ভালোবাসতে হবে মাতৃভাষাকেও, নিজের লেখায় ব্যবহার করতে হবে শুদ্ধ বানান।

শুদ্ধ বানান ব্যবহার করতে কিন্তু খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। ইচ্ছাটুকু থাকলেই হয়। যখন যে বানানটা নিয়ে আমরা দ্বিধায় পড়ি, ওটা সঙ্গে সঙ্গে 'বাংলা একাডেমি বাংলা বানান-অভিধান' থেকে একটু দেখে নিলেই হয়ে যায়। অভিধান কেবল মোটা চশমাওয়ালা বুড়ো ভাষাবিজ্ঞানীদের জন্য নয়; অভিধান আমাদের সবার জন্য, অভিধান আমাদের শব্দবন্ধু।

এখন থেকে কিশোর আলোতে বানানশুদ্ধির সিরিজ প্রকাশিত হবে। আর এই সিরিজের প্রথম পর্বটি 'পরা' ও 'পড়া' নিয়ে। আমরা অনেকেই 'পরা' আর 'পড়া' ক্রিয়াপদ দুটোকে গুলিয়ে ফেলি। কিন্তু 'পরা' আর 'পড়া' এক নয়। কেবল কোনো কিছু পরিধান করা অর্থে 'পরা' এবং বাকি সব ক্ষেত্রে 'পড়া'। একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলি নাহয়।

পরা

১. আমি পাঞ্জাবি 'পরি'। ২. বাবা চশমা 'পরেন'। ৩. মা শাড়ি 'পরেছেন'। ৪. নানি চাদর 'পরতেন'। ৫. সেদিন নীল পাঞ্জাবি 'পরেছিলাম', আজ লাল পাঞ্জাবি 'পরব'। ৬. মেয়েটি টিপ 'পরতে' পছন্দ করে। ৭. কোনোমতে খেয়ে-'পরে' বেঁচে আছি। ৮. আমি কারওটা খাইও না, 'পরি'ও না। ৯. সেদিনের ওই শাড়ি-'পরা' বালিকাটিকে আর কোথাও দেখিনি। ১০. আমি চাই বন্ধুটি আজ নীল শাড়ি 'পরুক'। ১১. সে খাওয়া-'পরা'র চিন্তায় অস্থির।

উল্লিখিত প্রতিটি বাক্যেই 'পরা' কিন্তু কোনো কিছু পরিধান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পড়া

১. বই 'পড়ছি'। ২. বৃষ্টি 'পড়ছে'। ৩. গাছ থেকে আম 'পড়ল'। ৪. লোকটা রিকশা থেকে 'পড়ে' গেল। ৫. বাজারে আলুর দাম 'পড়ে' গেছে। ৬. বেজায় গরম 'পড়েছে'। ৭. ভারি বিপদে 'পড়েছি'। ৮. দাদিজান নামাজ 'পড়ছেন'।

এবার 'পরা' আর 'পড়া' একই বাক্যে রেখে কিছু উদাহরণ দিই: ১. শাড়ি 'পরে' সিঁড়ি বাইতে গিয়ে মেয়েটি 'পড়ে' গেল। ২. স্কুল ড্রেস 'পরে' সে 'পড়তে' গেল। ৩. সংবাদ 'পড়া' শেষ করে সংবাদপাঠিকা সাধারণ পোশাক 'পরলেন'। ৪. 'পড়া'টা শেষ করো, তারপর তোমাকে পাঞ্জাবি 'পরিয়ে' দেব। ৫. নামাজ 'পড়বে' বলে সে টুপি 'পরেছে'। ৬. চশমা না 'পরলে' তিনি 'পড়তে' পারেন না। ৭. কাজল 'পরতে' গিয়ে মেয়েটির চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে 'পড়ল'। ৮. মেয়েটি কখনো রাবীন্দ্রিক পোশাকও 'পরেনি', রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখাও 'পড়েনি'। ৯. জুতো 'পরার' সময়ে মেঝেতে ধুলা ঝরে 'পড়ল'। ১০. আগামীকাল পরীক্ষা; এটা তোমার মেকআপ 'পরাপরির' সময় না, বই 'পড়াপড়ির' সময়।

এই হচ্ছে 'পরা' আর 'পড়া'র পার্থক্য। 'বৃষ্টিতে ভেজার পরে ওর জ্বর এসেছে' এই 'পরে' বানানে কিন্তু 'র'; এই 'পরে' অবশ্য ক্রিয়াপদ নয়। আজ এ পর্যন্তই। তোমরা যারা চশমা 'পরো', তারা এবার চশমা 'পরে' ক্লাসের 'পড়া' ভালো করে 'পড়ো'। আর যারা চশমা 'পরো' না, তারাও 'পড়তে' বসো। ঠিক আছে?

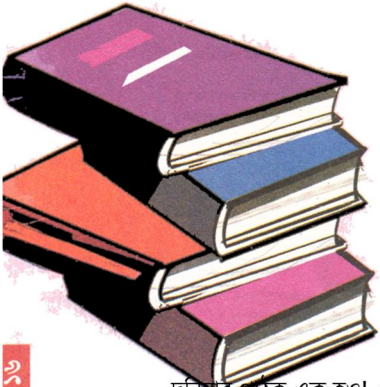

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যমজ পৃথিবীর সন্ধান

আবারও নতুন পৃথিবীর খোঁজ দিয়েছে নাসা—এমন সংবাদ পেয়ে যাদের ভুরু কুঁচকে যায় না, তারাও এবার নড়েচড়ে বসেছে। শুধু নতুন পৃথিবী নয়, যমজ পৃথিবীরও দেখা মিলেছে এবার। এ যমজ পৃথিবী নিজ নক্ষত্রকে যত দূর থেকে প্রদক্ষিণ করছে, তা আমাদের পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। নতুন এ পৃথিবীর নাম দেয়া হয়েছে, কেপলার ফোর ফিফটি টু-বি, যা পৃথিবীর চেয়ে ৬০ শতাংশ বেশি বড়। গ্রহটির বর্ণালি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, মহাজাগতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে এ গ্রহই পৃথিবীর যমজ গ্রহ। হারিয়ে যাওয়া ভাই না তো? পৃথিবীর মতোই পাথুরে পরিবেশ, আগ্নেয়গিরি আর মহাসাগর আছে সেখানে। আর গ্রহটি যে নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, সেটিও আমাদের সূর্যের মতোই। তবে গ্রহটির মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়েও দ্বিগুণ। এর অবস্থান আমাদের পৃথিবী থেকে ১ হাজার ৪০০ আলোকবর্ষ দূরে সিগনাস নক্ষত্রমণ্ডলে। যমজ গ্রহে বছর হয় ৩৮৫ দিনে। নাসার কেপলার টেলিস্কোপই এই যমজ পৃথিবীকে কান টেনে বের করেছে। ম্যাশেবল, ডেইলি মেইল।

বদলে যাবে

পদার্থবিদরা ভর মাপার একক কিলোগ্রামকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে যাচ্ছেন। বাটখারার গন্ডগোলের কারণেই নতুন পথ খুঁজছেন সবাই। বস্তুর ভর মাপতে আমরা কিলোগ্রাম বাটখারা ব্যবহার করি। আন্তর্জাতিক এককে এক কেজির মানদণ্ড হলো প্লাটিনাম-ইরিডিয়ামের তৈরি একটি নির্দিষ্ট সিলিন্ডারের ভর। ১৮৮৪ সালে এই মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছিল। সমস্যা হলো কিলোগ্রামের নিজেরই এখন ভর বেড়ে গেছে! শতবর্ষ ধরে রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবেশসহ নানা কারণে সেই নির্দিষ্ট সিলিন্ডারের ভর বেড়ে গেছে প্রায় ০.০০০১ গ্রাম। এই বাড়তি ভরসংক্রান্ত বিপত্তি এড়াতে ২০১৮ সালের মধ্যে নতুন সংজ্ঞার কথা প্রকাশ করবেন গবেষকেরা। লাইভ সায়েন্স।

গ্রন্থনা : **জাহিদ হোসাইন খান**

চারদিকে যা হচ্ছে

কণা পেন্টাকোয়ার্কস

দুনিয়াকে মাঝেমধ্যেই চমকে দেয় ইউরোপের মাটির নিচের বিশাল গবেষণাগার লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার। ঈশ্বর কণা অনুসন্ধানে বিশ্বকে চমকে দেন এই গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা। এ গবেষণাগার নতুন আরেক কণার অস্তিত্ব জানিয়েছে, যার নাম পেন্টাকোয়ার্কস। ১৯৭৯ সালে প্রথম এ কণার উপস্থিতি আছে বলে জানা গিয়েছিল। অবশেষে জুলাইয়ে দেখা মিলল পেন্টাকোয়ার্কসের। তাও মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। আইএফএলসায়েন্স।

মানুষই হবে সুপারহিরো

সিনেমা আর কার্টুনেই এতকাল সুপারহিরো দেখা যেত! কিন্তু সেই চিত্র বদলে যাচ্ছে। জার্মান গবেষকেরা সুপারহিরোদের শক্তি সাধারণ মানুষকে দেওয়ার গবেষণায় সাফল্য পেয়েছেন। মানুষ এখন স্বাভাবিকের তুলনায় ১০ গুণ ভারী বস্তু তুলতে পারছে! এক্সোস্কেলিটন নামের পোশাক-অনুষঙ্গ গায়ে চাপালেই সাধারণ মানুষের হাতেও ভর করছে সুপারহিরোর শক্তি। সব ঠিক থাকলে, ২০১৬ সালে বাজারে মিলবে এই সুপারহিরোর পোশাক। গিজম্যাগ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারমাণবিক বোমার আঘাতে মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে যায় যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা একটি জনপদ

হিরোশিমা ট্র্যাজেডি মানবতার লজ্জা

আবুল বাসার

সবে জেগে উঠতে শুরু করেছে জাপানের ছোট্ট কিন্তু কর্মব্যস্ত দ্বীপ হিরোশিমা। ঘড়িতে ৮টা বেজে ১৫ মিনিট। তারিখ ৬ আগস্ট, ১৯৪৫। শহরের এক টিন কারখানার কেরানি মিস তোশিকো সাসাকি। অফিসে ঢুকে মাত্র নিজের আসনে বসেছেন। পাশে বসা সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলার জন্য মুখ ফেরালেন মিস সাসাকি। ঠিক সেই মুহূর্তে চোখধাঁধানো নিঃশব্দ এক আলোয় ঝলসে গেল পুরো ঘর। ভীষণ আতঙ্কে চেয়ারেই স্থির রইলেন তিনি। চোখের সামনেই নিমেষে ধূলিসাৎ সবকিছু। অবিশ্বাস্য এ ধ্বংসযজ্ঞ সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারালেন মিস সাসাকি। কারখানার ছাদ ধসে ওপরতলার লোকজন গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচে। সাসাকির পেছনের শেলফ দুটি প্রচণ্ড বেগে তেড়ে এল তাঁর দিকে। বোমা নয়, একগাদা বইয়ের নিচে চাপা পড়ে আহত হলেন সাসাকি।

হিরোশিমার অন্য প্রান্তে ঠিক সে সময় নিজের হাসপাতালের বারান্দায় আয়েশ করে বসেছিলেন চিকিৎসক মাসাকাজু ফুজি। সকালের খবরের কাগজ পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তখনই সেই রহস্যময় আলোর ঝলক দেখলেন মাসাকাজু ফুজি। খবরের কাগজ হলুদ আলোয় ঝলসে উঠতে দেখলেন তিনি। হতভম্ভ ফুজি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আগেই পুরো হাসপাতাল সশব্দে পাশের নদীতে ভেঙে পড়ল। আর তার ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়লেন মাসাকাজু ফুজি।

হিরোশিমায় বেঁচে যাওয়া গুটি কয়েকের মধ্যে ভাগ্যবান দুজন মিস সাসাকি আর চিকিৎসক ফুজি। ৬ আগস্ট সেই রহস্যময় আলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল

সাসাকি আর ফুজির মতো প্রত্যক্ষদর্শী অনেকের কাছে গলিত সূর্যের অংশ হঠাৎ পৃথিবীতে নেমে আসার মতো। কারও কাছে সাক্ষাৎ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বা নরকতুল্য। কিন্তু তাঁরা কেউই তখনো জানতেন না, মাত্র এক মিনিট আগে তাঁদের শহরে লিটল বয় নামের বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমাটি ফেলা হয়েছে। তাতে সেই সকালে মুহূর্তেই মারা গেছে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ। বর্বরোচিত সেই হামলায় পুরো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তাদের প্রিয় হিরোশিমা। সেই ধ্বংসস্তূপে ঢোকার আগে একটু পেছনের গল্পটা জানা দরকার।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশ করতেই পদার্থবিদ্যা প্রবেশ করেছিল নতুন যুগে। তাঁর এ ভুবনখ্যাত তত্ত্বটির সমীকরণ $E = mc^2$। এখানে E হচ্ছে শক্তি, m বস্তুর ভর আর c আলোর গতি। সমীকরণটি ইঙ্গিত দিল, কোনো বস্তু থেকে সেই বস্তুর ভরের সঙ্গে আলোর বেগে বর্গের গুণফলের সমান শক্তি পাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ বস্তু থেকে বিপুল শক্তি। ধরা যাক, এক কেজি ভরবিশিষ্ট বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তর করা হবে। তাহলে পাওয়া যাবে ২২ মেগাটন টিএনটির (ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন) সমতুল্য শক্তি। কাগজে-কলমে বিষয়টি প্রমাণিত। কিন্তু বাস্তবে এভাবে শক্তি পাওয়ার উপায় তখনো কেউই জানে না।

অবশ্য আশার কথা, এ ঘটনার কয়েক দশকের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা বস্তুর একেবারে অভ্যন্তরে উঁকি দিতে সক্ষম হলেন। তাতে অতিসূক্ষ্ম অণু-পরমাণু সম্পর্কেও বিশদভাবে জানা গেল। আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ১৯৩০-এর দশকে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থই বস্তু থেকে বিপুল শক্তি পাওয়ার পথ দেখাল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম (ইউরেনিয়াম ২৩৫) থেকে বিপুল শক্তি পাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানী অটো হান আর লিস মেইটনার প্রমাণ করলেন, ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস দুভাগে ভাগ করে শক্তি পাওয়া যাবে। এ পদ্ধতির নাম ফিশন। বিশ্ব তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। তাই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ শক্তিকে দৈনন্দিন কাজে লাগানোর আগে বিজ্ঞানীরা যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহারটাই আগে ভেবে দেখলেন। ডাচ্ বিজ্ঞানী নিলস বোর তাঁর ছাত্র হুইলারকে নিয়ে হিসাব কষে দেখলেন, এভাবে পারমাণবিক বোমা বানানো সম্ভব। আঁতকে উঠলেন বোর। দেরি না করে তাঁরা দেখা করলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে।

তত দিনে জার্মানিতে একনায়ক হিটলার বেশ জমিয়ে বসেছেন। কিছুদিন পরই শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আগ্রাসন আর ইহুদি নিধন শুরু করলেন। গোটা ইউরোপ পরিণত হলো যুদ্ধক্ষেত্রে। কিছুদিন আগেই জার্মানি থেকে আইনস্টাইন পালিয়ে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। হিটলারের নাৎসি বাহিনী ইউরোপের অন্য দেশও দখল শুরু করলে সেসব দেশের বিজ্ঞানীরাও একে একে ভিড় জমাতে লাগলেন যুক্তরাষ্ট্রে। তখন চারদিকে গুজব, হিটলার পারমাণবিক বোমা বানানোর চেষ্টা করছেন। আর জার্মানির হাতে এ বোমা পড়লে রক্ষে নেই। ভীষণ আতঙ্কিত হলেন বিজ্ঞানীরা। তাই বোরসহ অন্য বিজ্ঞানীদের পরামর্শে ১৯৩৯ সালের ২ আগস্ট আইনস্টাইন চিঠি লিখলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টকে। পারমাণবিক বোমা বানানোর সম্ভাবনা আর জার্মানির মতো শত্রু কোনো দেশের হাতে সেটি পড়তে পারে এমন হুঁশিয়ারি ছিল ওই চিঠিতে। শোনা যায়, আইনস্টাইনের অনুরোধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ বোমা বানানোর তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন রুজভেল্টকে। অবশ্য হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞ দেখলে, সম্ভবত এ চিঠি লিখতেন না রবীন্দ্রনাথ।

সত্যিই বসে ছিলেন না হিটলারও। তিনি অনিশ্চয়তার সূত্রের জনক হাইজেনবার্গকে পারমাণবিক বোমা বানানোর নির্দেশ দিলেন। ১৯৪১ সালের দিকে হাইজেনবার্গ দেখা করলেন তাঁর শিক্ষক নিলস বোরের সঙ্গে। বোর বিপদের আঁচ পেলেন। দেরি না করে তিনিও শুভদিন দেখে জন্মভূমি ডেনমার্ক ছেড়ে আশ্রয় নিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। তাতে পারমাণবিক বোমা বানানোর দৌড়ে পিছিয়ে পড়লেন একনায়ক হিটলার। কারণ, সে সময়ের বিখ্যাত সব পদার্থবিদ তখন মার্কিন আশ্রয়ে।

এদিকে আইনস্টাইনের চিঠি পেয়েও শুরুতে তেমন গা করেনি মার্কিন প্রশাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র শুরুতে সরাসরি অংশ না নিলেও গোপনে ব্রিটেনসহ অন্য দেশগুলোকে নানাভাবে সহায়তা দিচ্ছিল। তবে সামরিক চুক্তির কারণে জাপানের সঙ্গেও ওপরে ওপরে সদ্ভাব বজায় রাখতে হচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্রকে। তবে এক সামরিক চুক্তি ভঙ্গের জের ধরে জাপানের অর্থসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন মিত্র ব্রিটেনও একই উদ্যোগ নেয়। এর জেরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তি জাপান। সে সময় ভারত উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসনে থাকায় কলকাতাতেও বোমা হামলা চালিয়েছিল জাপান। সেটি ১৯৪২ সালের জানুয়ারির ঘটনা। কলকাতা আক্রমণের প্রায় এক মাস আগেই যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই অঙ্গরাজ্যের পার্ল হারবারে বিমান হামলা চালায় জাপান। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রায় দুই ঘণ্টার ওই আক্রমণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় পার্ল হারবার বন্দর। প্রায় আড়াই হাজার প্রাণহানিসহ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যুক্তরাষ্ট্রের আটটি যুদ্ধজাহাজ আর নৌবাহিনীর আরও ১৩টি জাহাজ। একদিন পরেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট।

এ সময় আইনস্টাইনের পরামর্শই সম্ভবত ভাবিয়েছিল তাদের। তড়িঘড়ি করে এক অতিগোপনীয় প্রকল্প অনুমোদন করে মার্কিন সরকার। ইতিহাসে যা ম্যানহাটন প্রজেক্ট নামে কুখ্যাত। এতে অর্থের জোগান দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারও। প্রজেক্টের প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন মার্কিন পদার্থবিদ রবার্ট ওপেনহাইমার। নিলস বোর, জেমস চ্যাডউইক, এনরিকো ফার্মি, রিচার্ড ফেনিম্যানসহ অনেক নামী বিজ্ঞানীও এতে জড়িত ছিলেন। ১৯৪২ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী চার বছরের মধ্যে ২ বিলিয়ন ডলার খরচ আর ১ লাখ ৭৫ হাজার কর্মীর অংশগ্রহণে তৈরি হয় চারটি পারমাণবিক বোমা। গোপনে

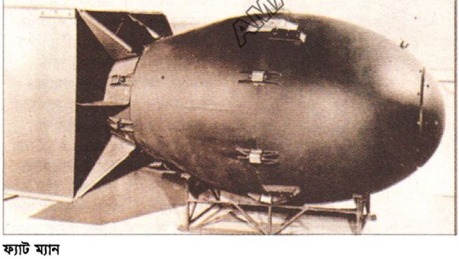

ফ্যাট ম্যান

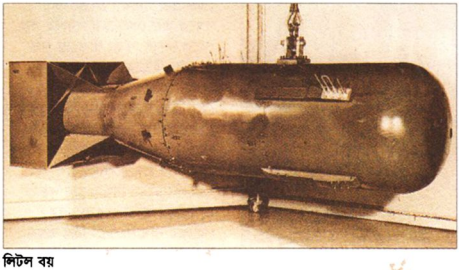

লিটল বয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

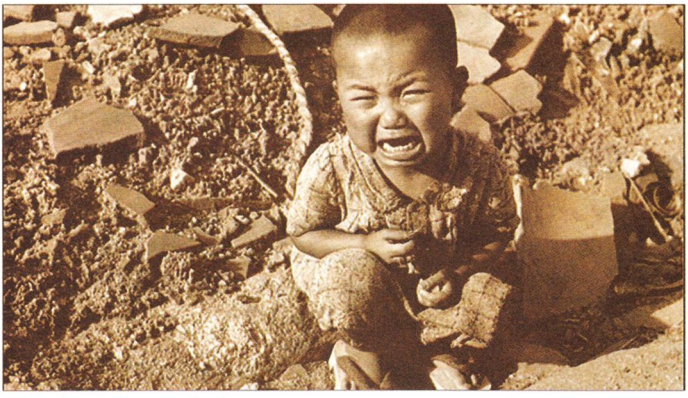

মানুষের বর্বরতায় সাক্ষী হয়ে আছে হিরোশিমা

এগুলোর একটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে। ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই ঘটানো সেই বোমার আকার ছিল মাত্র একটি বেসবলের সমান। কিন্তু তার শক্তি ২০ হাজার টিএনটির সমতুল্য। বোমাটির বিস্ফোরণ দেখে সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন উপস্থিত বিজ্ঞানীরা। বিপুল সেই ধ্বংসযজ্ঞ দেখে ওপেনহাইমার গীতা আওড়েছিলেন, 'আমিই পৃথিবীর ধ্বংসকারী। আমিই মৃত্যু।'

ঠিক ২২ দিন পর বিশ্ববাসী নতুন এক যুদ্ধাস্ত্রের ঝলক দেখেছিল। তত দিনে মারা গেছেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ্যারি ট্রুম্যান। তাঁর নির্দেশেই পেটের মধ্যে লিটল বয় নিয়ে মার্কিন যুদ্ধবিমান বি-২৯ যার নাম এনোলা-গে এগিয়ে চলে জাপানের দিকে। ইউরেনিয়াম ২৩৫ দিয়ে বানানো ম্যানহাটন প্রজেক্টের দ্বিতীয় বোমাটির এটিই ছিল ডাক নাম। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা জেগে ওঠে হাজারো মানুষের কর্মচাঞ্চল্যে। সকালে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই এনোলা-গে থেকে শহরে টুপ করে নেমে আসে লিটল বয়। তারপর হঠাৎ আলোর ঝলকানি। মুহূর্তে লন্ডভন্ড হিরোশিমা। সেদিনের সেই ভয়াবহতার হাত থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া আরেকজন চিকিৎসক সুতারো হিদা। সেদিনের ঘটনার বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন এভাবে, 'এমন যন্ত্রণাদায়ক আলো...চোখ বুজেও মনে হলো মগজ গলে যাবে। ধীরে ধীরে চোখ খুলে যেখানে বোমা ফেলা হয়েছিল, সেদিকে তাকাই। দেখি, মাশরুমের মতো কালো মেঘ, এগিয়ে আসছে। মুহূর্তে ঘরবাড়িসহ আমি খড়কুটোর মতো উড়ে গেলাম।'

সবাই ড. হিদার মতো সৌভাগ্যবান নয়। সেদিন লিটল বয়ের বিকট শব্দ আর ক্ষতিকর গামা রশ্মি, সেই সঙ্গে হাজার ডিগ্রি তাপে মুহূর্তে কয়লা হয়েছিল প্রায় ৭০ হাজার মানুষ। ধুলায় মিশে যায় ৬৯ শতাংশ ঘরবাড়ি। মৃত্যুপুরী হিরোশিমায় ১৯৪৫ সালের শেষ নাগাদ পারমাণবিক বিকিরণে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় আড়াই লাখে। ক্ষত-মৃত্যু আর বর্বরতার স্মারকচিহ্ন। আজও বিকলাঙ্গতা, মানসিক প্রতিবন্ধী আর প্রজননক্ষমতা হ্রাসের মধ্য দিয়ে সেই প্রজন্মক্রমিক ক্ষতকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে জাপানিদের।

লিটল বয়ের বিষাক্ত ছোবলের রেশ কাটতে না কাটতে ৯ আগস্ট জাপানের নাগাসাকিতে ফেলা হয় ফ্যাটম্যান। তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম (প্লুটোনিয়াম ২৩৯) দিয়ে বানানো ম্যানহাটন প্রজেক্টের তৃতীয় বোমা এটি। মুহূর্তেই প্রাণ হারায় প্রায় ২৭ হাজার মানুষ। শেষ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। প্রাণে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা শিকার হলেন ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়তার। মাথার চুল উঠে গেল শিশুদের। কেউবা হারিয়ে ফেলল খাওয়ার শক্তি। এই বীভৎস দৃশ্য উন্মাদ করে তুলেছিল বোমা নিক্ষেপকারী মার্কিন মেজর চালর্স সুইনিকেও।

ম্যানহাটন প্রজেক্টের চতুর্থ বোমাটি আগস্টেই জাপানের আরেক শহরে ফেলার পরিকল্পনা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু পরপর দুটি বোমার আঘাতে তত দিনে মনোবল ভেঙে পড়ে জাপান সরকারের। হতভম্ভ জাপান ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। তার চার মাস আগেই আত্মহত্যা করেছিলেন ইতিহাসের খলনায়ক হিটলার। সমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। কিন্তু ৭০ বছর আগে জাপানে সেই বর্বরোচিত হামলার কথা ভেবে আজও শিউরে ওঠে বিশ্বের লাখো যুদ্ধবিরোধী আর শান্তিকামী মানুষ। হিরোশিমা ও নাগাসাকির লাখো নিরীহ মানুষের রক্ত আজও মানবজাতির বিবেক-বুদ্ধির গরিমার ইমারতে বড় ক্ষতচিহ্ন হয়ে আছে।

সূত্র : হিরোশিমা : জন হারসে
অনুবাদ : দীপা ইসলাম/ বাংলা একাডেমি
মাইক্রোসফট এনকার্টা, উইকিপিডিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাল্লো,
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
ই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
গান নিগ্রো, অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
র্দ, বইয়ের পোকা।
আমরা।
লো-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।
তে চালছি–

৩০ বছরে তিন গোয়েন্দা

AMARBOI.COM

আবদুল্লাহ মামুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা তিনজন, তিন বন্ধু। থাকে সেই আমেরিকায়, রকি বিচ নামের ছোট্ট, শান্ত, ইমছাম এক শহরে। শান্তা মনিকা পবর্তমালা ঘেঁষে ড়ে উঠেছে এ শহর। রাজ্যের পুরোনো মালের জঞ্জাল নিয়ে এ শহরেই গড়ে উঠেছে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড। দুই াই জাহেদ আর রাশেদ পাশা এ জঞ্জালের আড়তটা ড়ার সময় নাম দিয়েছিলেন 'পাশা বাতিল মালের ামড়ত'। কিন্তু ইংরেজি অক্ষরে এই বাংলা সাইনবোর্ডটা কউই ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারত না। তাই রগেমেগে শেষতক নামই পাল্টে ফেলা হয়।

এ স্যালভিজ ইয়ার্ডের জঞ্জালের নিচেই চাপা পড়ে াছে এক পুরোনো মোবাইল হোম। প্রায় ৩০ ফুট লম্বা একটা ক্যারাভ্যান। সেই মোবাইল হোমের ভেতরেই ওই তিনজন গড়ে তুলেছে গোপন এক আস্তানা। যেটাকে তারা ডাকে হেডকোয়ার্টার। কী নেই সেখানে? জলজ্যান্ত াপার যন্ত্র থেকে শুরু করে সর্বদর্শন নামের এক পরিস্কোপ আর আস্ত এক ডার্করুমও আছে সেখানে। নিজেদের তদন্ত রিপোর্ট সংরক্ষণে আছে আলাদা জায়গা। গোয়েন্দাপ্রধানের জন্য সুইভেল চেয়ারসহ তিনজনের সার জন্য আলাদা জায়গা তো আছেই, সঙ্গে আছে একটা টেলিফোনও। অতি গোপন এই হেডকোয়ার্টারে ঢোকার জন্য তারা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে আলাদা আলাদা গোপন পথ। সেগুলোর নামও বিচিত্র। সবুজ ফটক এক, দুই সুড়ঙ্গ, সহজ তিন কিংবা লাল কুকুর চার। এ নামগুলো শুনে কার সাধ্যি এগুলোর আসল অর্থ বোঝার! এতক্ষণ যে তিনজনের কথা বলছিলাম, তারাই সেই বিখ্যাত তিন কিশোর গোয়েন্দা। কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড। কিশোর মনে অসম্ভব ভালো লাগার সেই তিনটি নাম। একত্রে যারা পরিচিত কোথাও তিন গোয়েন্দা নামে, কোথাও 'গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিন' নামে।

এ দেশে তিন গোয়েন্দাকে চেনে না এমন কিশোর খুঁজতে রীতিমতো কোনো গোয়েন্দাকেই ভাড়া করতে হবে। ঝাঁকড়া চুলো কিশোর, 'খাইছে' মুসা আর বইপোকা রবিন এ দেশের লাখো কিশোরের স্বপ্নের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা–
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো, অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি–
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

নায়ক। তিন গোয়েন্দার মতো হতে চাওয়া ছেলেমেয়ের অভাব নেই এ দেশে। ওদের দেখাদেখি অনেকেই খুলে বসে গোয়েন্দা বাহিনী, দুই গোয়েন্দা, তিন গোয়েন্দা, চার গোয়েন্দা। এমনকি দল ভারী হওয়ায় কেউ কেউ তো আট বা নয় গোয়েন্দাও খুলে বসে! তিন গোয়েন্দা পড়ে রোমাঞ্চের নেশায় কত ছেলেমেয়ে মা-বাবাকে না জানিয়ে কত শত অভিযান চালিয়ে বসে, তার খোঁজই বা কে রাখে। ক্লাসে বইয়ের নিচে লুকিয়ে তিন গোয়েন্দা পড়তে গিয়ে ধরা পড়ে স্যারের হাতে রামধোলাই খায় কত

সেবা প্রকাশনী থেকে ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে যাত্রা শুরু হয় তিন গোয়েন্দা সিরিজের

AMARBOI.COM

তারা তিনজন

কিশোর পাশা

রহস্য ঘনীভূত হলে বা গভীর কিছু ভাবতে হলে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করে গোয়েন্দা প্রধান কিশোর পাশা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, তীক্ষ্ণ চোখে বুদ্ধির ঝিলিক, ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। বড় বড় রহস্যরাও নিরুপায় হয়ে হার মানে তার বুদ্ধির কাছে। পেটে বোমা মারলেও প্রয়োজনের আগে মুখ খোলে না সে কখনো। বাংলাদেশি বাবা জাহেদ পাশার একমাত্র ছেলে কিশোর। সেই সুবাদে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। মাত্র ৭ বছর বয়সে এক ঝড়ের রাতে গাড়ি দুর্ঘটনায় তার মা-বাবা দুজনেই মারা যান। এরপর মেরি চাচি আর রাশেদ চাচার কাছেই বড় হয় কিশোর।

ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ার কাজে ভীষণ পটু কিশোর পাশা। স্যালভিজ ইয়ার্ডের জঞ্জাল থেকে বাতিল জিনিস দিয়ে উদ্ভট যন্ত্র বানাতে ওস্তাদ সে। তাই তাকে ইলেকট্রনিক্সের জাদুকরও বলা হয়। কিশোর একজন অভিনেতাও বটে। ছেলেবেলায় টিভিতে পাগল সংঘ নামের এক কমেডি সিরিজে অভিনয় করে জনপ্রিয় হয়েছিল সে। তার চরিত্রের নাম ছিল মোটুরাম। এখান থেকে জানা যায়, ছোটবেলায় ভীষণ নাদুসনুদুস ছিল কিশোর পাশা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহস্য সমাধানের সূত্র মনে হয় তিন গোয়েন্দাপড়ুয়াদের। কিংবা ময়লা পুরোনো কাগজ দেখে সেটাকে গুপ্তধনের সংকেতও ভেবে বসে অনেকে।

তিন দুঃসাহসীর সঙ্গে ইচ্ছে হলেই বইয়ের বাইরে থেকেই দূর আকাশে পাড়ি দেয় পাঠক। কিংবা নিমেষেই জলদস্যুর হারানো মোহর খুঁজতে সাগরের অতলে নেমে পড়া যায়। চোর-ডাকাতকে নাকানি-চুবানি খাওয়াতেও ওদের সঙ্গী হওয়া যায়। অজানা ভীষণ অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া কিংবা মরুভূমির গরমে সেদ্ধ হতে হতে পরক্ষণে সুদূর বরফরাজ্যে ছুটে যায় পাঠক। ধাঁধার জাল কেটে লুকানো গুপ্তধন উদ্ধার করাতেও ভাগ বসানো যায় ওদের সঙ্গেই। এত কাণ্ডকারখানার সঙ্গী হয়ে সবারই একসময় মনে হয়, রকি বিচের তিন গোয়েন্দার অস্তিত্ব আসলেই আছে পৃথিবীতে! কিন্তু লাখ টাকার প্রশ্ন, তিন গোয়েন্দা কি সত্যিই আছে? সে-ও এক বিরাট রহস্য! তবে এ রহস্য সমাধান করতে তোমাকে আর নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে কিশোর পাশা হতে হবে না। তার চেয়ে রহস্যটা ভেঙেই দিই।

গেল শতাব্দীর ষাটের

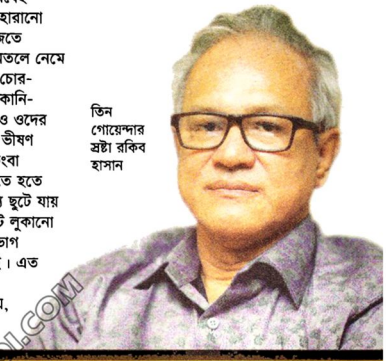

তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান

ছেলেমেয়ে। আবার বাসায় লুকিয়ে পড়তে গিয়ে ধরা খেয়ে শাস্তি পেতে হয় অনেককে। আর এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে রাস্তাঘাটে অপরিচিত মানুষকে অপরাধী মনে হওয়া, ম্যাচের কাঠি, পোড়া সিগারেটের টুকরো, পায়ের ছাপ বা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দেখে সেটাকে

AMARBOI.COM

মুসা আমান

সর্বদা ভূতের ভয়ে থরহরি কম্প মুসা আমান তিন গোয়েন্দা সিরিজের সবচেয়ে মজার চরিত্র। ভীষণ ভোজন রসিকও মুসা। কথায় কথায় 'খাইছে' আর 'ইয়াল্লা' বলে ওঠা মুসা হলো তিন গোয়েন্দার মধ্যে গোয়েন্দা সহকারী হিসেবে পরিচিত। তার আদি বাড়ি আফ্রিকা। বাবা রাফাত আমান আর মায়ের সঙ্গে সে থাকে রকি বিচে। তার বাবা হলিউডের বড় টেকনিশিয়ান। আর মা গৃহিণী।

মাথায় তারের মতো প্যাঁচানো চুল আর ঝকঝকে সাদা দাঁত। কুচকুচে কালো গায়ের রঙের মুসা আমানকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যায়ামবীর হিসেবে। ভূতের ভয়ে কাবু থাকলেও পেশিশক্তিতে সবল সে। বিপদে পড়লে কোনোকিছু পরোয়া করে না। প্রচণ্ড শক্ত মাথা দিয়ে শত্রুর পেটে আঘাত করতে তার জুড়ি নেই। কুংফু-কারাতেও সে সমান পারদর্শী। বিমান চালাতেও বেশ দক্ষ। তবে বই পড়ায় ভীষণ অপছন্দ তার। তারচেয়ে খাওয়াদাওয়া আর খেলাধুলাতেই তার যত আগ্রহ মুসা আমানের।

রবিন মিলফোর্ড

তিন গোয়েন্দার সব কেসের রেকর্ড রাখা বা নথি সংরক্ষণ করা রবিন মিলফোর্ডের কাজ। এ জন্য তাকে গোয়েন্দা দলের নথি গবেষক বলা হয়। রহস্য সমাধান করতে গিয়ে প্রয়োজনে বইপত্র বা জার্নাল ঘাঁটাঘাঁটি করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে রবিন।

বইয়ের প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা তার। তাকে বলা হয় চলমান জ্ঞানকোষ। রকি বিচ লাইব্রেরিতে খণ্ডকালীন চাকরিও করে রবিন। আয়ারল্যান্ড বংশোদ্ভূত রবিনের বাবা মিস্টার মিলফোর্ড সাংবাদিক আর মা গৃহিণী। পাহাড়ে উঠতে ওস্তাদ সে। অবশ্য সেজন্য কয়েকবার পা ভেঙেছে তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোয়েন্দা কিশোর-মুসা-রবিনকে নিয়ে 'তিন বন্ধু' নামে আরেকটি সিরিজ লিখে ফেললেন রকিব হাসান, সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান প্রজাপতি প্রকাশন থেকে হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা হয়েছে এই সিরিজের বইগুলো। এখন পর্যন্ত এ সিরিজের মোট ৩৮টি বই বেরিয়েছে। নাম 'তিন বন্ধু' হলেও এগুলোও আসলে তিন গোয়েন্দাই। যে কারণে পরবর্তীকালে এই সিরিজের বইগুলোও সেবার তিন গোয়েন্দা ভলিউমে স্থান পেয়েছে।

একটানা অনেক বছর সেবায় তিন গোয়েন্দা লেখার পর অর্থনৈতিক কারণে রকিব হাসান

দশকে কুয়াশা নামের এক কিশোর উপযোগী সিরিজের আবির্ভাব হয়। ১৯৬৪ সালের জুনে জন্ম নেওয়া এ সিরিজটি লিখতেন মাসুদ রানার স্রষ্টা কাজী আনোয়ার হোসেন ওরফে কাজীদা। ৭০টির বেশি বই প্রকাশিত হওয়ার পর হুট করে বন্ধ হয়ে যায় সিরিজটি। ওই সময় সেবাতে কিশোরদের জন্য এই একটিই সিরিজ ছিল। সেটিও বন্ধ হওয়ায় কিশোর উপযোগী সিরিজের অভাব দেখা দিল সেবা প্রকাশনীতে। ঠিক এ সময় রকিব হাসান সেবার স্বত্বাধিকারী কাজীদাকে প্রস্তাব দেন কিশোরদের জন্য একটি গোয়েন্দা সিরিজ লেখার। হাসিমুখেই রাজি হন কাজীদা। তাতেই ঘটে বাংলার কিশোর সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বিপ্লব। ১৯৮৫ সালের আগস্টে 'তিন গোয়েন্দা' শিরোনাম দিয়ে তিন গোয়েন্দা সিরিজের পথচলা শুরু। কিশোর-মুসা-রবিন নামের তিন দুঃসাহসী কিশোরের রোমহর্ষক কাহিনি সবার এত ভালো লাগবে, তা কেউই কল্পনাই করেনি। মুগ্ধ পাঠকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার চিঠিতে উপচে গেল সেবা প্রকাশনীর ডাকবাক্স। সে এক এলাহি কাণ্ড! এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি সিরিজটিকে। একে একে বের হতে লাগল তিন গোয়েন্দার অসাধারণ সব বই। ২০০৩ সাল পর্যন্ত একে একে ১৫৮টি তিন গোয়েন্দা লিখে ফেললেন রকিব হাসান। এর ফাঁকে ফাঁকে তিন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০২ সালের দিকে বাংলাবাজারের বিভিন্ন প্রকাশনী, পত্রপত্রিকা আর নাটক লেখায় ব্যস্ত হয়ে গিয়ে নিয়মিত আর তিন গোয়েন্দা লিখতে পারছিলেন না। সেবা প্রকাশনীও এমন জনপ্রিয় একটি সিরিজ মেরে ফেলতে চাইল না, প্রথমে রকিব হাসানকে গোস্ট রাইটারের সাহায্যে লেখা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করল। রকিব হাসান প্রথমে রাজি হয়েও পরে আর গোস্ট রাইটার দিয়ে লেখাতে আগ্রহ বোধ না করায় তিন গোয়েন্দা চালু রাখার দায়িত্ব দেওয়া হলো শামসুদ্দীন নওয়াবকে। অবশ্য শামসুদ্দীন নওয়াব কাজীদারই ছদ্মনাম। এ নাম ব্যবহার করে

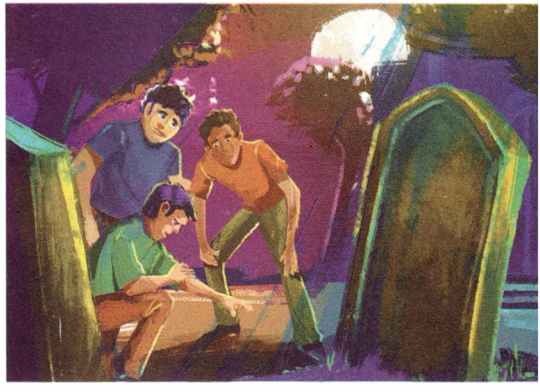

বিভিন্ন গোস্ট রাইটার লিখতে লাগলেন সিরিজটিতে। সেখানে মূল লেখক হিসেবে থাকলেন কাজী শাহনূর হোসেন। তুমুল জনপ্রিয়তা নিয়ে সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হতে থাকল সিরিজটি। ইতিমধ্যেই তা ১৩৬তম ভলিউমে পৌঁছেছে। বলে রাখা ভালো, যেসব লেখক নিজের নাম ব্যবহার না করে অন্যের নামে বই প্রকাশে চুক্তিবদ্ধ হন, তাঁরাই গোস্ট রাইটার। বিশ্বের অনেক জনপ্রিয় সিরিজে গোস্ট রাইটাররা লেখেন।

এদিকে সেবায় তিন গোয়েন্দা ছাড়ার কিছুদিন পর তিন গোয়েন্দার ভক্তদের চাপে রকিব হাসান আবার কিশোর-মুসা-রবিনকে নিয়ে লিখতে বাধ্য হলেন। তবে এবার আর এককভাবে শুধু সেবার তিন গোয়েন্দায় নয়, সেবায় 'তিন গোয়েন্দা'সহ বাংলাবাজারের বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে 'কিশোর মুসা রবিনের সিরিজ', 'গোয়েন্দা কাহিনি : কিশোর মুসা রবিন', 'গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিন' শিরোনামেও তিন গোয়েন্দার কাহিনি চালিয়ে যেতে থাকলেন।

এখন, চলো আগের গল্পে ফিরে যাই। রকিব হাসান তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা তা তো সবাই জানো। কিন্তু এই তিন কিশোরকে তিনি কোথায় পেলেন? সেটার পেছনেও আছে দারুণ গল্প। রকিব হাসান মূলত এক বিদেশি সিরিজের কাহিনির ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন গোয়েন্দার সঙ্গীসাথি আর শত্রুমিত্র

তিন গোয়েন্দায় দুঃসাহসী কিশোর, মুসা আর রবিন ছাড়াও নানা চরিত্র সিরিজটির মাধুর্য বাড়িয়ে আসছে সেই জন্মলগ্ন থেকেই। এসব চরিত্রও কোনো অংশেই তিন গোয়েন্দার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রেতসাধনা বইয়ের মাধ্যমে তিন গোয়েন্দায় আসা জিনার কথা তো আগেই বলেছি। আলফ্রেড হিচকক থেকেই ডেভিড ক্রিস্টোফার এসেছে এটাও তোমরা জেনে গেছ। ছোটখাটো শারীরিক গড়ন, কিন্তু বিরাট তাগড়া গোঁফের অধিকারী কিশোরের চাচা রাশেদ পাশাও পরিচিত একটা চরিত্র। এ চরিত্রটি এসেছে থ্রি ইনভেস্টিগেটরসের টিটাস জোনস থেকে। রাশেদ পাশারও রহস্য রোমাঞ্চের প্রতি ভীষণ ঝোঁক। তিনি একটি প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থাও খুলেছিলেন, যার মাধ্যমে নিজেই বিভিন্ন কেসের সমাধান করতেন। মেরিয়ান পাশা বা মেরি চাচি চরিত্রটি এসেছে ম্যাথিল্ডা জোনস থেকে। সম্পর্কে চাচি হলেও কিশোর পাশাকে খুবই ভালোবাসেন নিঃসন্তান মেরি চাচি। তাই অপরিচিতদের কাছে কিশোরকে তিনি নিজের ছেলে বলে পরিচয় দেন।

খোঁড়া গোয়েন্দা বইতে ভিক্টর সাইমন চরিত্রটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি পেশাদার প্রাইভেট গোয়েন্দা। তিনিও মাঝেমধ্যে তিন গোয়েন্দাকে কেস জোগাড় করে দেন। হেক্টর সেবাস্তিয়ান চরিত্র থেকে অনেকটা অদলবদল করে ভিক্টর সাইমনকে তৈরি করেছিলেন রকিব হাসান। গোয়েন্দা সাইমনের বাসায় কিম নামে এক ভিয়েতনামি রাঁধুনি থাকেন। তিনি মাঝেমধ্যেই উদ্ভট উদ্ভট সব রেসিপির খাবার রান্না করে মুসাকে দিয়ে চাখিয়ে দেখেন।

তিন গোয়েন্দার সবচেয়ে বড় শত্রুর নাম কী বল তো? ঠিক বলেছো! টেরিয়র ডয়েল ওরফে ওঁটকি টেরি। ধনী বাবার বখে যাওয়া ছেলে ওঁটকি টেরি পদে পদে তিন গোয়েন্দার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে সে নিজেই বারবার নাস্তানাবুদ হয়। তাতে হাসার পাশাপাশি বেচারা ওঁটকির জন্য করুণা না হয়ে যায়ই না। ওঁটকির চরিত্রটি এসেছে থ্রি ইনভেস্টিগেটরসের স্কিনি নরিস চরিত্রটি থেকে।

রকি বিচের পুলিশ চিফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার তিন গোয়েন্দায় আরেকটি পরিচিত চরিত্র। 'সবুজ ভূত' রহস্য সমাধানের জন্য তিন গোয়েন্দাকে সবুজ কার্ড আর সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন তিনি। এ কার্ডের মাধ্যমে তারা রহস্য উদ্‌ঘাটনে গিয়ে পুলিশের সাহায্য পায়।

মিসরের ওমর শরীফও তিন গোয়েন্দার একজন জনপ্রিয় চরিত্র। মার্কিন আমেরিকান নেভি থেকে চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ওমর শরীফ। তারপর সিনেমায় স্টান্টম্যানের কাজ নেন এই দুর্ধর্ষ বেদুঈন। ডেভিস ক্রিস্টোফার তাঁকে জোগাড় করে দেন তিন গোয়েন্দার জলদস্যুর দ্বীপ অভিযানের সময়। ওমর ভাইকে নিয়ে জলদস্যুর দ্বীপ, গোপন ফর্মুলা, বিষাক্ত অর্কিড, দক্ষিণের দ্বীপসহ বেশ কটি দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি রয়েছে।

গাঁয়ের পুলিশম্যান কনস্টেবল ওয়াগনার ফগর‍্যাম্পারকট। টকটকে লাল ফুটবলের মতো গোল চেহারা, মোটা নাকের ডগাটা সুপারির মতো ফোলা, নীল চোখ, কোমরে প্রচুর চর্বি, আটো করে আটা বেল্টের ওপরে ঠেলে বেরিয়ে থাকে পেট, এভাবেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। ঝামেলা বইয়ে হাজির হওয়া ফগর‍্যাম্পারকটের কথায় কথায় 'ঝামেলা' বলে ওঠা প্রধান মুদ্রাদোষ। তিন গোয়েন্দাকে দুই চোখে দেখতে পারে না সে। তাদের কাজে বাগড়া না দিলে তার ভালো লাগে না। তবে তাকে টেক্কা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে সব সময় কিশোররাই জিতে যায়। প্রজাপতি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত তিন গোয়েন্দার শোভন সংস্করণ 'তিন বন্ধু' সিরিজের গ্রিন হিলস শহরের গল্পগুলোতে এই ঝামেলাকে দেখা যায়। ফগর‍্যাম্পারকটের ভাতিজা ববর‍্যাম্পারকট ওরফে বব তিন বন্ধু সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তবে তার চাচার মতো গোয়েন্দাদের কাজে ঝামেলা পাকায় না। উল্টো সে গোয়েন্দাদের ভালো বন্ধু।

এ ছাড়া মুসার খালাতো বোন ফারিহা, পাশা-স্যালভিজ ইয়ার্ডের কর্মী ব্যাভারিয়ান দুই ভাই বোরিস চেকোমাসকি আর রোভার চেকোমাসকি, গ্রিন হিলসের পুলিশ চিফ ক্যাপ্টেন রবার্টসন, মুরব্বি কেরি, মুসার বাবা রাফাত আমান, রবিনের বাবা মিস্টার রজার মিলফোর্ড, জিনার বাবা-মা, গোল্ডেন ডোর সিটির সেই রাগী মেয়ে ডানা, আঙ্কেল ডিক কার্টার, হীরু চাচা, রহস্যময় প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ডক্টর মুনসহ আরও অনেক চরিত্রই নানা সময় নানাভাবে তিন গোয়েন্দার অসাধারণ সব গল্পের মাঠগুলোকে রাঙিয়েছে। শুধু কি মানুষ? জিনার কুকুর রাফিয়ান-ওরফে সবার প্রিয় রাফি, কিশোরের ছোট্ট স্কটিশ কুকুর টিটু এবং বাঘা, কথা কিংবা শব্দ শুনে হুবহু নকল করতে পারা মুসার সেই ভীষণ মজাদার তোতাপাখি কিকো ছাড়া তো তিন গোয়েন্দাকে কল্পনাও করা যায় না।

বিখ্যাত পরিচালক আলফ্রেড হিচকক জড়িয়ে আছেন থ্রি ইনভেস্টিগেটরসদের সঙ্গে

ভিত্তি করে বাংলায় তিন গোয়েন্দা লিখেছিলেন। এ বিষয়টি তিনি কিংবা সেবা প্রকাশনী কখনো কোনো লুকোছাপা করেনি। সত্যি বলতে কি, প্রতি মাসে সম্পূর্ণ মৌলিক কাহিনি লিখে এ রকম জনপ্রিয় কোনো সিরিজের পাঠকদের চাহিদা মেটানোর সাধ্য কোনো লেখকেরই নেই। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ তিনজনকে নিয়ে বিস্তর বই লেখা হয়েছে। কিন্তু জনপ্রিয়তা আর মাধুর্যতার দিক দিয়ে সম্ভবত রকিব হাসানের তিন গোয়েন্দা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে লেখা বলে কোনোভাবেই রকিব হাসানকে ছোটো করে দেখার অবকাশ নেই। ভিনদেশি কাহিনিকে দেশের অগুনতি পাঠকের মনের শ্রেষ্ঠ খোরাক করে দেওয়া নিশ্চয়ই যেনতেন কাজ নয়। রকিব হাসানের কৃতিত্বটা ঠিক এখানেই।

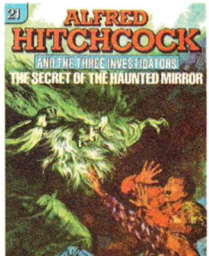

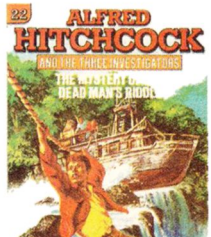

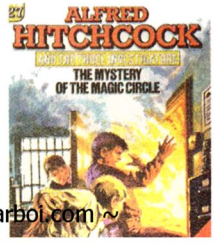

যাহোক, আচ্ছা জুপিটার জোনসের নাম শুনেছ? শোনোনি, তাই তো? পিটার ক্রেনশোকে চেনো? কিংবা বব এন্ড্রিউসকে? এসব বিটকেলে নাম শুনে নিশ্চয় নিচের ঠোঁটে আঙুল চলে গেছে অনেকের। ভাবছ, এরা আবার কারা? ওদের পরিচয় দেওয়ার আগে একবার রবার্ট আর্থার জুনিয়রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। রবার্ট আর্থার জুনিয়র জন্মেছিলেন ১৯০৯ সালের ১০ নভেম্বর, ফিলিপাইনে। ১৯২৬ সালে হাইস্কুল ম্যাগাজিনে জীবনের প্রথম দুটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল আর্থার সাহেবের। এরপর বিভিন্ন ম্যাগাজিনে অসংখ্য গল্প প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর। এসব গল্পের বিষয় ছিল অপরাধ, গোয়েন্দা, বিজ্ঞান কল্পকাহিনি, যুদ্ধ, ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃতিক। গল্প লিখে

র পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে দেশে তিন গোয়েন্দা

শুধু বাংলাদেশই নয়, বিশ্বের আরও অনেক দেশেই তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বিস্তর কাহিনি লেখা হয়েছে। এ তালিকাতে সবার ওপরে আছে জার্মানরা। থ্রি ইনভেস্টিগেটরসের অনুকরণে বানানো জার্মানদের 'ডাই ড্রেই???' নামের সিরিজ সে দেশে অসম্ভব জনপ্রিয়। থ্রি ইনভেস্টিগেটরসের কাহিনি ছাড়াও জার্মান লেখকেরা মৌলিক কাহিনি নিয়েও অনেকগুলো তিন গোয়েন্দা লিখেছেন, এমনকি এখনো লিখছেন। তাঁদের প্রকাশিত তিন গোয়েন্দার সংখ্যা ২০১৪-তে এসে দাঁড়িয়েছে ১৭৯টি। জার্মানিতে বছরে এই সিরিজের প্রায় ছয়টি বই বের হয়।

ত্রাজা প্রেত্রাসি নামে স্লোভাকিয়ার মালদি লেটা প্রকাশনী থেকেও প্রকাশিত হয় এই জনপ্রিয় সিরিজটি। তাদের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৭০টি। পোল্যান্ডেও বেশ জনপ্রিয় সিরিজটি। থ্রি ইনভেস্টিগেটরস মূল সিরিজ এবং ক্রাইমবাস্টারসহ তাদের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৬১টি। ফ্রান্সেও তিন গোয়েন্দার রয়েছে দারুণ জনপ্রিয়তা। Les trois jeunes detectives বা তিন কিশোর গোয়েন্দা নামে ১৯৭০ সালে মূল থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজের নয়টি কাহিনি নিয়ে সিরিজটি প্রকাশিত হয়েছিল। ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম,

AMARBOI.COM

বইয়ে বইয়ে তিন গোয়েন্দার গল্প

গ্রেট রবিনিওসো, তিন গোয়েন্দার কথা মনে আছে? ওই যে কঙ্কাল দীপ থেকে রুপালি মাকড়সা উদ্ধার করে যার যাত্রা শুরু। ছায়া শ্বাপদ খুঁজতে গিয়ে পেলাম মমি। রক্তদানোর তাড়া খেয়ে প্রেতসাধনা করে পাওয়া রক্তচক্ষু নিয়ে সাগরসৈকতে বেড়াতে যাওয়া, মনে পড়ে? জলদস্যুর দ্বীপ থেকে সবুজ ভূতের সঙ্গে দেখা। হারানো তিমি খুঁজে বের করলাম মুক্তো শিকারি দিয়ে। মৃত্যুখনি থেকে বেঁচে ফিরে কাকাতুয়া রহস্য ভেদ করে ছুটিতে গেলাম। আশা করি তোমার ভূতের হাসি মনে আছে? ছিনতাই হওয়া জিনিস খুঁজতে ভীষণ অরণ্যে গিয়ে ড্রাগনের তাড়া খেয়ে হারানো উপত্যকার গুহামানব ও ভিতু সিংহ দেখতে মহাকাশের আগন্তুকদের আগমন। খ্যাপা শয়তান ইন্দ্রজালে আমাদের পেঁচিয়ে মহাবিপদে ফেললেও গ্রেট মুসাইওসোর কারণে আমরা বেঁচে ফিরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংল্যান্ডেও তিন গোয়েন্দা ব্যাপক পরিচিত।

আমাদের পাশের দেশ ভারত থেকেও এ সিরিজটি প্রকাশিত হয়। খেল খিলাড়ী প্রকাশনী ১৯৭০ সাল থেকে 'বল সিক্রেট এজেন্ট ৫৫৫ : রাঙা, গঙ্গা, সিরাজী' নামে প্রকাশিত সিরিজটি দারুণ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। মূল মার্কিন থ্রি ইনভেস্টিগটরসের আইডিয়া থেকে সেলিম আহমেদ সিদ্দীকি এবং মকবুল জাহাঙ্গীর নামের দুই লেখক পাকিস্তানি পটভূমিতে 'তিন নানাহে সুরাগরাসান' নামে সিরিজটি প্রকাশ করে আসছে সেই ১৯৮০ সাল থেকে। করিমাবাদ নামের শহরের বাসিন্দা আম্বার, হাসিম আর রবিন নামের তিন কিশোরের এই অভিযানগুলো প্রকাশ করে ফিরোজ সন্স প্রকাশনী।

কিছুটা পরিচিতি পাওয়ার পর ১৯৪০ সালের দিকে রেডিও ক্রাইম ড্রামা লিখতে শুরু করেন তিনি, যার নাম দ্য মিস্টেরিয়াস ট্রাভেলার। যুক্তরাষ্ট্রে দারুণ জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি চলেছিল ১৯৫৩ পর্যন্ত। এসব করতে করতেই হঠাৎ কিশোর উপযোগী একটা সিরিজ লেখার কথা ভাবলেন তিনি। যেটা পড়ে পাঠক মুগ্ধ হবেন, হবেন রোমাঞ্চিত। সে সময় হার্ডি বয়েজ সিরিজটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। তখন পর্যন্ত প্রকাশিত ওই সিরিজের প্রায় ৫০টি বইয়ের প্রতিটিই বছরে কমপক্ষে ৩৫ হাজার কপি করে বিক্রি হতো। রবার্ট আর্থারের লক্ষ্য ছিল হার্ডি বয়েজের থেকেও জনপ্রিয় কোনো সিরিজ লেখা, যেটা নিদেনপক্ষে ২৫ বছর চলবে। আসলে এ সিরিজটি চালিয়ে টাকা কামাতে চেয়েছিলেন তিনি। যাতে বুড়ো বয়সে কোনো অভাব না থাকে।

ষাটের দশকে টিনএজারদের জন্য সলভ-দেম-ইয়োরসেলফ নামের এক পাজলের প্রতিযোগিতা হতো যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে পাঁচটি ধাঁধা থাকত। সেই প্রতিযোগিতা থেকেই রবার্ট আর্থার পেলেন তাঁর স্বপ্নের সিরিজটি লেখার আইডিয়া। একসময় তিনি লিখেও ফেললেন সিরিজের প্রথম বইটি। সেটার নাম দিলেন থ্রি ইনভেস্টিগেটরস অ্যান্ড দ্য সিক্রেট অব টেরর ক্যাসল। নামটা কি চেনা চেনা ঠেকছে? বইটির কাটতি বাড়াতে কাহিনিতে চরিত্র হিসেবে তিনি বিশ্বের সর্বকালের সেরা পরিচালকদের অন্যতম আলফ্রেড হিচককে রেখেছিলেন। এমনকি বইয়ের প্রচ্ছদেও জুড়ে দিয়েছিলেন হিচককের নামও। আর্থারের মতে, হিচককের নাম দেখলে মানুষ অনেক বেশি আকর্ষিত হবে। এমনিতেই রহস্যপ্রিয় মানুষ ছিলেন হিচকক। তা ছাড়া আর্থারের বইয়ের কাহিনিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি থ্রি ইনভেস্টিগেটরসের সঙ্গে নিজের নাম জুড়ে দিতে আপত্তি করলেন না। তাতে বইয়ের নাম দাঁড়াল আলফ্রেড হিচকক অ্যান্ড দ্য থ্রি ইনভেস্টিগেটরস : দ্য সিক্রেট অব টেরর ক্যাসল। আর সিরিজটির নাম হয়ে গেল 'আলফ্রেড হিচকক অ্যান্ড

AMARBOI.COM

রত্নচোর ধরতে গিয়ে পুরোনো শত্রু ও বোম্বেটে এক হয়ে আমদের তাড়া করলে আমরা ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে আবার সম্মেলন করে আমরা ভয়াল গিরি যাই। সব থেকে মজা হয় কালো জাহাজে করে পোচার ধরতে গিয়ে। ঘড়ির গোলমালের জন্য তোমার ছোড়া তির একটা বিড়ালকে কানা করে দেয়। কিন্তু খোঁড়া গোয়েন্দার বাক্সটা প্রয়োজন হওয়ায় আমাদের অথৈ সাগর পাড়ি দিতে হয়। সেখানে বুদ্ধির ঝিলিক দেখিয়ে গোলাপি মুক্তা নিয়ে প্রজাপতির খামারে হাজির হই। আচ্ছা, পাগল সংঘের কথা মনে আছে? ভাঙা ঘোড়ায় চড়ে ঢাকা (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা) আসা? সেখানে জলকন্যা দেখতে গিয়ে বেগুনি জলদস্যুর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে তেপান্তর যাত্রা? সেখানে সিংহের গর্জন শুনে ভয় পাওয়া? তোমার কি এখনো মনে পড়ে নাই? ঠিক আছে, পুরোনো ভূতের কথা তো মনে থাকার কথা। জাদু চক্রের ডাকে গাড়ির জাদুকর ডেকে আনা? প্রাচীন মূর্তি খুঁজতে আমাদের নিশাচর হয়ে দক্ষিণের দ্বীপে যেতে হয়। আমার নকল (কিশোর) দেখে ঈশ্বরের অশ্রুঝরা, তিন পিশাচের জন্য খাবারে বিষ মেশানো, ওয়ার্নিং বেল দিয়ে বিমান দুর্ঘটনা ঘটান, যে কারণে তোমার আজ এই অবস্থা। তবে সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হলো রেসের ঘোড়া খুন হওয়া। স্পেনের জাদুকর বানরের মুখোশ পরে ধূসর মেরুতে মূর্তির হুংকার দিয়ে কালো হাত দেখিয়ে আলোর সংকেত পেয়ে অভিনয় শুরু করে চিতা নিরুদ্দেশ করে চলে যায়। এদিকে পুরোনো কামান গেল কোথায় তা খুঁজতে আমরা ওকিমুরো করপোরেশন খুলে অপারেশন কক্সবাজার নামক অভিযানে যাই। সেখানে মায়া নেকড়ের তাড়া খেয়ে আমরা জিনার সেই দ্বীপে পৌঁছালে কুকুরখেকো ডাইনি গুপ্তচর শিকারির মাধ্যমে জানতে পারে এবং প্রেতাত্মার

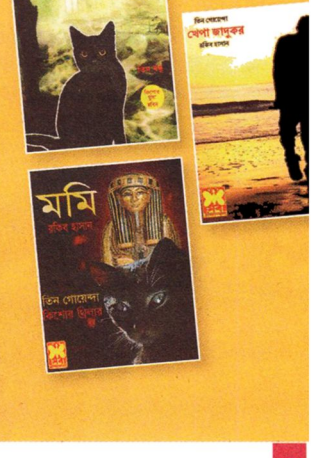

দ্য থ্রি ইনভেস্টিগেটরস'। অবশ্য নাম ব্যবহারের জন্য হিচককে বই বিক্রির রিয়েলটি থেকে কিছু অর্থও দিতে হতো। র‍্যান্ডম হাউস থেকে প্রকাশিত হতে লাগল বইটি। তারপরই যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল। বইটি কিশোরদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলল। পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হলো তিন কিশোর গোয়েন্দা জুপিটার জোনস, পিটার ক্রেনশো আর বব এন্ড্রিউসের। সিরিজের প্রথম বইটি এত জনপ্রিয় হবে, সেটি বোধ হয় খোদ লেখকও কল্পনা করেননি।

এ সিরিজ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই আশির দশকে রকিব হাসান লিখেছিলেন এ দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দা। থ্রি ইনভেস্টিগেটরসের জুপিটার জোনস বা জুপকে ঘষেমেজে অনেকটা বদলিয়ে তিনি বানালেন গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশাকে। মূল সিরিজের জুপ দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়াত গভীর রহস্য নিয়ে ভাবার সময়। সেই মুদ্রাদোষটি আছে আমাদের কিশোর পাশারও। বাদামিচুলো মার্কিন কিশোর পিটার ক্রেনশোকে একটু অদলবদল করে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ কালোচুলো মুসা আমানকে বানানোতেও ভালো মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন রকিব হাসান! আর আইরিশ মার্কিন রবিন মিলফোর্ড এসেছে থ্রি ইনভেস্টিগেটরসের রবার্ট বব এন্ড্রিউস থেকে। এই তিনজনই রকি বিচ নামের শহরেরই বাসিন্দা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, হলিউডের আশপাশে রকি বিচ নামের কোনো শহরের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই। ওই তিনজনের মতো এটাও কাল্পনিক!

থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজের প্রথম বই আলফ্রেড হিচকক অ্যান্ড দ্য থ্রি ইনভেস্টিগেটরস : দ্য সিক্রেট অব টেরর ক্যাসল প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪-তে। এর কাহিনি থেকেই তিন গোয়েন্দা সিরিজের জন্মবই তিন গোয়েন্দা লিখেছিলেন রকিব হাসান। একসময়ের বিখ্যাত অভিনেতা জন ফিলবির ভৌতিক

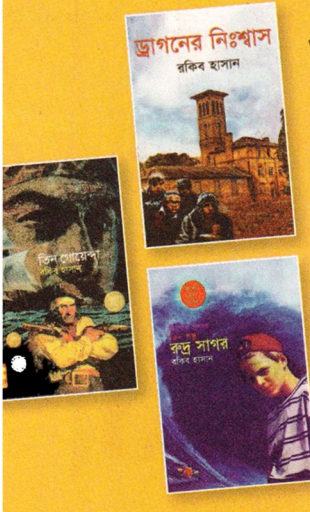

AMARBOI.COM

প্রতিশোধ কী হবে তা জানতে ঝামেলা ঐতিহাসিক দুর্গে যাওয়ার পথে হঠাৎ করে সোনার খোঁজে চলে যায়। এদিকে আমরা ডাকাতের পিছে গিয়ে এক বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠে ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপে আটকা পড়ে আরেক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দেখা পাই। সে তোমাকে মায়াজালে আটকে নরকে হাজির হয় আর আমাদের দুজনকে সৈকতে সাবধান থাকতে বলে। নরকে (হাজির) তুমি ভয়ংকর অসহায় হয়ে পড়লেও গোপন ফর্মুলা পেয়ে যাও। কিন্তু খেলার নেশায় মারাত্মক ভুল করায় তোমার ওপর প্রেতের ছায়া পড়ে, আর তুমি মাকড়সা মানব হয়ে রাত্রি ভয়ংকর করে তোলো। শেষে খ্যাপা কিশোর তোমাকে এই শয়তানের থাবা থেকে বাঁচায়। কিন্তু এক পতঙ্গ ব্যবসায়ী যুদ্ধ ঘোষণা করে জাল নোট ছাপানো শুরু করে আর তাই দিয়ে দ্বীপের মালিক হয়ে যায়। এক কিশোর জাদুঘর আমাদের যে নকশা দেয় তা মেনে আমরা মৃত্যু ঘড়িতে পৌঁছালেও বেঁচে ফিরি। তিন বিঘা জমি নিয়ে ভোরের পিশাচ আমাদের সঙ্গে টক্কর দিতে চাইলে আমাদের দক্ষিণে যাত্রা করতে হয়। সেখানে দিঘির দানো বিষের ভয়ে ভুল নিখোঁজ সংবাদ দিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করতে না পেরে ঠকবাজির দায়ে ফেরত পাঠায়। এরপর আমরা অভিশপ্ত লকেট নিয়ে চাঁদের ছায়া অনুসরণ করে জলদস্যুর মোহর খুঁজতে অপারেশন অ্যালিগেটর চালাই। কিন্তু স্কুলের নতুন স্যার এখানেও ঝামেলা শুরু করে। আসলে সে ছিল ডাকাত সর্দার। তবে আমরা তাকে দুর্গম কারাগারে পাঠাতে সক্ষম হই। এদিকে পিশাচ কন্যা ছদ্মবেশী গোয়েন্দা সেজে সময় সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে আবার ঝামেলা শুরু করে। তাই প্রত্নসন্ধান করার জন্য নিষিদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির রহস্যভেদের সেই অসাধারণ কাহিনি তো তোমাদের জানা। মূল বইতে টেরর ক্যাসলের ওই জন ফিলবি চরিত্রের নাম ছিল স্টিফেন টেরিল! চলচ্চিত্র পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের জন্য ভৌতিক বাড়ি খুঁজতে গিয়ে কী কাণ্ডটাই না করেছিল তিন গোয়েন্দা। সিরিজের এই ডেভিড ক্রিস্টোফার চরিত্রটি হিচককের আদলে বানানো। প্রথম দিকের বইগুলোতে তিন গোয়েন্দাকে তিনিই কেস জোগাড় করে দিতেন।

মূল সিরিজের বই ছিল ৪৩টি। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত এ সিরিজের সব বই কিন্তু রবার্ট আর্থার লেখেননি। তিনি লিখেছিলেন সিরিজের প্রথম ১০টি বই। *তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রুপালি মাকড়সা, মমি, রক্তচক্ষু, কাকাতুয়া রহস্য, ঘড়ির গোলমাল* বইগুলো মূলত রবার্ট আর্থারের বইয়ের কাহিনি থেকেই ধার করেছিলেন রকিব হাসান। ১৯৬৯ সালে মাত্র ৫৯ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে মারা যান রবার্ট আর্থার। ওই বছরেই থ্রি ইনভেস্টিগেটরস সিরিজে তাঁর লেখা শেষ বই দ্য মিস্টি অব দ্য টকিং স্কাল বেরিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতেও থেমে যায়নি ভীষণ জনপ্রিয় থ্রি ইনভেস্টিগেটরসের অসাধারণ অভিযানের কাহিনি। এরপর প্রায় ১৮ বছর চলেছিল সিরিজটি। ডেনিস লিন্ডস নামের এক লেখক ১৯৬৮ থেকে টানা ২০ বছর সিরিজের ১৩টি বই লিখেছিলেন। এম ভি ক্যারি বা ম্যারি ভার্জিনিয়া

এলাকা জবরদখল করতে হয়। বড়দিনের ছুটিতে বিড়াল উধাও হলে আমরা টাকার খেলা দেখি। এমন সময় একটা উড়ো চিঠি আসে যাতে লেখা 'আমি রবিন বলছি। আমি উল্কা রহস্য ভেদ করে ফেলেছি।' চিঠি পড়ে আমরা আনন্দের সঙ্গে নেকড়ের গুহায় নেতা নির্বাচন করি। এমন সময় সি সি সি রবে হারানো জাহাজ স্কাপদের চোখ দিয়ে আমাদের দেখা দেয়। আমরা আরও জানতে পারি, পোষা ডাইনোসরের মাছির সার্কাস পছন্দ। আমার মঞ্চভীতি থাকায় আমি ডিপ ফ্রিজে লুকালে কবরের প্রহরী তাসের খেলা খেলে খেলনা ভালুক পাঠায়। রাতে প্যাঁচার ডাকে প্রেতাত্মার অভিশাপ আসে যে, রক্তমাখা ছোরা দিয়ে স্পাইডারম্যান আমাকে মারবে। আমি মানুষখেকোর দেশে গেলে মাছেরা সাবধান করে বলে, সীমান্তে সংঘাত চলছে আর মরুভূমি আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। আমি যেন গরমের ছুটিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর চাঁদের পাহাড়ে না গিয়ে বাংলাদেশে (বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা) যাই। সেখানে রহস্যের খোঁজে গেলে টাক রহস্য পাই আর সেটা করতে জয়দেবপুরে (জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা) গেলে ভয়াল দানব বাঁশির (রহস্য) সুর শুনে মুগ্ধ হই। এদিকে নিশির ডাক শুনে ওঁটকি বাহিনী মেডেল রহস্যের সমাধান করতে চোরের আস্তানায় চলে যায়। আমরা টাইম ট্রাভেল করে এসে দেখি, শুঁটকি শত্রুরা চাঁদের অসুখে ভুগছে। অন্যদিকে দুখী মানুষ পাগলের গুপ্তধন নিয়ে মায়াপথে বন্দী। তার বিপদের গন্ধ পেয়ে এক ইউএফও (রহস্য) হীরার কার্তুজের বিনিময়ে তাকে আমরা উদ্ধার করে নিজেরাও বেঁচে ফিরে আসি। তোমার আশা করি সব মনে পরেছে? ইতি তোমার বন্ধু, গ্রেট কিশরিওসো।

নূর-এ-তাজীম

পর্দায় তিন গোয়েন্দা

কাগুজে বইয়ের তিন গোয়েন্দার বাইরে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে নাটক বা সিনেমাও বানানো হয়েছে। থ্রি ইনভেস্টিগেটরসকে নিয়ে এ পর্যন্ত দুটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে আইনস্টাইনের দেশ জার্মানিতে। ২০০৭ সালে প্রথম মুক্তি পাওয়া সিনেমার নাম *দ্য থ্রি ইনভেস্টিগেটরস : সিক্রেট অব স্কেলিটন আইল্যান্ড*। তবে এর কাহিনি রবার্ট আর্থারের মূল বইটির মতো নয়। এ সিনেমাতে দেখা যায় থ্রি ইনভেস্টিগেটরস আফ্রিকা গিয়েছে কুখ্যাত ছবি চোর ভিক্টর হিউজিনি ধরতে। ২০০৯ সালে মুক্তি পায় সিরিজের দ্বিতীয় ছবি *দ্য থ্রি ইনভেস্টিগেটরস : দ্য সিক্রেট অব টেরর ক্যাসল*। এতেও মূল কাহিনি থেকে বেশ রদবদল করেছেন পরিচালক বক্সমেয়ার। তবুও ভক্তমহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছে দুটি সিনেমাই।

আমাদের দেশেও কিন্তু তিন গোয়েন্দার কাহিনি নিয়ে নাটক তৈরি হয়েছে। কয়েক বছর আগে চ্যানেল আইয়ে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে প্রথম নাটকটি প্রচারিত হয়েছিল। আর এ বছর মাছরাঙা টেলিভিশনের পর্দায় প্রচারিত হচ্ছে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বানানো ধারবাহিক নাটক। রকিব হাসানের *অপারেশন কক্সবাজার* বইয়ের কাহিনি অবলম্বনে ধারাবাহিকটির কাহিনি বিন্যাস ও নাট্যরূপ দিয়েছেন মাজহারুল হক পিন্টু। পরিচালনা করেছেন আবুল হোসেন খোকন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যারি সিরিজের ১৫টি বই লেখেন ১৯৭১ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত সিরিজের শেষ বই দ্য মিস্ট্রি অব দ্য ক্রাংকি কালেকটর লিখেছিলেন এমভি ক্যারি। সিন্দবাদ অ্যান্ড মি লিখে এডগার এওয়ার্ডপ্রাপ্ত ছোটদের প্রিয় লেখক কিন প্যাট লেখেন সিরিজের দুটি বই। ১৪তম বই দ্য মিস্ট্রি অব কফিং ড্রাগন (১৯৭০) এবং ১৬তম বই দ্য মিস্ট্রি অব দ্য নার্ভাস লায়ন (১৯৭১) বই দুটি তিনি লিখেছিলেন নিক ওয়েস্ট ছদ্মনামে। সিরিজের বাদবাকি তিনটি লিখেছিলেন সুলেখক মার্ক ব্র্যান্ডল। ১৯৮৯ সালে র‍্যান্ডম হাউস 'দ্য থ্রি ইনভেস্টিগেটরস : ক্রাইম বাস্টার্স' নাম দিয়ে সিরিজটি আবার প্রকাশ করতে শুরু করে। ১১টি বই প্রকাশের পর রবার্ট আর্থারের পরিবারের সঙ্গে প্রকাশনীর কিছু আইনি জটিলতায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সিরিজটি। এদিকে থ্রি ইনভেস্টিগেটরস বইয়ের প্রচ্ছদ অলংকরণ করতেন হ্যারি কেইন। এ ছাড়া এড ভ্যাবেল, জ্যাক হার্ন, হার্ব মট, স্টিফেন মার্কেসের মতো ডাকসাইটে আঁকিয়েরা সিরিজের প্রচ্ছদ ও অলংকরণে মুনশিয়ানা দেখিয়েছিলেন।

এ তো গেল থ্রি ইনভেস্টিগেটরসের কেচ্ছা। তিন গোয়েন্দার কাহিনি কি শুধু থ্রি ইনভেস্টিগেটরস থেকেই এসেছিল? উঁহু! এ সিরিজটি ছাড়াও বিশ্বের আরও অনেক জনপ্রিয় সিরিজ বা বই থেকে এসেছে তিন গোয়েন্দার মসলাপাতি। সে জন্যই তিন গোয়েন্দার স্বাদে এত ভিন্নতা। লেখক যেসব বিদেশি বই থেকে তিন গোয়েন্দা লিখেছেন সেদিকে একটু

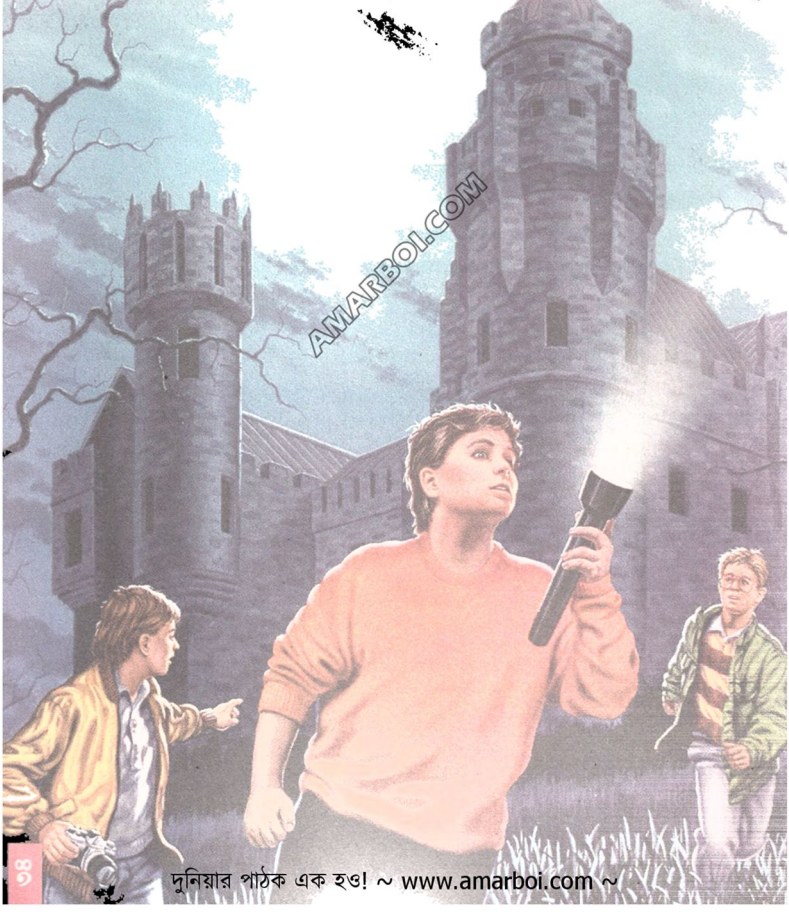

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজর দেওয়া যাক। ফাইভ অন আ ট্রেজার আইল্যান্ড বইয়ের মাধ্যমে জুলিয়ান, ডিক, অ্যান, জর্জিনা আর টিমি তথা বিশ্বখ্যাত সিরিজ ফেমাস ফাইভ-এর আবির্ভাব ঘটে। জনপ্রিয় ব্রিটিশ লেখিকা এনিড ব্লাইটনের হাতে ১৯৪২ সালে জন্ম হয় শিশু-কিশোর উপযোগী চমৎকার এ সিরিজটির। ১৯৪২ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ফেমাস ফাইভ সিরিজের ২১টি বই প্রকাশিত হয়েছিল। এই ফেমাস ফাইভের জর্জিনা জর্জ কিরিন থেকেই তিন গোয়েন্দার জিনা এসেছে। আর তার কুকুর রাফিয়ানকে ধার করা হয়েছে জর্জিনার কুকুর টিমির চরিত্র থেকে। 'ফেমাস ফাইভ' সিরিজ থেকে রকিব হাসান তিন গোয়েন্দা লেখার সময় ফেমাস ফাইভের জর্জিনা কিরিনের চাচাতো ভাইবোন তথা দুই ভাই জুলিয়ান, ডিক আর তাদের বোন অ্যানকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিন গোয়েন্দার কিশোর, মুসা আর রবিনে পরিবর্তন করেন। জিনার সেই গোবেল আইল্যান্ডের কথা তো তোমরা জানোই। ফেমাস ফাইভের কিরিন আইল্যান্ড থেকেই গোবেল আইল্যান্ডের উদ্ভব।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত ফ্রাঙ্কলিন ডবিউ ডিকসন লিখতে শুরু করেছিলেন জনপ্রিয় শিশু-কিশোর সিরিজ 'দ্য হার্ডি বয়েজ মিস্ট্রি স্টোরিস'। তিন গোয়েন্দার অনেক বইয়ের কাহিনি এসেছে এই হার্ডি বয়েজের কাহিনি থেকেই। এই সিরিজের প্রধান চরিত্র দুই ভাই ফ্রাঙ্ক হার্ডি আর জো হার্ডি। জাফর চৌধুরী ছদ্মনামে রকিব হাসান দুই ভাই রেজা আর সুজাকে নিয়ে 'রোমহর্ষক' নামের আরেক সিরিজ লিখতেন, যেটা ওই 'হার্ডি বয়েজ সিরিজ থেকেই। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন জোনসের 'বিগলস' সিরিজ থেকে এসেছে মিসরীয় বংশোদ্ভূত বৈমানিক ওমর শরীফের কাহিনিগুলো। আবার উইলার্ড প্রাইসের অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ অবলম্বনে ভীষণ অরণ্যর মতো বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে।

শামসুদ্দীন নওয়াব যখন সিরিজের হাল ধরেন, তখন তিন গোয়েন্দাতে এনিড ব্লাইটনের 'ফারাওয়ে ট্রিজ' এবং ক্রিস্টোফার পাইকের 'স্পুকসভিল' সিরিজও ঢুকে পড়ে। রকিব হাসানের 'তিন বন্ধু'

কাজী শাহনূর হোসেন

কখনো ভাবিনি বড় হয়ে তিন গোয়েন্দা লিখব

—কাজী শাহনূর হোসেন

সেবা প্রকাশনী থেকে এখন যে তিন গোয়েন্দা সিরিজ প্রকাশিত হচ্ছে, সেটি লিখছেন শামসুদ্দীন নওয়াব। এটি মূলত কাজী আনোয়ার হোসেনেরই আরেকটি ছদ্মনাম। তবে কাজী আনোয়ার হোসেন ছাড়াও রকিব হাসান, কাজী শাহনূর হোসেন ও কাজী মায়মুর হোসেনের লেখা বই এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিন গোয়েন্দা সিরিজ শামসুদ্দীন নওয়াব ছদ্মনামে লিখছেন কাজী আনোয়ার হোসেনেরই বড় ছেলে কাজী শাহনূর হোসেন। কথা হলো তাঁর সঙ্গে—

কখন থেকে আপনি তিন গোয়েন্দা লিখছেন?

তিন গোয়েন্দা এখন ভলিউম আকারে প্রকাশিত হয়। একেকটা ভলিউমে নানা আকারের তিনটি গল্প থাকে। আমি মূলত ভলিউম ৫৯ থেকে লেখা শুরু করেছি। শিগগিরই আসছে ১৩৬ নম্বর ভলিউম। তবে এর মধ্যে বেশ কিছু আছে রকিব চাচার (রকিব হাসান) লেখা।

তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান তো এখনো তিন গোয়েন্দা লিখছেন?

হ্যাঁ। তিনিই তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা। আমি যখন ছোট, তখন রকিব চাচার তিন গোয়েন্দা পড়েই বড় হয়েছি। শুরুটা হলো ১৯৮৫ সালে। আমি তখন দশম শ্রেণিতে পড়ি। কখনো ভাবিনি বড় হয়ে তিন গোয়েন্দা লিখব। তবে রকিব চাচা এখনো প্রায়ই সেবা প্রকাশনীর জন্য তিন গোয়েন্দা লেখেন। আর 'কিশোর মুসা রবিন সিরিজ' নামে অন্য প্রকাশনী থেকে তো লিখছেনই।

রকিব হাসানের তৈরি তিন গোয়েন্দা আপনি কন্টিনিউ করছেন এখন সেবা প্রকাশনী থেকে। চরিত্রগুলোয় কি কোনো পরিবর্তন এসেছে?

না, একদমই না। তারা আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনই আছে। এখনো কিশোর নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটে, মুসা খাইছে বলে ওঠে।

আপনার প্রথম লেখা তিন গোয়েন্দা কোনটি?

ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা। এটা লিখেছিলাম ২০০৩ সালে। তবে সেটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত হয়েছিল রকিব হাসান নামে। আর শামসুদ্দীন নওয়াব নামে আমার লেখা প্রথম প্রকাশিত বই *নিশির ডাক*। ২০০৪ সালে প্রকাশিত।

বড় হয়ে কি আপনি লেখকই হতে চেয়েছিলেন?

লেখক হতে চাইনি এটা নিশ্চিত। আমার বাবা কাজী আনোয়ার হোসেনের কারণেই আমার লেখালেখিতে আসা। কোনো একটা লেখা লিখে তাঁকে দিতাম। তিনি এডিট করে ঠিকঠাক করে দিতেন। তবে আমি সম্ভবত শুধুই ব্যবসায়ী হতে চেয়েছিলাম। আর আছে না, পাইলট, বিজ্ঞানী—এসবে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না কখনোই। আমি ঘরকুনো স্বভাবের মানুষ। ঘরের বাইরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না, এখনো নেই।

তিন গোয়েন্দা যেখান থেকে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে, আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসের কাল্পনিক রকি বিচ। সেখানে কি যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে কখনো?

না, একদমই না। ওই যে বললাম না আমি ঘরকুনো মানুষ। দেশের বাইরে যাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছা নেই।

তিন গোয়েন্দা নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের পাগলামি...

প্রতিদিন প্রচুর ফোন পাই। এই যে দেখেন এই মেয়েটা (সামনে লাল কালিতে কাগজে লেখা একটা নাম দেখিয়ে)—মৌরী নামের এক কিশোরী, সে একটু আগে ফোন দিয়েছে। তার নাম যেকোনোভাবেই হোক আগামী কোনো এক তিন গোয়েন্দায় কিশোর, মুসা বা রবিনের বন্ধু হিসেবে দিতে হবে বা অন্য কোনোভাবে থাকতে হবে। পাঠকদের আরও কত আবদার!

আপনার প্রিয় তিন গোয়েন্দা...

১৩৪ নম্বর ভলিউমের রাজা আর্থারের গুপ্তধন। দারুণ একটা কাহিনি।

তিনটি চরিত্রের মধ্যে কি আলাদা করে কোনো চরিত্রের প্রতি আপনার দুর্বলতা আছে?

হ্যাঁ। রবিন আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমাকে যদি বলা হতো আমি কী হতে চাই, তাহলে বলতাম, আমি তার মতো পড়ুয়া আর গবেষকই হতে চাই।

তিন গোয়েন্দার ৩০ বছর উপলক্ষে কিশোর কি কিছু বলবে আমেরিকার রকি বিচ থেকে?

হ্যাল্লো কিশোর বন্ধুরা, আমি কিশোর পাশা বলছি। তোমরা 'তিন গোয়েন্দা' পড়ছ বলেই ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে এই সিরিজটি। তোমরা চাইলে আরও শত শত বছর ধরে বের হবে এই সিরিজ। তোমাদের সবার মঙ্গল কামনা করছি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছে **সিমু নাসের**

সিরিজে স্পুকসভিল প্রথম এসেছে। স্পুকসভিল একটা ভুতুড়ে শহরের নাম। রকিব হাসান তার কাহিনিতে এর নাম রেখেছেন 'ডেথ সিটি'। তিন গোয়েন্দা সিরিজে ডেথ সিটির সমস্ত কাহিনিই (একটা বাদে) রকিব হাসানের লেখা। আর এল স্টাইনের 'গুজবাম্প' সিরিজের বইও ঢুকেছে শামসুদ্দীন নওয়াবের সিরিজে। বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে কাজী শাহনূর হোসেনের লেখা নীল-ছোটমামা সিরিজটির কাহিনিও তিন গোয়েন্দাতে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার বিদেশি কাহিনি অবলম্বনেই টিপু কিবরিয়ার লেখা হরর ক্লাব সিরিজের কিছু বইও তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর করা হয়েছে। রূপান্তরিত হয়েছে রকিব হাসানের ছদ্মনাম 'আবু সাঈদ' ও 'জাফর চৌধুরি' ছদ্মনামে লেখা 'গোয়েন্দা রাজু' ও 'রোমহর্ষক' সিরিজের বইগুলো। এ বইগুলোর ক্ষেত্রে রকিব হাসান আবারও ছদ্মনামের আশ্রয় নিলেন। শামসুদ্দীন নওয়াবের নামে বইগুলো রূপান্তর করলেন তিনি। রকিব হাসানের মতোই হার্ডি বয়েজসহ আরও কয়েকটি বিদেশি সিরিজ থেকে কাহিনি নিয়েছেন শামসুদ্দীন নওয়াব। তিন গোয়েন্দা এভাবে বিশ্বের বিস্তর বই আর সিরিজ থেকে কাহিনি ধার করে লেখা। তাই সিরিজটি পড়ে সহজেই বিশ্বের নাম না জানা অসংখ্য বইয়ের কাহিনি পড়ে ফেলা যায়। এটা অনেক ভালো একটা দিক। বিশ্বের অনেক দেশের শিশু-কিশোরেরাই এ সুযোগ পায় না। সেদিক দিয়ে তোমরা অনেক ভাগ্যবান।

তিন গোয়েন্দার একেকটি কাহিনি টিনএজারদের কাছে অমূল্য অমৃত! কী নেই তিন গোয়েন্দায়? রোমহর্ষক অভিযান, মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া বুদ্ধির প্যাঁচ, অবাক করা সব অজানা তথ্য, কত শত দেশের কত শত জায়গা, বিচিত্র সব মানুষ আর বিস্তর ভালো লাগার উপকরণ। তিন গোয়েন্দার অপূর্ব জগতে একবার ঢুকলে ঘরে বসেই পাওয়া যায় দূর দেশ, দ্বীপ, সাগর, বন, পাহাড় আর বহুদূরের আকাশ পাড়ি দেওয়ার আশ্চর্য সব উপকরণ। রহস্যের মারপ্যাঁচে মস্তিষ্ক ঝালিয়ে নেওয়া যায় সহজেই। ভূগোল, প্রকৃতি কিংবা বিজ্ঞানের অনেক অজানা জ্ঞানও তোমার নাকের ডগায় এসে খাবি খায় এই তিন গোয়েন্দার বদৌলতেই!

তোমরা তো জানোই তিন গোয়েন্দা আসলে কী করে, তাদের কাজ কী। তারপরও চলো তাদের দু-একটা গল্প শুঁকেটুকে দেখি তাদের গল্প আসলে কী রকম ঝাঁজের! তিন গোয়েন্দার বই দিয়ে তিন গোয়েন্দার গল্প লেখা শুরু করেছিলেন রকিব হাসান। কিশোর-মুসা-রবিন নামের রকি বিচের তিন কিশোর এক গোয়েন্দা বাহিনী বানিয়ে ফেলল হুট করে। নাম তিন গোয়েন্দা। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির জন্য তো রহস্য প্রয়োজন। তা ছাড়া এ কাজে পরিচিতিও চাই। তবেই না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মক্কেল আসবে নানা পদের রহস্য নিয়ে। কিন্তু রহস্য তো আর ক্লাসের হোমওয়ার্ক নয় যে, না চাইতেই ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে। তবে উপায়?

উপায়ও ঠিক ঠিক বেরিয়ে গেল কিশোর পাশার ক্ষুরধার মগজ থেকে। বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার ভূতের সিনেমা বানাবেন। তার জন্য ভুতুড়ে বাড়ি দরকার। তিন গোয়েন্দা বাগিয়ে নিল ভুতুড়ে বাড়ি খোঁজার কাজ। বিনিময়ে ক্রিস্টোফার তিন গোয়েন্দার নাম চারদিকে ছড়িয়ে দিতেও সাহায্য করবেন। খুঁজে পেতে হলিউডের পাশেই 'টেরর ক্যাসল' নামের এক ভুতুড়ে বাড়ির সন্ধান পেল তিন গোয়েন্দা। নির্বাক যুগের অভিনেতা জন ফিলবি বাড়িটির মালিক ছিলেন। সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান তিনি। তবে মরার আগে নোট লিখে যান, তার প্রেতাত্মা বাড়িটাকে পাহারা দেবে আর কেউ এ বাড়িতে বাস করতে পারবে না। এরপর টেরর ক্যাসলে কেউই এক রাতও কাটাতে পারেনি। কিন্তু তিন গোয়েন্দা ভূতের তাড়া খেয়েও নাছোড়বান্দার মতো বারবার গেল টেরর ক্যাসেলে। শেষমেশ হার মানল টেরর ক্যাসলের ভূত। বেরিয়ে এল এক রোমহর্ষক সত্য। সেই সত্যটা কী সেটা জানতে অবশ্যই পড়তে হবে বইটা।

তিন গোয়েন্দা কি শুধু রকি বিচেই গোয়েন্দাগিরি করে? মোটেই না। তাদের পদচারণ সাগরের অতল থেকে ভিনগ্রহ পর্যন্ত! তদন্ত আর অভিযানের প্রয়োজনে তারা চষে বেড়ায় নানা দেশ। 'ভীষণ অরণ্য' বইতে ভয়ংকর আমাজনে আর 'পোচার' গল্পে আফ্রিকার জঙ্গলে যেতে হয়েছে তাদের। তেমনি *অথৈ সাগর*-এর মতো অনেক বইয়ে সাগর আর দ্বীপ চষে বেড়াতে হয়েছে তাদের। এই যেমন 'জলদস্যুর দ্বীপ' পড়লে ওদের সঙ্গে যেতে পারবে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। তিন শ বছর আগে সাগরের ত্রাস জলদস্যু লুই ডেকেইনির মৃত্যু হলো এক অভিশপ্ত ডাবলুনের (স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রা) অভিশাপে। ঘটনাচক্রে বব কলিনসের সঙ্গে দেখা কিশোর আর মুসার। তার বরাতেই তিন শ বছর পর তিন গোয়েন্দার হাতে পড়ল সেই অভিশপ্ত ডাবলুনটা। তারপরই তিন গোয়েন্দার কপালে নামল একের পর এক দুর্ভোগ। ববের বাবার শেষ চিঠিতে ওরা জানতে পারল, প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে লুকানো আছে জলদস্যুদের ধনরত্ন। সেই গুপ্তধন খুঁজতে সেই দ্বীপে বব কলিনস আর বৈমানিক ওমর শরিফকে নিয়ে হানা দিল কিশোর-মুসা। নানা বিপদ সত্ত্বেও একসময় কিশোরেরা সন্ধান পেল সেই গুপ্তধন। কিন্তু পিছু ছাড়ল না ডাবলুনের অভিশাপ। ডাকাত বিগ হ্যামার আর তার দলবল বাধা হয়ে দাঁড়াল ওদের পথে। নিরস্ত্র গোয়েন্দাদের কাছ থেকে মোহর ছিনিয়ে নিতে উঠেপড়ে লাগল তারা। তারপর?

AMARBOI.COM

তিন গোয়েন্দার জার্মান সংস্করণ 'ডাই ড্রেই' জার্মানিতে দারুণ জনপ্রিয়

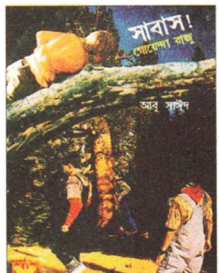

শিশুদের জন্য আবু সাঈদ নামে রকিব হাসান লিখেছিলেন গোয়েন্দা রাজু সিরিজ

শুধু জঙ্গল আর সাগরই নয়, বরফরাজ্য অ্যান্টার্কটিকায় আর সাহারা মরুভূমিতেও গেছে তারা। এমনকি পৃথিবীর বাইরেও যেতে হয়েছে তাদের! কিশোর পাশার বাড়ি বাংলাদেশে; সেই সুবাদে তিন গোয়েন্দা এসেছে বাংলাদেশেও। শুধু বেড়িয়ে নয়, রহস্যেরও সমাধান করে গেছে তারা। 'ঢাকায় তিন গোয়েন্দা', 'অপারেশন কক্সবাজার', 'বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা', 'জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা' তারই নমুনা।

কিশোর-মুসা-রবিনদের পরিচিত হওয়ার গল্পটাও বেশ মজার। 'ঝামেলা' বইয়ে আছে সেই গল্প। ওরা তিনজনই তখন ছোট। মুসা আর রবিন থাকে গ্রিন হিলসে। সেই শহরেই এক বাড়ি রহস্যজনকভাবে পুড়ে গেল। সেই বাড়ি দেখতে গিয়েই ওদের সঙ্গে পরিচয় হয় কিশোর পাশার। এরপর পুড়ে যাওয়া বাড়ির রহস্য উদ্‌ঘাটন করল তারা। ধরা পড়ল কালপ্রিট। তারপর কিশোর-মুসা-রবিন বন্ধু হয়ে গেল। গ্রিনহিলস থেকে রকি বিচে ফিরে তারা খুলে বসল 'তিন গোয়েন্দা'।

তিন গোয়েন্দার গল্পগুলোতে রহস্য ছাড়াও আছে ভুতুড়ে কাণ্ড, ফ্যান্টাসির ভেলকি, হাসির কাণ্ডকারখানাসহ অনেক কিছু। গ্রিনহিলসের পুলিশম্যান ফগর‍্যাম্পারকটকে নিয়ে কাহিনিগুলো পড়ে হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে। তেমনি *ভয়ংকর*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহায়, চাঁদের অসুখ, ভ্যাম্পায়ার দ্বীপ-এর মতো বইগুলো পড়ে গায়ের রোম খাড়া হতে বাধ্য! তিন গোয়েন্দার কিছু বইতে তুমি পাবে নির্ভেলা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির গন্ধ। ফ্যান্টাসি, থ্রিলার কাহিনিও অন্তর্ভুক্ত আছে এ সিরিজে। এগুলো পড়তে গেলে নিজের অজান্তেই গল্পেরই একটা চরিত্র হয়ে যাবে তুমি। আবার তিন গোয়েন্দার চিরশত্রু ওটকি টেরি, ফগর‍্যাম্পারকট হয়ে যাবে তোমারও শত্রু। তেমনি জিনা, ফারিয়া, বব র‍্যাম্পারকট, টম, বিড কিংবা রাফি-টিটু-কিকোরাও বন্ধু হয়ে যাবে তোমার। তিন গোয়েন্দার মজাটা ঠিক এখানেই!

পাঠ্যবই যখন বিস্বাদ লাগে, তখনই তিন গোয়েন্দার পাতায় পাওয়া যায় একটু স্বস্তির নিশ্বাস। কারণ, এখানেই কল্পনার বল্গা হরিণ ছোটানো যায় ইচ্ছেমতো। তিন গোয়েন্দার পাতায় পাতায় নিমেষেই কেটে যায় সময়। সে জন্যই তিন গোয়েন্দার বই হাতে নিয়ে শিক্ষকের হুমকি, মা-বাবার বকুনি কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া নিমেষে ভুলে যায় সবাই। এ জন্যই তিন গোয়েন্দা সবার এত আপন। আগেই বলেছি, ৩০ বছর আগে এই আগস্টেই জন্ম নিয়েছিল তিন গোয়েন্দা। কিন্তু এই ৩০ বছর পরও সেই আগের মতোই চিরকিশোর রয়ে গেছে তারা।

অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে তিন গোয়েন্দার এই টিকে থাকার গল্পও তাদের রহস্য কাহিনির মতোই রোমাঞ্চকর। এই তিন দশকে রকিব হাসানের সৃষ্ট তিন গোয়েন্দার জনপ্রিয়তায় ভাটা তো পড়েইনি, উল্টো এর জনপ্রিয়তা বেড়েছে কয়েক গুণ। তাই পাঠক চাহিদা মেটাতে এখন সেবা প্রকাশনী ছাড়াও 'প্রথমা' আর 'কথামেলা প্রকাশনী' থেকেও রকিব হাসানের রচনায় তিন গোয়েন্দার কাহিনি নিয়ে বই প্রকাশিত হচ্ছে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। দৈনিক পত্রিকার পাতা, বিভিন্ন ঈদসংখ্যা, মাসিক ম্যাগাজিনও রকিব হাসানের কিশোর-মুসা-রবিনকে নিয়ে লেখা কাহিনি ছাপছে।

যাহোক, কোঁকড়াচুলো-খাইছে-বইপোকা এই তিন কিশোর প্রজন্মের পর প্রজন্মকে রহস্য-রোমাঞ্চের নেশাতুর সম্মোহনে বেঁধে রাখুক, এটাই সব কিশোরের চাওয়া। সদ্য ত্রিশে পা দেওয়া সদা কিশোর তিন গোয়েন্দার জন্য অসংখ্য শুভকামনা রইল। থ্রি চিয়ার্স ফর তিন গোয়েন্দা, হিপ...হিপ...হুররেএএ..!!!

তথ্যসূত্র : *দি থ্রি ইনভেস্টিগেটরস* : ডেভিড বম্যান ও সেথ স্মলিনস্কি; উইকিপিডিয়া

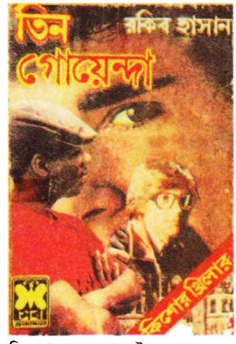

তিন গোয়েন্দার প্রথম বইয়ের প্রচ্ছদ করেছিলেন শরাফত খান

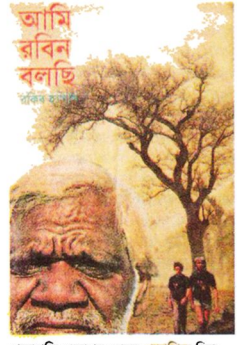

প্রজাপতি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত তিন বন্ধু সিরিজের প্রথম বইয়ের প্রচ্ছদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

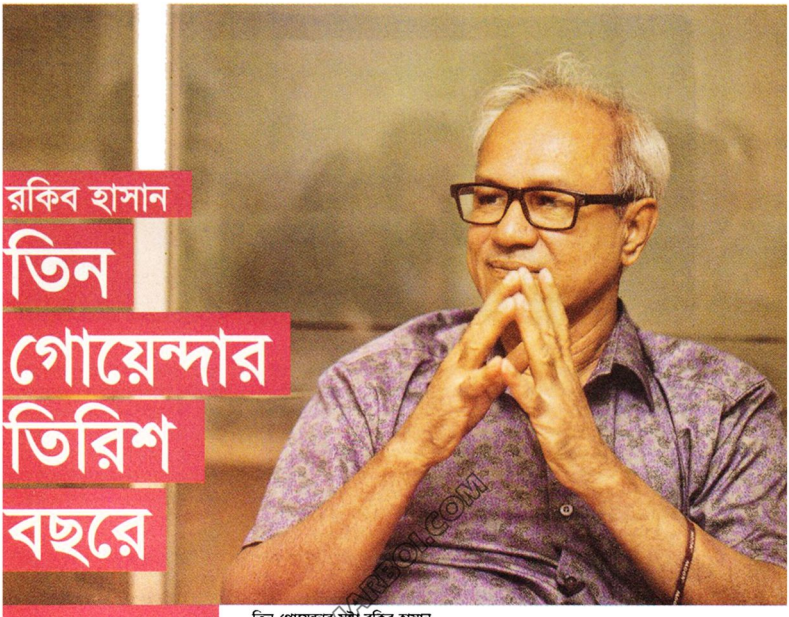

রকিব হাসান
তিন গোয়েন্দার তিরিশ বছরে

তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা রকিব হাসান

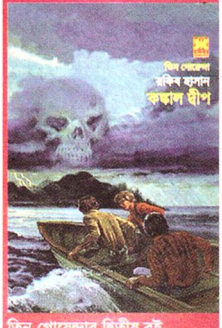

তিন গোয়েন্দার দ্বিতীয় বই
কঙ্কাল দ্বীপ

কিআ থেকে ফোন এল। সিমু নাসের। হেসে বলল, রকিব ভাই, 'তিন গোয়েন্দা'র তিরিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমাদের আগস্ট সংখ্যার জন্য আপনাকে একটা সাক্ষাৎকার দিতে হবে। অবাক হলাম। বললাম, তিরিশ বছর হয়ে গেছে? আমার তো মনেই ছিল না। সিমু জবাব দিল, আমাদের আছে। আপনার ভক্তরা ঠিকই মনে রেখেছে। বললাম, ভাই, আমি তো সাক্ষাৎকার দিই না। কিন্তু রীতিমতো জোর খাটাল সিমু, বলল, কিন্তু আপনার ভক্তদের আপনি এভাবে নিরাশ করতে পারেন না।

কী আর করা। রাজি হয়ে গেলাম। পারতপক্ষে আমি সাক্ষাৎকার দিই না, কিন্তু সিমু আমাকে বোঝাতে পেরেছে, তিন গোয়েন্দার পাঠকদের আমার অবহেলা করা উচিত নয়। ওদের অনুরোধে অবশ্যই সাড়া দেওয়া উচিত। তিন গোয়েন্দা সম্পর্কে অজানা তথ্যগুলো ওদের জানার অধিকার আছে। সিমুর যুক্তি মেনে নিয়েই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে নিজের অনমনীয় ভাবটা পরিহার করে সাক্ষাৎকারটা দিতে রাজি হয়েছি।

নির্দিষ্ট দিনে কিশোর আলোর অফিসে গিয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেওয়ার পর আরেকটা অনুরোধ এল, তিন গোয়েন্দার তিরিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমাকে কিছু লিখে দিতে হবে। চিন্তায়ই পড়ে গেলাম। সাক্ষাৎকারেই তো সব বলে ফেলেছি। নতুন আর কী লিখব? ভাবলাম, তিন গোয়েন্দার জন্ম-বৃত্তান্ত লিখি। যদিও সেটাও অনেকেরই জানা, তবু আরেকবার লিখি।

১৯৮৩ সালের কথা। তখন সেবায় নিয়মিত লিখি। আর কোনো কাজ নেই, শুধুই বই লেখা। বাসায় বসে লিখতে লিখতে বিরক্ত হয়ে গেলাম। বৈচিত্র্য দরকার। ঠিক করলাম, অফিস করব। আমার পরিকল্পনার কথা সেবা প্রকাশনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

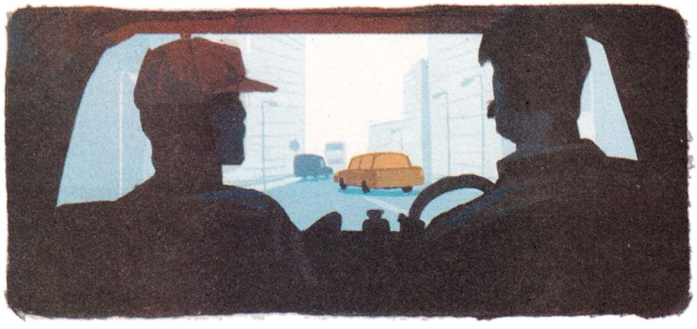

কর্ণধার কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবকে বললে তিনি হাসতে লাগলেন : তবে তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হলাম এতে আমার লেখার পরিমাণ বাড়বে, কাজেও উৎসাহ পাব। তিনি আমাকে একটা ঘর দিলেন, চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা করে দিলেন। হাতের লেখা ভালো না বলে বাংলা টাইপরাইটারে লিখতাম। বাসায় একটা টাইপরাইটার ছিল, আরেকটা কিনে অফিসে রাখলাম। তারপর নিয়মিত টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত-তরকারি নিয়ে সকালে উঠে 'অফিসে' যাওয়া শুরু করলাম। প্রায় বত্রিশ বছর আগের কথা, ঢাকা শহরে লোকসংখ্যা ছিল অনেক কম, রাস্তাগুলোর বেশির ভাগই থাকত প্রায় ঈদের ছুটির মতো ফাঁকা, যানজট দেখেছি খুবই কম, বাসে চড়তে হতো না, মিরপুর থেকে মোটরসাইকেলে যাতায়াত করতাম, তবুও এই 'অফিস-বিলাস'-এর কষ্ট বেশি দিন ভালো লাগেনি। কয়েক দিন যেতে না যেতে নিজের কাছেই পাগলামি মনে হতে লাগল ব্যাপারটা। যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। তবে তত দিনে যা ঘটার ঘটে গেছে, অর্থাৎ তিন গোয়েন্দার শুরু।

আমি তখন অ্যারাবিয়ান নাইটস অনুবাদে ব্যস্ত। সেবার অফিসে একদিন দুপুরের খাবার খাওয়ার পর চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করছি। টেবিলের এক কোণে পড়ে আছে একটা ইংরেজি বই, পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে কেনা, পড়া হয়ে ওঠেনি। বইটার ওপর ধুলো জমে গেছে। ধুলো মুছে নামটার দিকে তাকালাম। এত লম্বা নাম, কী জানি কেন কৌতূহল হলো, গুনে দেখি তেরোটা শব্দ। আনলাকি থার্টিন! মনে মনে হাসলাম। আমি এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। তবে 'আনলাকি'ই যে আমার জন্য 'লাকি' বনে যাবে, কল্পনাও করিনি তখন।

যে বইটার কথা বললাম, সেটা কিশোরদের বই। তার ওপর আবার সিরিজের। আমার ধারণা ছিল, সিরিজগুলো খুব একটা ভালো হয় না। ক্লাসিক ছাড়া অন্য কিছু অনুবাদ করতে ভালো লাগত না সে সময়। তাই কিছুটা তাচ্ছিল্য নিয়েই পড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু করলাম। প্রথম অধ্যায়েই গল্পটা আমাকে আটকে ফেলল। এত দ্রুত টেনে নিয়ে গেল, এক বসায় পড়ে শেষ করে ফেললাম। অদ্ভুত এক অনুভূতি। অসামান্য ভালো লাগা। বইটা আমাকে এক নতুন ভাবনার খোরাক দিল। ছোটবেলায় দস্যু বাহরাম, দস্যু মোহন, শরদিন্দু, স্বপন কুমার সিরিজসহ আরও অনেক গোয়েন্দা গল্প পড়েছি। ওগুলো কোনোটাই ছোটদের উপযোগী ছিল না। বিষয়বস্তু বড়দের। তাতে প্রেম-ভালোবাসা, ভায়োলেন্স এত প্রকটভাবে থাকত, গুরুজনদের সামনে ওসব বই হাতে নিতেও লজ্জা লাগত। তাঁরাও ওগুলোকে ভালো চোখে দেখতেন না। তবু কী করব, সেকালে বইয়ের এত অভাব ছিল, যা পেতাম তাই পড়তাম। তখনো ইংরেজিতে গল্পের বই পড়া শিখিনি, ফলে বিদেশে যে কত ভালো ভালো বই লেখা হচ্ছে, জানতামও না। তখনকার দিনে ইন্টারনেট ছিল না, সহজে কোনো তথ্য জোগাড় করাও সম্ভব ছিল না। বড় হয়ে যখন ইংরেজি পড়া শিখলাম, তখন পড়া শুরু করলাম বড়দের বই, কারণ আমি নিজেও তখন বড় হয়ে গেছি।

যাহোক, সেদিন ওই কিশোরদের বইটা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। মনে হলো ছোটবেলায় এ জিনিসই তো আমি চেয়েছিলাম। মাথায় ঢুকল কিশোরদের উপযোগী একটা সিরিজ লেখার চিন্তা। আরব্য রজনীর অনুবাদ কিছুদিনের জন্য বাদ দিয়ে ইংরেজিতে লেখা ছোটদের উপযোগী অ্যাডভেঞ্চার আর গোয়েন্দা সিরিজগুলো জোগাড় করে পড়া শুরু করলাম। ধীরে ধীরে আইডিয়া দানা বাঁধতে লাগল মগজে। কী করব, কী করতে চাই, বুঝে গেলাম। কাজী সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন। সিরিজ ছাপতে রাজি হলেন।

দেরি না করে প্রথম বইটা লিখে ফেললাম। ভাবতে লাগলাম, বিদেশি পটভূমিতে লেখা বই, পাঠক নেবে তো? বাজারে না ছাড়লে বোঝা যাবে না। ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে ছাড়া হলো তিন গোয়েন্দার প্রথম বই 'তিন গোয়েন্দা'। বাজারে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিট। জন্ম নিল 'তিন গোয়েন্দা'। তারপর নিয়মিত প্রায় প্রতি মাসেই বেরোতে থাকল 'তিন গোয়েন্দা' সিরিজের বই। জনপ্রিয়তার সীমা ছাড়াতে থাকল। আমার কল্পনাকে হার মানাল। আমার নিজের মৌলিক রচনা নয় এগুলো, বিদেশি কাহিনি থেকে অ্যাডাপ্ট করা, তবু এগুলোই যে পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি করল, তাতে আমি অভিভূত না হয়ে পারলাম না।

কাজী আনোয়ার হোসেন। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই রকিব হাসান শুরু করেন তিন গোয়েন্দা

AMARBOI.COM

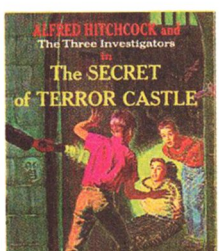

তারপর, ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'প্রজাপতি প্রকাশন'-এর যাত্রা শুরু হলো। অনেক দিন থেকেই হোয়াইট প্রিন্টে সুন্দর কাগজে সুন্দর কভারে তিন গোয়েন্দা ছাপার স্বপ্ন দেখছিলাম। প্রজাপতি আমার সে আশা কিছুটা হলেও পূরণ করল। তবে 'তিন গোয়েন্দা' নামে নয়। কাজী সাহেব বললেন, 'তিন গোয়েন্দা' প্রজাপতিতে কম চলবে, কারণ হোয়াইট প্রিন্টের দাম বেশি। 'তিন গোয়েন্দা' সেবাতেই থাক, কিশোর মুসা রবিনকে নিয়ে প্রজাপতিতে অন্য কোনো শিরোনামে লিখুন। এবং বইগুলো যাতে ছোট হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। লিখলাম, 'তিন বন্ধু'। প্রজাপতি প্রকাশন যথাসম্ভব কম দামে সেগুলো বাজারে ছাড়ল। প্রথম বইটার নাম 'আমি রবিন বলছি'। পেপারব্যাকের চেয়ে দাম বেশি হলেও কম চলেনি বইটা। তিন গোয়েন্দা সিরিজ আর তিন বন্ধু সিরিজের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই, শুধু কাগজ আর বাঁধাই ছাড়া।

দ্য সিক্রেট অব টেরর ক্যাসেল অবলম্বনে লেখা হয় তিন গোয়েন্দা সিরিজের প্রথম বই *তিন গোয়েন্দা*

২০০২ সালের পর থেকে 'সেবা'র বাইরেও কয়েকটি প্রকাশনীতে তিন গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিনকে নিয়ে লিখেছি, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে 'কথামেলা প্রকাশন'-এর নাম উল্লেখ করা যায়। এখন পর্যন্ত 'কিশোর মুসা রবিন'কে নিয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যা ২৮০টি। এর মধ্যে 'প্রথমা প্রকাশন' ছেপেছে সাতটি। শোভন সংস্করণে ছাপা তাদের সিরিজটার নাম 'গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিন'। ৭ নম্বর নতুন বইটি নাম 'গোলকরহস্য'।

যাহোক, অনেক কথাই বললাম। তিন গোয়েন্দার তিরিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমার পাঠক, ভক্ত ও প্রকাশকদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

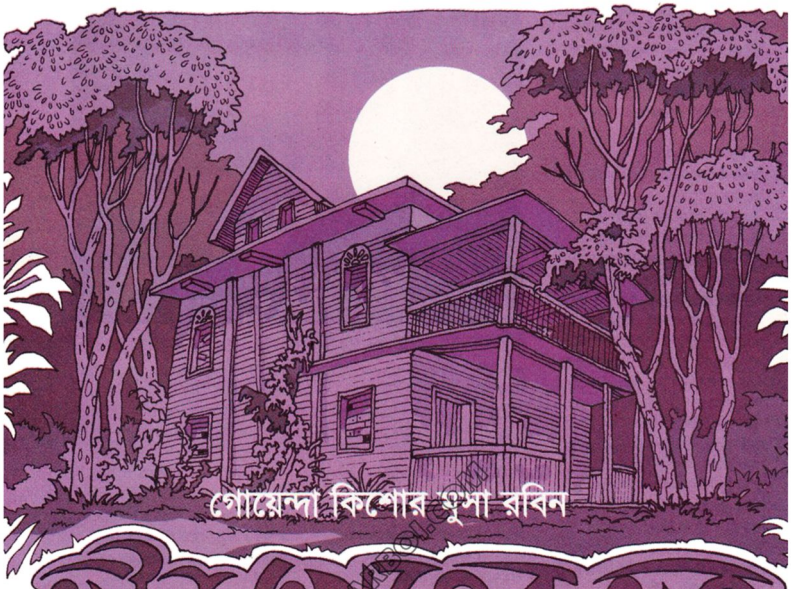

গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিন

ভুট্টাখেতের ভূত

রকিব হাসান

ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে শহরের বাইরে অনেক দূরে গ্রামে বেড়াতে বেরিয়েছিল তিন গোয়েন্দা—কিশোর, মুসা, রবিন। সারা দিন কাটিয়ে সাঁঝের বেলা বাড়ি ফিরছে। আকাশে গোল চাঁদ। রাস্তার দুই পাশে ভুট্টাখেত ঝলমল করছে চাঁদের আলোয়। মনের আনন্দে গাড়ি চালাচ্ছিল মুসা, হঠাৎ ইঞ্জিনে গোলমাল।

থেমে গেল গাড়ি। টর্চের আলোয় ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করে দেখল মুসা। 'নাহ্, হবে না। মেকানিক দরকার।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'বন্ধ হওয়ারও আর জায়গা পেল না! এখানে কাছাকাছি কোনো গ্যারেজ আছে বলে তো মনে হয় না।'

গাড়িটাকে ঠেলতে শুরু করল ওরা। কয়েক মিনিট ঠেলেই হাল ছেড়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'এভাবে হবে না। অন্য গাড়ির সাহায্যে টেনে নিতে হবে।'

'কিন্তু কোথায় নেব? গ্যারেজ কই?' রবিনের প্রশ্ন।

চারদিকে চোখ বোলাল মুসা। ভুট্টাখেতের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'কিশোর, ওই দেখো, খেতের মধ্যে ও কে! মানুষই মনে হচ্ছে। গ্যারেজের কথা ওকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।'

খেতের মাঝখানে লম্বা একটা মূর্তি দেখতে পেল কিশোরও। মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে ভালো বোঝা যাচ্ছে না। ভুট্টাগাছের জন্য পুরো শরীরটাও চোখে পড়ছে না। তবে মানুষ হলে অনেক লম্বা মানুষই বলতে হবে।

'চলো, ওর কাছে যাই,' মুসা বলল।

রাস্তা পার হয়ে মাঠ নেমে পড়ল তিনজনে। এখানে ওখানে ইঁদুর আর খরগোশের বড় বড় গর্ত। হাঁটতে হাঁটতে খেতের মাঝখানে মূর্তিটার কাছে চলে এল ওরা।

ঠিক এই সময় চাঁদকে ঢেকে দিতে শুরু করল কালো মেঘ। তবে মূর্তিটাকে দেখতে অসুবিধে হলো না।

মূর্তিটার মাথায় উপুড় করা বালতির মতো হ্যাট, গায়ে পুরোনো কালো কোট, কালো প্যান্ট, পায়ে কালো জুতো। কালো চোখে কটমট করে তাকিয়ে আছে ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে। মুখে হাসি। ব্যঙ্গ করছে যেন ওদেরকে। লম্বা, বাঁকানো নাক, মুখটা অস্বাভাবিক সাদা। হাত দুটো সামনে বাড়ানো, তাতে বাজপাখির নখের মতো বাঁকা আঙুল।

গা ছমছম করে উঠল মুসার। রবিন আর কিশোরেরও ভালো লাগল না দৃশ্যটা। পিছিয়ে গেল তিনজনেই।

চাঁদকে গ্রাস করল আবার কালো মেঘ। অন্ধকারে ঢেকে গেল। চোখ কুঁচকে মূর্তিটাকে দেখার চেষ্টা করল রবিন। অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

'অদ্ভুত লোক!' বিড়বিড় করল মুসা। 'ভূতফূত না তো!'

'এই আস্তে!' ফিসফিস করে সাবধান করল কিশোর। 'লোকটা শুনতে পাবে! অদ্ভুত লোক হলেও ওর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে আমাদের।'

মূর্তিটার উদ্দেশে জোরে বলল রবিন, 'এই যে স্যার, আমাদের গাড়িটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেছে। ওটাকে গ্যারেজে নিতে হবে। আপনি কোনো সাহায্য করতে পারেন?'

জবাব নেই। অস্বস্তি বোধ করছে তিনজনেই।

'চুপ করে আছে কেন?' নিচু গলায় বলল মুসা। 'ইংরেজি বুঝতে পারছে না? নাকি কোনো বদমতলব আছে?'

হঠাৎ আবার মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলোয় মূর্তিটাকে স্পষ্ট দেখা গেল আবার।

একটা কাঠের খুঁটিতে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। হ্যাটের নিচ থেকে বেরোনো খড় দেখতে পেল মুসা। বাঁকানো আঙুলগুলো তারের তৈরি। সাদা মুখটা রং করা।

'কাকতাড়ুয়া!' কিশোর বলল। 'একটা কাকতাড়ুয়াকে মানুষ ভেবে তার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি! হাহ্ হাহ্ হা!'

'অত হেসো না! ওটা ভূতও হতে পারে!' মুসা বলল। 'অবিকল মানুষের মতো লাগছে, এত নিখুঁত করে বানানো। ভয়ে আমার জান ধুকপুক করছে!'

'তবে কাকতাড়ুয়া যেহেতু আছে, কাছাকাছি খামারবাড়িও আছে,' উৎসাহিত হয়ে উঠেছে কিশোর। 'চলো, বাড়িটা কোথায়, খুঁজে দেখি।'

তিনজনে হাঁটা শুরু করেছে, এমন সময় জোরাল শব্দ তুলে বাতাস বয়ে গেল ভুট্টাখেতের ওপর দিয়ে। মনে হলো ফিসফিস করে কে যেন বলে উঠল, 'বিপদ! বাঁচতে চাইলে এক্ষুনি পালাও!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা। 'শুনলে?' কাকতাড়ুয়াটার দিকে ফিরে তাকাল।

তেমনিভাবে খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওটা। বাতাসে কোট উড়ছে পতপত করে। মুখে বিদ্রূপের হাসি। আঙুলগুলো বাঁকা করে সামনে বাড়ানো রয়েছে যেন খামচি দিয়ে ধরার জন্য।

'আমি যা শুনেছি তোমরাও কি তা-ই শুনেছ, কিশোর?' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল মুসা।

'আমি বাতাসের শব্দ শুনেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'তুমি কী শুনেছ?'

'কাকতাড়ুয়াটা সাবধান করেছে আমাদের। পালাতে বলেছে।'

'কিন্তু কাকতাড়ুয়া কথা বলতে পারে না!' জবাব দিল রবিন। 'আমি তো কিছু শুনিনি।'

কাকতাড়ুয়াটাকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'বিপদটা কী? কেন পালাব?'

জবাব দিল না কাকতাড়ুয়া। আগের মতোই তাকিয়ে রইল কালো চোখ দুটো।

এলোমেলো বাতাস বইছে ভুট্টাখেতের ওপরে। বাতাসের ঝাপটায় ফিসফিস, কানাকানি করছে যেন

অলংকরণ : সাদাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছগুলো।

'অযথা সময় নষ্ট করছি, মুসা,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'খড়ের তৈরি জিনিস কথা বলতে পারে না। চলো।'

'কোন দিকে যাব?'

ভালো করে তাকাতে খেতের শেষ প্রান্তে বড় একটা বাড়ি চোখে পড়ল।

'ওটা নিশ্চয়ই খামারবাড়ি,' বলল কিশোর, 'চলো। ওখানেই যাই।'

'তা-ই ভালো।' সায় দিল মুসা। 'এই ভুতুড়ে জায়গা থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।'

কাকতাড়ুয়াকে পেছনে রেখে বাড়িটার দিকে পা বাড়াল তিন গোয়েন্দা। মাঝে মাঝেই মেঘ চাঁদকে ঢেকে ফেলছে বলে চলার গতি মন্থর ওদের। আকাশে মেঘের লুকোচুরি, এলোমেলো বাতাস, বজ্রঝড়ের সংকেত দিচ্ছে।

অন্ধকারে গর্তে ভরা মাঠ দিয়ে হাঁটা কঠিন। বেমক্কা পা পড়লে গর্তে ঢুকে গিয়ে গোড়ালি মচকে যেতে পারে। তাহলে বিপদ বাড়বে।

পা প্রায় দিয়ে ফেলেছিল, শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে একটা বড় গর্ত টপকাল মুসা।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শোনা গেল। কেউ দৌড়ে আসছে ওদের পেছন পেছন।

কনুই দিয়ে কিশোরকে গুঁতো মারল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'বুঝতে পারছি,' ফিসফিস করেই জবাব দিল কিশোর।

পেছন ফিরে দেখল না ওরা, গুনে গুনে দশ কদম এগোল। ভুট্টাগাছের ভেতর দিয়ে আসছে কেউ। শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ। ঠিক দশ কদম যাওয়ার পরে ঘুরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত। তবে মেঘে ঢাকা চাঁদের আবছা আলোয় কাউকে দেখতে পেল না। পায়ের শব্দও থেমে গেল হঠাৎ।

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'আশ্চর্য তো! কে পিছু নিল আমাদের? থেমেই বা গেল কেন?'

'এখন বুঝতে পারছ তো? কাকতাড়ুয়াটা ঠিকই সাবধান করেছিল আমাদের,' মুসা বলল। 'শুধু বাতাসের শব্দ নয়। পায়ের শব্দেই বোঝা গেল।'

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। কিছু দূরে চাঁদের আলোয় কাকতাড়ুয়াটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে।

দৃশ্যটা দেখে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভুতুড়ে মূর্তিটার দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর দুই হাতে ভুট্টাগাছ ঠেলে হাঁটতে শুরু করল মূর্তিটা। জোরে চিৎকার করে বলল, 'এই, জলদি আয়! নইলে চাবকে ছাল ছাড়াব বলে দিলাম।'

তারপর উবু হয়ে বসে ভুট্টাগাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা।

সংবিৎ ফিরে পেল যেন কিশোর। মূর্তিটার কাছে দৌড়ে গেল। কিন্তু ওখানে পৌঁছে ভুট্টাগাছ সরিয়ে আর দেখতে পেল না ওটাকে।

মুসা আর রবিনও ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'চলো তো, দেখি,' কিশোর বলল।

'কী?' রবিনের প্রশ্ন।

'কাকতাড়ুয়াটা আছে নাকি?'

ইঁদুরের গর্তে পা পড়ার ঝুঁকি নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে কাকতাড়ুয়াটাকে প্রথম যেখানে দেখেছে, সেখানে চলে এল ওরা।

কিন্তু আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে পুতুলটা। মুখে হাসি।

হতভম্ব হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে।

'কিশোর, সত্যি কি আমরা ভূত দেখলাম?' কম্পিত কণ্ঠে বলল মুসা।

'বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু চোখের সামনে যা দেখলাম, তাকেই বা অবিশ্বাস করি কী করে?'

আবার খামারবাড়ির দিকে এগোল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে কিশোর বলল, 'খামারবাড়িতে কেউ থাকলে সে হয়তো এই কাকতাড়ুয়া-রহস্যের জবাব দিতে পারবে।'

খামারবাড়িটা বেশ বড়। গাছে ঘেরা কাঠের তৈরি একটা দোতল বাড়ি। তবে খুবই দৈন্যদশা। বাড়ির কোনো জানালায় আলো নেই।

সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল কিশোর। দরজার কলবেল টিপল। ভেতরে কোথাও তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল বেল। কিন্তু কারও সাড়া মিলল না। আবার বেল বাজাল সে। এবারও কোনো সাড়া নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই,' বলল কিশোর। 'ঢুকে দেখা দরকার।'

'পেছন দিকে কেউ থাকতে পারে,' রবিন বলল। 'চলো। ওদিকটা ঘুরে দেখি।'

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। চক্কর দিল বাড়িটাকে ঘিরে। কিন্তু জীবনের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। বুনো লতায় পেঁচিয়ে যাচ্ছে পা, কাঁটাঝোপের কাঁটার খোঁচা লাগছে হাতে। সেই সঙ্গে কানের কাছে মশার ঘ্যানঘ্যানানি।

'বহু বছর এভাবে পড়ে থাকলে এ রকম আগাছা জন্মায়,' কিশোর বলল।

'তার মানে বাড়িতে কেউ থাকে না,' রবিন বলল। 'পোড়ো বাড়ি।'

ঠিক এই সময় ভয়ংকর চিৎকার চমকে দিল ওদের।

'খাইছে!' কাঁপা গলায় বলল মুসা। 'কিসের চিৎকার?'

'বুঝতে পারছি না!' বিড়বিড় করল রবিন।

'আমি পারছি। ওটা শাকচুন্নি! আর এগিয়ো না। এক্ষুনি পালাই...' বলতে গিয়ে থেমে গেল মুসা।

একটা গাছের ডালে ডানা ঝাপটানোর মতো শব্দ শোনা গেল।

'বাপ রে! শাকচুন্নিটা উড়ে আসছে গো!' বলেই পেছন ফিরে দৌড় দিতে গেল মুসা।

ডাল থেকে একটা প্যাঁচা উড়ল। গিয়ে বসল একটা ঝোপের ওপর। গোল, বড় বড় চোখ পাকিয়ে ওদের দিকে তাকাল। তারপর বুক হিম করা চিৎকার দিল আবার।

হেসে ফেলে কিশোর বলল, 'মুসা, ফিরে এসো! মনে ভয় থাকলে যুক্তি কাজ করে না! ডাকল প্যাঁচা, তোমার কাছে মনে হলো শাকচুন্নি।'

বুকে ফুঁ দিতে দিতে ফিরে এল মুসা।

বাড়ি ঘিরে চক্কর দেওয়া শেষ। আবার বারান্দায় ফিরে এল ওরা।

বৃথা খোঁজাখুঁজি। মানুষজন নেই। চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করল তিনজনে। কোনো জবাব এল না।

'ফোন করা দরকার,' বলল মুসা। 'কোনো গ্যারেজে খবর না দিলেই নয়। কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকব কী করে? দরজায় ছিটকিনি দেওয়া।'

'জানালা দিয়ে যে ঢুকব, তারও উপায় নেই,' হতাশ শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। 'অনেক উঁচুতে জানালা!'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে রবিনও কোনো উপায় বের করতে পারল না।

'উপায় একটা আছে,' মুসা বলল। 'প্যাঁচাটা যে গাছ থেকে উড়ে এসেছে, লক্ষ করেছি ওটার একটা ডাল চিলেকোঠার জানাল ছুঁই ছুঁই করছে। গাছ বেয়ে উঠে জানালা খোলা পেলে ভেতরে ঢুকতে পারবে।'

গাছটার নিচে চলে এল ওরা। প্রথমে মুসা চড়ল গাছে। উঁচু ডালে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল ওটা ওর ওজনের চাপে ভেঙে পড়বে কি না। ভাঙবে না বুঝে ওটা বেয়ে জানালার কাছে চলে এল। হাত বাড়িয়ে জানালার কাচ স্পর্শ করল। ধাক্কা দিল। ক্যাঁচ করে খুলে গেল জানালা।

কিশোর আর রবিনকে ডাকল মুসা। 'জানালা খোলা। চলে এসো।'

গাছে উঠল কিশোর। তবে যে ডালটায় মুসা বসে আছে, সেটাতে উঠল না, ভেঙে পড়ার ভয়ে। রবিনও গাছে উঠল।

এসআইবিএল
রিটেইল ব্যাংকিং

উৎকর্ষের পথে
অবিরাম যাত্রার অংশ হিসেবে
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক
নিয়ে এলো নতুন আয়োজন

এসআইবিএল ইসলামিক কনজ্যুমার ফাইন্যান্স

এসআইবিএল ইসলামিক অটো ফাইন্যান্স

জীবনের জন্য,
জীবন যাপনের জন্য

- ইসলামী শরী'আহর ভিত্তিতে পরিচালিত।
- অগ্রীম সেটেলমেন্ট চার্জ নেই।
- আংশিক নিষ্পত্তি/সমন্বয়ে চার্জ নেই।
- বিলম্ব ফি নেই।
- টেকওভার/ব্যালেন্স ট্রান্সফারে প্রসেসিং ফি নেই।

যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন
দেশব্যাপী সকল শাখায় অথবা ০৯৬১২০০১১২২

SIBL
Social Islami Bank Limited
উৎকর্ষ অবিরাম

www.siblbd.com

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোলা জানালা দিয়ে ঢিলেকোঠার ঘরে ঢুকল মুসা। তাকে অনুসরণ করল অন্য দুজন। ভেতরে ঢুকে পকেট থেকে পেনসিল টর্চ বের করল ওরা।

টর্চের আলোয় দেখল বেশ বড়সড় ঘর। খালি। মেঝের ওপর ধুলোর ঘন আস্তরণ।

'মেঝেতে কারও পায়ের ছাপ দেখছি না,' বলল কিশোর। 'তার মানে অনেক দিন কেউ এ ঘরে ঢোকেনি।'

'এ ঘরে ফোন নেই।' ঢিলেকোঠার দরজায় টর্চের আলো ফেলল রবিন। 'নিচে আছে কি না দেখতে হবে।'

দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে ওরা, এমন সময় ছাদ থেকে কিচকিচ শব্দ ভেসে এল। কালো কালো কী যেন ছাদের কড়ি-বর্গা থেকে নেমে এসে উড়তে লাগল ওদের মাথার ওপর।

'বাবা গো!' বলে চিৎকার দিয়ে মেঝে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল মুসা।

চমকে গিয়ে কিশোর আর রবিনও ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মেঝেতে।

ভয় নেই বুঝতে পেরেই বোধ হয় এক চক্কর দিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল প্রাণীগুলো। বর্গা ধরে মাথা নিচু করে ঝুলতে লাগল। সেই সঙ্গে অনবরত কিচকিচ শব্দ করেই চলল।

'রক্তচোষা ভূত হতে পারে! বাদুড়ের রূপ ধরে আছে!' কাঁপা গলায় বলল মুসা। 'জলদি ভাগো!'

'ধ্যাত্তোরি! তোমার মাথায় ভূত ছাড়া আর কিছু নেই নাকি?' কিশোর বলল।

মেঝে থেকে উঠে দরজার দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। পাল্লা খুলল। সামনে সিঁড়ি দেখা গেল।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামল ওরা। পাশে একটা দরজা দেখে ওটা খুলে একটা হলরুমে ঢুকল।

'আমার কি মনে হয় জানো?' বলল কিশোর। 'যা বলেছিলাম, সেটাই ঠিক, বাড়িটা পরিত্যক্ত। মেঝেতে কার্পেট নেই, হলরুমে কোনো আসবাব নেই। ইলেকট্রিসিটি নেই...'

হঠাৎ হলরুমের শেষ মাথায় কিসের যেন শব্দ হলো। থেমে গেল কিশোর। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে। দরজাটা ভেড়ানো। ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলল। টর্চের আলোয় দেখল এ ঘরও খালি।

মেঝেতে টর্চের আলো ফেলল সে। হাসতে লাগল। 'ওই যে ভুতুড়ে শব্দের উৎস!'

একটা ইঁদুর দৌড়ে পালাল।

সব কটি ঘর পরীক্ষা করে দেখল ওরা।

'দোতলায় কেউ নেই,' মুসা বলল।

'তাই তো দেখছি,' মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'এবার নিচতলাটা দেখা দরকার,' কিশোর বলল।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। ডাইনিংরুমে ঢুকল। অন্যান্য ঘরের মতো এটাও খালি এবং ধুলোয় ভর্তি। তবে এ ঘরে ধুলোর মধ্যে পায়ের ছাপ চোখে পড়ল ওদের।

'দেখো!' বলে উঠল উত্তেজিত রবিন।

'কেউ এখানে ছিল!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'একটু আগে!' ঢোক গিলল মুসা।

'কী জানি!' কিশোর জবাব দিল। 'অনেক দিন থেকেই ঘরটা ব্যবহার করা হয় না। পায়ের ছাপগুলো তাজা, না আগেকার, বুঝব কী করে?'

টর্চের আলোয় দেখল, এক সারি ছাপ খিড়কির দরজা পর্যন্ত চলে গেছে। ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লাটা। ওপাশে কিছু নেই। ঘাস জন্মে আছে মাটিতে। দরজার এপাশ থেকে আরেক সারি ছাপ ফিরে এসেছে ঘরের ভেতর।

'তাজা হোক আর পুরোনো হোক, ছাপগুলো একজনেরই,' মন্তব্য করল কিশোর। 'খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সে। বেরিয়েও গেছে ও পথেই।'

লিভিংরুমে ঢুকে মেঝেতে টর্চের আলো ফেলে আঁতকে উঠল মুসা। একটা খড়ের টুকরো পড়ে রয়েছে।

'কাকতাড়ুয়াটা ঢুকেছিল এ ঘরে, ওর টুপির নিচ থেকে খড়ের টুকরোটা পড়েছে।' গায়ে কাঁটা দিল মুসার। 'কিন্তু গেল কোথায়? বেইসমেন্টে খুঁজব।'

'হ্যাঁ,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর। 'না, দেখে যাব না।'

'ঠিক বলেছ,' রবিনও সায় দিল।

রান্নাঘরে ঢুকে দেখল আরও কিছু পায়ের ছাপ চলে গেছে বেইসমেন্টের, অর্থাৎ মাটির নিচের ঘরের দরজার দিকে। তারপর নেমে গেছে সিঁড়ি বেয়ে।

সিঁড়ির শেষ মাথায় নেমে দেখল, বেইসমেন্টও কেউ নেই। ধুলো জমেছে পুরু হয়ে। জানালায় মাকড়সার জাল। এখান থেকে উঠান বা বাগানে যাওয়ার কোনো দরজা চোখে পড়ল না।

পায়ের ছাপ চলে গেছে ফিউজ বক্সের ধারে। ফিউজ বক্স পরীক্ষা করল কিশোর। তার ছেঁড়া। বিদ্যুতের লাইন থাকলেও বাতি জ্বালানোর কোনো উপায় নেই। এখানে যে ঢুকেছিল, সে বোধ হয় ফিউজ ঠিক করে আলো জ্বালানোর চেষ্টা করেছিল।

আবার সিঁড়ি বেয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে উঠে এল ওরা।

রবিন বলল, 'টেলিফোন তো নেই। কাজেই আজ রাতে আর সাহায্য পাচ্ছি না আমরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'দুটো কাজ করতে পারি আমরা এখন। হয় গাড়িতে ফিরে যেতে পারি, নয়তো এখানেই রাত কাটাতে পারি। তবে এখানে রাত কাটানোই বোধ হয় ভালো হবে। মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পারব।'

হাই তুলল মুসা। 'আমারও অসুবিধে নেই। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। শোয়ার মতো জায়গা যখন আছেই, আর দেরি করি কেন?'

জ্যাকেট খুলে ভাঁজ করল সে। তারপর মাথার নিচে দিল। বালিশের কাজ দেবে জ্যাকেটটা। রবিন আর কিশোরও তা-ই করল।

শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখল কিশোর। দেখল গাড়িতে করে একটা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। মুসা গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে বলে খুঁজে পাচ্ছে না বাড়িটা। লোকজনকে জিজ্ঞেস করেও লাভ হচ্ছে না। বদমেজাজি লোকগুলো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। হঠাৎ পেছন থেকে অদ্ভুত গলায় কে যেন বলে উঠল, 'যে বাড়িটা তোমরা খুঁজছ, ওটা ডান দিকে। মোড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোরো। মোড় ঘুরে নাক বরাবর চলে যাও। বাড়িটা দেখতে পাবে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কিশোর। দেখল পেছনের সিটে বসে আছে সেই কাকতাড়ুয়াটা।

ভুতুড়ে মূর্তিটা ওদের দিকে তাকিয়ে খনখনে গলায় হেসে উঠল। উপুড় করা বালতির মতো টুপির ডগায় টোকা মেরে বলল, 'কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি কীভাবে যেতে হবে। ডান দিকে গাড়ি ঘোরাও।'

মুসা জানে ডান দিকে খাড়া খাদ। সে বাম দিকে হুইল ঘোরাল। তবু ডান দিকেই ঘুরে গেল গাড়ি। গতি কমাতে ব্রেক চেপে ধরল। কমার বদলে বেড়ে গেল স্পিড। আতঙ্কিত হয়ে দেখল সোজা খাদের দিকে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। গতি ক্রমে বেড়েই চলেছে।

পেছনের সিটে বসা কাকতাড়ুয়াটা হেসে উঠল ভয়ংকরভাবে। খাদের কিনার লক্ষ্য করে ছুটে গেল গাড়ি। পরক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে উঠে পড়ল, শাঁ শাঁ করে নিচে পড়তে শুরু করল, নেমে যেতে থাকল খাদের অতল অন্ধকারের দিকে। পড়ছে তো পড়ছেই! প্রতি সেকেন্ডে খাদের বিকট হাঁ বড় হয়ে উঠছে।

বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠল কাকতাড়ুয়াটা। কানে হাত চাপা দিল কিশোর। খাদের পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ওদের গাড়ি। মারা যাবে ওরা।

ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কোথায় আছে বুঝতে সময় লাগল।

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন! ভাবল সে। কাকতাড়ুয়ার ভয় আমার মগজটাকেও গ্রাস করেছে।

হঠাৎ বারান্দার কাঠের মেঝেতে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হলো। কে যেন হেঁটে আসছে সামনের জানালার দিকে। উঠে বসল কিশোর।

জানালার ওপাশে দেখা গেল কাকতাড়ুয়ার মাথাটা!

'এখনো কি স্বপ্ন দেখছি?' ঢোঁক গিলল কিশোর। 'নাকি সত্যিই ঘটছে এসব?'

কর্কশ কণ্ঠে বলল ভয়ংকর মূর্তিটা। 'এক্ষুনি বাড়ি যা! নইলে চাবকাব বলে দিলাম!'

একটা কুকুরের কুঁই কুঁই শব্দ শোনা গেল। মনে হলো, কাকতাড়ুয়াটাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কাকতাড়ুয়ার মুখ।

লাফ দিয়ে উঠে বসল কিশোর। দৌড়ে চলে এল দরজার কাছে। জং ধরা ছিটকিনি খুলতে সময় লাগল। এক ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এল। চারপাশে তাকাতে লাগল।

দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে মুসা আর রবিনেরও। ওরাও চলে এসেছে। চোখ ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কী হয়েছে?'

ঘটনাটা খুলে বলল কিশোর। 'কাকতাড়ুয়াটা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বুঝলাম না।'

'ওই তো!' হাত তুলে দেখাল মুসা।

মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ভুট্টাখেতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে ওটা।

'এসো আমার সঙ্গে!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'ওকে ধরতে হবে। নইলে এসব রহস্যময় কাণ্ডর কোনো সদুত্তর মিলবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকতাড়ুয়াটাকে লক্ষ্য করে দৌড় দিল ওরা।

রাতের আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা আরও বেড়েছে। ঝড় আসার সময় হয়ে গেছে। গাছের চূড়ায় হাওয়ার মাতম।

ভুট্টাখেতে ঢুকে পড়ল ওরা। কাকতাড়ুয়াটা আবার গায়েব।

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'কাকতাড়ুয়া কোথায় গেছে তাই জানি না। কোথায় খুঁজব ওকে?'

'ভূতের মতোই আসছে, যাচ্ছে, এই আছে, এই নেই। ওটা ভূত ছাড়া আর কী?' মুসা বলল।

'ভূত হোক আর যা-ই হোক, ওকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের। এক কাজ করি—তিনজন তিন দিকে যাই। কারও চোখে কিছু পড়লেই চিৎকার করে জানাব। অন্য দুজন ছুটে যাব তখন তার দিকে। কী বলো?'

'ঠিক আছে,' সায় দিল মুসা আর রবিন।

ডান দিকে মোড় নিল কিশোর, ভুট্টাখেতের আরও গভীরে ঢুকে পড়ল। রবিন গেল আরেক দিকে।

সাবধানে হাঁটছে মুসা। দুহাতে গাছ ঠেলে সরাতে সরাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারপাশে।

দূরে কড়াৎ করে বাজ পড়ল, আকাশ ঝলসে দিল যেন বিদ্যুতের আলো। মেঘের আড়াল থেকে সামান্যই মুখ দেখানোর সুযোগ পাচ্ছে এখন চাঁদ। ছায়া ছায়া অন্ধকার ভুট্টাখেতে। মুসার কাছে সব কেমন অপার্থিব, ভুতুড়ে লাগছে। শিরশির করে উঠল গা। ভূতদের ঘুরে বেড়ানোর জন্য আদর্শ একটি রাত, মনে হলো তার।

কাকতাড়ুয়া ভূতটা হয়তো খেতের মধ্যে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়বে। কথাটা ভাবতেই বুক ঢিবঢিব শুরু হয়ে গেল তার। তবে থামল না সে। এগিয়ে চলল। বারবার ডানে-বামে তাকাচ্ছে। হাত দুটো সামনে বাড়ানো। সম্ভাব্য হামলার জন্য প্রস্তুত। ভূত-প্রেতের বিরুদ্ধে কুংফু-কারাতে কতটুকু কাজে লাগবে বুঝতে পারছে না।

বেশ খানিকটা পরেও কিছু ঘটল না দেখে মুসা ধারণা করল কাকতাড়ুয়াটা বোধ হয় এ তল্লাটে নেই। ঠিক তখনই ওর সামনে খচমচ করে একটা শব্দ হলো। শস্যের ডগা দুলছে। কিছু একটা এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

পাঁজরের গায়ে দমাদম পিটাতে শুরু করল হৃৎপিণ্ডটা, বেড়ে গেছে হার্টবিট। দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা। অপেক্ষা করছে। কাকতাড়ুয়াকে দেখামাত্র চিৎকার করে জানাবে কিশোর আর রবিনকে।

খচমচ শব্দটা কাছে এল। চিৎকার দিতে যাবে মুসা, এই সময় ভুট্টাগাছের ফাঁক দিয়ে ওর সামনে লাফিয়ে পড়ল একটা খরগোশ। পেছনে ধেয়ে এল একটা শিয়াল। দুটো প্রাণীই ঝড়ের বেগে ছুটে গেল তার সামনে দিয়ে।

ঝাঁপ দিয়ে একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল খরগোশটা। পরমুহূর্তেই গর্তের কাছে হাজির হলো শিয়ালটা। শিকার হারিয়েছে বোঝার পর পরই চোখে পড়ল মুসাকে। ভয় পেয়ে এক লাফ দিয়ে ঘুরে গিয়ে, ঝেড়ে দিল দৌড়।

ওটার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল মুসা। চমকের পর চমক। আর ভূত ভেবে অকারণ ভয় পাচ্ছে বলে নিজের ওপরই বিরক্ত হলো মুসা। আবার কাকতাড়ুয়ার খোঁজে পা বাড়াল।

ওদিকে ভুট্টাখেতের মাঝ দিয়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে কিশোর। প্রতিটি পা ফেলছে সাবধানে। গর্তে যাতে না পড়ে, সতর্ক রইল।

অন্ধকারে হঠাৎ একটা লম্বা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল তার। নিশ্চয় কাকতাড়ুয়া। পা টিপে টিপে এগিয়ে আচমকা পেছন থেকে জাপটে ধরল। কাকতাড়ুয়াও ছাড়ার পাত্র নয়। সে-ও ছোটার চেষ্টা করতে লাগল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। লড়াইয়ের একপর্যায়ে দুজনেই কুস্তির প্যাঁচ মেরে নিজেদের ছাড়িয়ে নিল। আবার পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, তখুনি চাঁদ বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে। ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে রবিনও এসে দাঁড়াল ওখানে। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল একটা মুহূর্ত। পরক্ষণে চিৎকার করে উঠল, 'আরে কী করছ তোমরা? পাগল হয়ে গেছ নাকি? নিজেরা নিজেরা মারামারি!'

'আমি ওকে কাকতাড়ুয়া ভেবেছিলাম!' ঢোঁক গিলল মুসা।

'আমিও তো তোমাকে কাকতাড়ুয়া ভেবেছি!' হাঁপাচ্ছে কিশোর।

হাসতে শুরু করল রবিন। হাসিটা সংক্রামিত হলো অন্য দুজনের মাঝেও।

'নাহ্, আর আলাদা হব না, একসঙ্গে থেকেই খুঁজব,' কিশোর বলল।

আপত্তি করল না কেউ। কিন্তু ব্যর্থ হলো অভিযান। সচল কাকতাড়ুয়ার দেখা মিলল না আর। তবে খেতের মাঝখানে পুতুল কাকতাড়ুয়াটাকে আগের মতোই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

'দেখো, কেমন ভাব করে আছে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না,' বিড়বিড় করল মুসা।

'আমার ধারণা, এটা আমাদের সেই কাকতাড়ুয়া নয়, যেটাকে আমরা খুঁজছি।' ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'চলো, খামারবাড়িতে ফিরে যাই। ওখানে বসে ঠিক করব, এরপর কী করা যায়।'

ভুট্টাখেতের কিনারে চলে এসেছে ওরা, এই সময় আকাশজুড়ে ঝলকিয়ে উঠল বিদ্যুৎ। তীব্র আলোয় সাদা হয়ে গেল পুরো এলাকা।

পরক্ষণে বিকট শব্দে বাজ পড়ল পুরানো খামারবাড়িটার একেবারে মাথার ওপর। বিস্ফোরিত হলো চিলেকোঠা। জ্বলে উঠল আগুন। লেলিহান শিখা এক লাফে উঠে গেল আকাশে।

দৃশ্যটা আতঙ্কিত করে তুলল গোয়েন্দাদের। তবু বাড়ি লক্ষ্য করে ছুটল ওরা। বাড়ির কাছে এসে দেখল ওটা জ্বলন্ত চুল্লিতে পরিণত হয়েছে। ধসে পড়েছে ছাদ, কড়ি-বর্গা। দাউ দাউ করে জ্বলছে। জ্বলন্ত তক্তা ধুড়ুম-ধাড়ুম শব্দে ছিটকে পড়ছে মাটিতে।

আগাছায় ভরা ড্রাইভওয়েতে থমকে দাঁড়াল ওরা। আগুনের ভীষণ তেজ। কাছে যাওয়া যায় না।

'আমাদের কিছু করার নেই আর,' বিড়বিড় করল মুসা। 'বাড়িটা গেছে।'

'ভাগ্যিস বাজ পড়ার সময় বাড়ির ভেতরে ছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।' শিউরে উঠল কিশোর। 'কাকতাড়ুয়ার পিছু না নিলে এতক্ষণে পুড়ে কাবাব হয়ে যেতাম।'

'বাড়িটার শেষ পরিণতি তাহলে এভাবেই ঘটল,' কে যেন বলে উঠল পেছন থেকে।

চট করে ঘুরল ওরা। ভীষণ চমকে গিয়ে দেখল, একটা পিকআপের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে কাকতাড়ুয়াটা। বাড়ি ধসে পড়ার শব্দে গাড়ি আসার শব্দ শুনতে পায়নি ওরা।

পিকআপ থেকে বেরিয়ে এলেন কাকতাড়ুয়ার পোশাক পরা একজন লোক। কিংবা বলা যায়, খেতের মাঝে যে কাকতাড়ুয়া পুতুলটা দাঁড়িয়ে আছে, ওটার মতো একই রঙের কালো কোট-প্যান্ট পরা, মাথায় উপুড় করা বালতি আকৃতির হ্যাট।

'আমি হ্যারি হ্যারিসন,' নিজের পরিচয় দিলেন তিনি। পোড়া খামারবাড়িটা দেখিয়ে বললেন, 'এই বাড়িটা আমার ছিল। ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে ফোন করেই দৌড় দিয়েছি। এখুনি চলে আসবে। কিন্তু তোমরা কারা?'

নিজেদের পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা। জানাল, ওদের গাড়িটা নষ্ট হয়ে পড়ে আছে রাস্তার ধারে।

'পোড়োবাড়িটাতে ঢুকেছিলাম ফোন করার আশায়। গ্যারেজে গাড়িটা নেওয়ার জন্য সাহায্য দরকার,' কিশোর বলল। 'কিন্তু বাড়িতে ঢুকে কাউকে দেখলাম না।'

কাঁধ ঝাঁকালেন মিস্টার হ্যারিসন। 'কেউ ঢোকে না ওখানে। বহুকাল খালি পড়ে ছিল। ভাড়াও দিতে পারছিলাম না। কে জানি গুজব ছড়িয়েছে, ভূত আছে বাড়িটাতে। কিছুতেই ভাড়া হলো না। শেষে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলাম। ভুতুড়ে বাড়ি কেউ কিনল না। পুড়ে গিয়ে বরং ভালোই হলো। এখন জায়গাটা অন্তত বিক্রি করতে পারব। খালি জায়গাকে নিশ্চয় কেউ ভুতুড়ে ভাববে না।'

কুকুরের ডাক শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে তিন গোয়েন্দা দেখে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কুকুর।

ধমকে উঠলেন মি. হ্যারিসন, 'এই চুপ! ধরে চাবকাব...!'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি থাকেন কোথায়?'

'কাছেই,' হাত তুলে দেখালেন মি. হ্যারিসন। 'ওই গাছপালার পেছনে আরেকটা খামারবাড়ি আছে আমার। নতুন।'

'এই ভুট্টাখেতের মালিকও নিশ্চয় আপনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

সকাল হয়ে এসেছে। বজ্রপাতে পোড়া খামারবাড়িটা এখন ছাই আর কয়লার স্তূপ। পোড়া আবর্জনার ফাঁকে এখনো লকলকে জিব বের করছে আগুন। ইতিমধ্যে দমকলের একটা গাড়ি চলে এসেছে। কী ঘটেছে অল্প কথায় দমকল আফিসারকে জানিয়ে দিলেন মি. হ্যারিসন। তারপর ফিরলেন তিন গোয়েন্দার দিকে।

'এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের। আমার বাড়িতে চলো। নাশতা খাবে।'

মুচকি হাসল মুসা, 'নাশতা পেলে মন্দ হয় না।' রবিনের দিকে তাকাল। 'কী বলো?'

নীরবে ঘাড় কাত করে সায় জানাল রবিন। মুখে হাসি।

কিশোর বলল, 'খিদেয় আমারও পেট চোঁ-চোঁ করছে। সারাটা রাত ভুট্টাখেতে যেভাবে দৌড়ে বেড়ালাম।'

মি. হ্যারিসন ওদের নিয়ে পিকআপে উঠলেন। সামনে জায়গা হলো না চারজনের। রবিন বসল সামনে। কিশোর আর মুসা পেছনের খোলা জায়গায়।

ড্রাইভিং সিট থেকে মুখ বের করে পেছনে তাকিয়ে মি. হ্যারিসন বললেন, 'নাশতা খেয়ে তোমাদের গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।'

শুনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল তিন গোয়েন্দা।

মিসেস হ্যারিসন তাঁর স্বামীর মতোই ভালো মানুষ। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন গোয়েন্দাদের। প্রচুর খাওয়ালেন। রকি বিচ চেনেন তিনি। ছোটবেলায় বহু বছর থেকেছেন। সেসব নিয়ে গল্প করলেন ওদের সঙ্গে।

নাশতা খেয়ে মিসেস হ্যারিসনকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোল ওরা। মি. হ্যারিসন আবার গোয়েন্দাদের নিয়ে এলেন ওদের গাড়ির কাছে।

স্পোর্টস সেডানটা আগের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে খাদের পাশে। গাড়ির সামনের বাম্পারে একটা রশির এক প্রান্ত বাঁধলেন মি. হ্যারিসন। রশির অন্য প্রান্ত বাঁধলেন নিজের গাড়ির পেছনে। নিজেদের গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসল মুসা, হুইল ধরে গাড়িটাকে ঠিক রাখার জন্য। কিশোর আর রবিন উঠল পিকআপের পেছনে। গাড়িটাকে টেনে নিয়ে গ্যারেজে রওনা হলেন মি. হ্যারিসন। দুই পাশের চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে চলল কিশোর।

মাইল দশেক যাওয়ার পরে গ্যারেজের দেখা মিলল। কিশোরদের ভাড়া করা গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখল গ্যারেজের মেকানিক। সমস্যাটা ফুয়েল পাম্পে।

মেকানিক যখন পাম্প মেরামত করছে, কিশোর এই সুযোগে মি. হ্যারিসনকে বলল, 'কয়েকটা প্রশ্ন মনের মধ্যে খচখচ করছে, মি. হ্যারিসন। যেমন, জানতে ইচ্ছে করছে, শেষ কবে আপনার পোড়া খামারবাড়িটাতে ঢুকেছিলেন?'

(শেষ অংশ আগামী সংখ্যায়)

এবার তোমার গোয়েন্দা হওয়ার সুযোগ!

ওপরের গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো। এরপর গল্পটি শেষ করো এমনভাবে, যেন জবাব মেলে নিচের প্রশ্নগুলোর—

১. ভুট্টাখেতে দেখা রহস্যময় কাকতাড়ুয়াটা কে ছিল?
২. খামারবাড়ির ভেতর পায়ের ছাপগুলো কার ছিল?
৩. খামারবাড়ির লিভিংরুমে খড়ের টুকরো এল কীভাবে?
৪. খামারবাড়ির জানালায় কার মুখ দেখা গিয়েছিল?

তুমি যদি কিশোর, মুসা ও রবিনের ভক্ত হও, তবে মাথা খাটিয়ে লিখে ফেলো গল্পটি। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের ঠিকানায়। সেরা ২০ জন গল্প লেখক নির্বাচন করবেন রকিব হাসান স্বয়ং। এরপর এই ২০ জন সুযোগ পাবে রকিব হাসানের সঙ্গে সাক্ষাতের। সেই সাক্ষাতে আড্ডা হবে, গল্প হবে, ইচ্ছেমতো প্রশ্ন-উত্তর হবে, লেখক জানতে চাইবেন কিশোর, মুসা ও রবিন নিয়ে তোমার মতামত। এ সুযোগ জীবনে বারবার আসে না!

তোমার উত্তর পাঠাও ২২ আগস্টের মধ্যে নিচের ঠিকানায়:
ভুট্টাখেতের ভূত রহস্য, কিশোর আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
ই-মেইল : editor@kishoralo.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

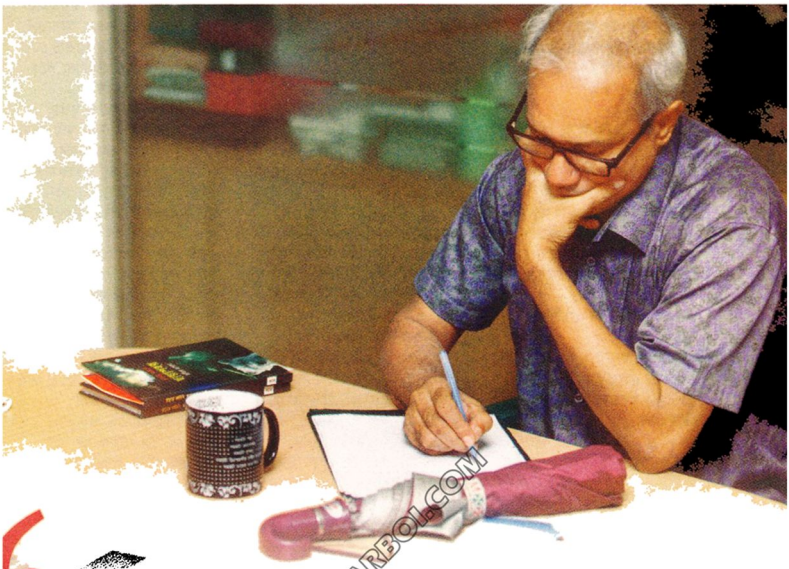

আমার কাজটাই হলো যেটা তুঙ্গে ওঠে, সেটা ছেড়ে দেওয়া

রকিব হাসান
লেখক

বাংলাদেশের বইপড়ুয়াদের একটি বড় অংশের কৈশোরের নিত্যসঙ্গী *তিন গোয়েন্দা*। জনন্দিত এ সিরিজের স্রষ্টা রকিব হাসান। তাঁর জন্ম ১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর; কুমিল্লায়। তবে বাবার বদলির চাকরির সুবাদে ছেলেবেলা কেটেছে ফেনীতে। ফেনী থেকেই স্কুলজীবন শেষ করে তিনি ভর্তি হন কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে নিয়মমতো যোগ দিয়েছিলেন চাকরিতেই। কিন্তু কোথাও মন টেকেনি বেশি দিন। তাই একে একে বদলেছেন বেশ কটা চাকরি। অনেক চেষ্টার পরও অফিসের বাঁধাধরা নয়টা-ছয়টার ঘড়ির কাঁটায় আটকে থাকতে পারেননি। অবশেষে সব ছেড়েছুড়ে লেখালেখি শুরু করলেন একদিন। লেখক সত্তার সঙ্গেই নিজের অচ্ছেদ্য বন্ধন টের পেলেন। তারপর তো লেখালেখিকে বেছে নিলেন পেশা হিসেবে। হলেন পুরোদস্তুর লেখক। আজ কয়েক প্রজন্মের পাঠকের কাছে জনপ্রিয় তিনি। লেখালেখির শুরুটা সেবা প্রকাশনীতে। নামে-বেনামে লিখেছেন চার শতাধিক বই। বিশ্বসেরা ক্লাসিক বইয়ের অনুবাদ দিয়ে শুরু করেছিলেন তিনি। একে একে লিখেছেন *টারজান, গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা* সিরিজসহ অসংখ্য জনপ্রিয় বই। তারপরও শুধু তিন গোয়েন্দার স্রষ্টা হিসেবেই অসংখ্য পাঠকের হৃদয়ের মণিকোঠায় ঠাঁই পেয়েছেন এই ভীষণ প্রচারবিমুখ মানুষটি। তিন গোয়েন্দার ৩০ বছর পূর্তিতে অবশেষে ধরা দিতে বাধ্য হয়েছেন কিআ দলের কাছে। প্রথমবারের মতো দিয়েছেন সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার। এতে উঠে এসেছে তাঁর শৈশব-কৈশোর, লেখালেখির আদ্যোপান্ত, সেবা প্রকাশনীর দিনগুলো আর বর্তমান জীবনযাপনসহ নানা বিষয়। সাক্ষাৎকার দলে ছিল শেরেবাংলা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের **মাশরাবা আহমেদ চৌধুরী**, উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের **মাহাতাব রশীদ**, ঢাকা সিটি কলেজের **মারজুকা আহমেদ চৌধুরী**, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল ও কলেজের **সাবেরা আক্তার** এবং নটর ডেম কলেজের **অংকন ঘোষ দস্তিদার** সঙ্গে ছিলেন **আনিসুল হক, শিমু নাসের, আদনান মুকিত** ও **মহিতুল আলম** কিআ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাৎকারের ছবি তুলেছেন **কবির হোসেন**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফর চৌধুরী, আবু সাঈদ ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করে আপনি লিখেছেন, 'রকিব হাসান' নামটাও ছদ্মনাম নয়তো?

না। তবে জোড়া দেওয়া বানানো নাম।

বিভিন্ন ছদ্মনাম ব্যবহার করার কারণ কী?

তিন গোয়েন্দা যখন জনপ্রিয় হয়ে গেল, তখন আমার মনে হলো এটা কি রকিব হাসানের নামে জনপ্রিয় হয়েছে, নাকি লেখার কারণে?-সে জন্য আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাইলাম যে অন্য নামে লিখলে সেই বই জনপ্রিয় হয় কিনা।

এর ফলাফলটা কী হয়েছিল?

সফল।

আবু সাঈদ ছদ্মনামে আপনার লেখা *গোয়েন্দা রাজু*ও তো কিশোরদের বই ছিল? আর জাফর চৌধুরী নামে *রোমহর্ষক*...

হ্যাঁ। ১৬টা বই বের হয়েছিল *গোয়েন্দা রাজু* সিরিজের। ওই যে *মামার মন খারাপ, চকলেট রহস্য, দামি কুকুর*...ইত্যাদি। রোমহর্ষকের ছিল *যাও এখান থেকে, নরবলি, পাগলা ঘণ্টি, অভিশপ্ত ছুরি*...ওই বইগুলো ছিল জাফর চৌধুরী নামে, মোট বই বেরিয়েছিল ১১টা। এটার আরও একটা কারণ ছিল। তিনটা ভাগ করা—একটা হচ্ছে বেশি ছোটদের। এই ধরো থ্রি থেকে ফাইভ পর্যন্ত। তিন গোয়েন্দা সিরিজটা হচ্ছে ফাইভ থেকে নাইন-টেন পর্যন্ত। আর রোমহর্ষকটা নাইন থেকে ইন্টার পর্যন্ত।

রকিব হাসান—লেখালেখির শুরুটাও কি এই নামেই ছিল?

না। রকিব হাসান নামটা আমার ছদ্মনাম না, আগেই বলেছি, কিন্তু নামটা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে একটা মজার ঘটনা আছে। আমার সার্টিফিকেট নামটা বিশাল। আবুল কাশেম মোহাম্মদ আবদুর রকিব—পাঁচটা নামের সমাহার। আমার আর ভাই নেই, সে জন্য বাবার মনে হলো পাঁচটা নাম, পাঁচটা ছেলে বানাই! (হাসি) ওই পাঁচটার পরেও হয়তো আরেকটা রাখার দরকার ছিল, সে জন্য আমাকে মাঝে মাঝে 'হাসান' নামে ডাকত। আমি শামসুদ্দীন নওয়াব নামে বই লিখেছি, কাজী আনোয়ার হোসেনের নামেও বই লিখেছি। কিন্তু আমার নামে প্রথম যে বইটা বের হয়, সেটা ছিল অনুবাদ, *জঙ্গল*, ক্যানেথ অ্যান্ডারসনের একটা শিকার কাহিনি। সে বইটা আমি লিখলাম আবদুর রকিব নামে। সে সময় বিখ্যাত *বিচিত্রা* পত্রিকার সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী প্রচ্ছদ করতে নিলেন; নামটা তাঁর পছন্দ হলো না। উনি বললেন, 'তা তোমার এতগুলা নাম, আরেকটা নাম নেই? জোগাড় করতে পারো না?' বললাম যে, আমার বাবা মাঝেমধ্যে হাসান নামেও ডাকত। উনি 'আচ্ছা' বলে চলে গেলেন। যাওয়ার তিন দিন পর সেবায় গেলাম, কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেব ডেকে পাঠালেন। বললেন আপনার প্রচ্ছদ তৈরি হয়েছে। তখন আমরা প্রায়ই কাজী সাহেবের অফিসে আড্ডা দিতাম। তো শাহাদত চৌধুরী প্রচ্ছদটা বের করলেন। সুন্দর একটা ছবি। তার ওপর লিখলেন 'রকিব হাসান'। অর্থাৎ রকিবের সঙ্গে ডাকনাম হাসান যুক্ত করে বললেন, 'এখন কেমন হয়েছে দেখো তো?' আমি বললাম, আচ্ছা রেখে দেন। যদিও মনে হয়েছে আবদুর রকিব রাখলে কী হতো? হয়তো তিন-চারটা বইয়ের পরে আবদুর রকিব নামটাই জনপ্রিয় হয়ে যেত। কারণ শুরুতে যখন হুমায়ূন আহমেদ নামটা দেখলাম, তখন সাদামাটা মনে হয়েছিল। এখন মনে হয় হুমায়ূন আহমেদ সত্যিই একটা ছান্দিক নাম। মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ইমদাদুল হক মিলন, আনিসুল হক—সবই কিন্তু সাধারণ নাম। কিন্তু এখন? যা হোক, আমি আর আপত্তি করিনি। রকিব হাসান নামেই বইটা হিট হয়ে গেল। আর কিছু করার থাকল না আমার। দ্বিতীয় বইও বের হয়ে গেল, *ড্রাকুলা*—সুপারহিট!

সেবা প্রকাশনীতে কীভাবে এলেন?

আমার ছোটবেলা থেকেই বই পড়তে ভালো লাগে। মানে বই পড়তে ভালো লাগে না শুধু, ছাপার অক্ষর এতই পছন্দ, রাস্তায় যদি ঠোঙা পড়ে থাকত, সেটাও তুলে নিয়ে পড়তাম। ওর মধ্যে কী লেখা আছে সেটা মূল কথা না, ছাপার অক্ষরটাই আসল। পড়তে পড়তেই বড় হলাম, তো দেখলাম বাংলা বইয়ের সংগ্রহ আর তেমন নেই, বাংলা বই তেমন পাওয়া যেত না আমার সময়ে। আমার তখনকার সম্বল ছিল ভারত থেকে আসা বই, সেগুলোও খুব একটা পাওয়া যেত না। যেগুলো যেত সেগুলো পড়ে পড়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম—শরৎচন্দ্র মুখস্থ, নীহাররঞ্জন মুখস্থ, যেটা পাই সেটা-ই মুখস্থ। দস্যু বাহরাম, দস্যু মোহন। আরও ছিল স্বপনকুমার সিরিজ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফেনী শহরে থাকতাম তখন, ওখানে বই পাওয়াটা খুব কঠিন। তারপরেও একটা বড় সুবিধা ছিল যে আমাদের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বইয়ের ভক্ত। যার ফলে পাঠাগারটা ছিল অস্বাভাবিক সমৃদ্ধ। ইংরেজি এবং বাংলা এই সবই ছিল। আমি ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র না, কাজেই উপন্যাস বোঝার মতো অবস্থা নেই। পড়ালেখার ইংরেজি আর উপন্যাসের ইংরেজি এক না। শিকারের গল্প আমার খুব প্রিয়। জিম করবেটের *রুদ্রপ্রয়াগের চিতার* অনুবাদ পেয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে। ক্লাস সিক্স বা সেভেনে। ও ভারত থেকে বই আনাত। বইটা অর্ধেক পড়ার পরেই ঘণ্টা পড়ে গেল—ছুটির ঘণ্টা। আমার বন্ধু, যেহেতু ওটা নতুন বই, সেটা আমাকে দিল না। পরে দিবে বলে নিয়ে গেল এবং দুঃখের বিষয় হচ্ছে বইটা সে হারিয়ে ফেলল। ফলে রুদ্রপ্রয়াগের চিতা আমার কল্পনার যে জায়গাটাতে ছিল, ওই জায়গাতেই আটকা পড়ে রইল। পরে মূল ইংরেজি বইটা আমি পেলাম আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের পাঠাগারে। ওখান থেকে এনে পড়া শুরু করলাম। বারবার ডিকশনারি দেখতে হয়েছে, কিন্তু দেখলাম যে পারি। তখন থেকে ইংরেজি কাহিনি পড়তে লাগলাম। ইংরেজি বইয়ের দোকানে ঘুরতাম অনেক, পুরোনো বইয়ের দোকানে। ঢাকায় তখন অনেক পুরোনো বইয়ের দোকান ছিল, এখনই বরং কমে গেছে। একদিন এক পুরোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক বসে আছেন—খুব শুকনো একজন ভদ্রলোক। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা, ঝাঁকড়া চুল মাথায়, সেগুলো ব্যাকব্রাশ করা, একটা কালো চশমা, একটা ইজিচেয়ারের মতো প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পা দোলাচ্ছেন আর গভীর মনোযোগের সঙ্গে সিগারেট খাচ্ছেন একটার পর একটা। দোকানদার বলল, 'অনেক নতুন বই আসছে।' আমি দেখেটেখে বললাম, 'ধুর! এগুলো সবই তো পুরোনো, আমার পড়া। নতুন বই তো তুমি কিছু আনো নাই।' তখন ওই লোক সিগারেটটা সরিয়ে বললেন, 'আপনি কী করেন?' আমি বললাম, 'আমি কিছু করি না।' বললেন, 'আপনি তো অনেক বইয়ের নাম জানেন।' বললাম, 'আমি পড়ি।' তিনি বললেন, 'আপনি কি মাসুদ রানা পড়েছেন?' বললাম, 'পড়েছি।' তিনি বললেন, 'কেমন লাগে আপনার?' বললাম 'কাজী আনোয়ার হোসেন আমার খুব প্রিয় মানুষ হয়ে গেছেন মাসুদ রানার কারণে।' বললেন, 'এগুলো তো বিদেশি বই থেকে লেখা হয়, সেটা জানেন?' বললাম, 'হ্যাঁ, জানি।' বললেন, 'বইয়ের প্লট কী করে জোগাড় করতে হয় সেটা জানেন?' বললাম, 'জানি না।' উনি বললেন, 'আমরা ইংরেজি বই পড়ে বিদেশি বইয়ের ছায়া অবলম্বনে বই লিখি। আপনার তো অনেক বই পড়া আছে, আপনি এমন এমন সব লেখকের নাম বললেন যেগুলো আমি জানিও না!' আমি বললাম, 'আপনাকে তো চিনলাম না।' দোকানদার তখন পরিচয় করিয়ে দিল, 'উনি শেখ আবদুল হাকিম।' তখন আমি বললাম, 'ও, আপনিই শেখ আবদুল হাকিম! আপনিই কাজী সাহেবের ছদ্মনামে মাসুদ রানা লেখেন?' তিনি হেসে বললেন, 'সে জন্যই তো ইংরেজি বইয়ের খোঁজ চাচ্ছি। আপনি যেগুলোর নাম বললেন, সেগুলো তো আমার চেনা না। অজানা, অনেক নাম। এগুলোর মধ্যে কি মাসুদ রানার প্লট আছে?' আমি বললাম, 'প্লট তো আছেই।' বললেন, 'আপনি প্লট দিতে পারবেন?' আমি বললাম, 'পারব। অনেক প্লটই দিতে পারব।' তিনি বললেন, 'আমার বিশ্বাস হলো না।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" তিনি বললেন, 'আমরা প্লট খুঁজে খুঁজে হন্দ, বই-ই পাই না।' আমি বললাম, 'আপনি তো অনেক বইয়ের লেখকের নামই জানেন না। আপনি প্লট পাবেন কোথায়?' তখন আমি একটু রুক্ষ স্বভাবের ছিলাম। বয়স অনেক কম। হাকিম সাহেব পা দুলিয়ে সিগারেট খাচ্ছেন, ওই জিনিসটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না। কারণ, আমি সিগারেট খাই না। ধোঁয়া ছাড়ছেন, সেটা আমার নাকে লাগছে, হাত দিয়ে থাবা মেরে সেই ধোঁয়া সরাতে হচ্ছে, তাতে আমি রেগে গিয়েছিলাম তাঁর ওপরে। তারপরে উনি সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'বলেন তো কয়েকটা ইংরেজি বইয়ের নাম?' বললাম। হাকিম সাহেব দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি ওসব বই আছে?' দোকানদার বলল, 'না, এখানে নেই।' হাকিম আমাকে বললেন, 'আপনি কি তাহলে আগামী শুক্রবার সেবা প্রকাশনীতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন? আমি কাজী সাহেবকে বলে রাখব। দুইটা মাসুদ রানার প্লট নিয়ে দেখা করতে পারবেন?' বললাম, 'পারব। দুইটা না, দশটা নিয়ে দেখা করব।'

আমি দশটাও না, বারোটা নিয়ে দেখা করেছিলাম। কাজী সাহেবকে দেখেই আমার পছন্দ হলো। শেখ আবদুল হাকিমও খুব ভালো মানুষ, পরে যখন *রহস্য পত্রিকায়* তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গেছি, তখন বুঝলাম আমিই হচ্ছি এই পুরো দলটার মধ্যে বাজে লোক (হাসি)। এঁরা সবাই অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী, আমি দুর্বিনীত। সবার মধ্যে বয়সও কম আমার। ২৭ বছর।

হাকিমের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, অথচ শুক্রবার দিন যেতেও ইচ্ছে করছে। কারণ সেবা প্রকাশনী—কাজী আনোয়ার হোসেন থাকেন—এমন একটা জায়গায় যাওয়ার প্রস্তাব! শেষ পর্যন্ত যা থাকে কপালে ভেবে বারোটা বই ব্যাগের মধ্যে নিয়ে গেলাম। কাজী সাহেবের অফিসটা তখন একটা টিনের বাড়ি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমি উঁকি দিলাম। উঁকি দিয়ে দেখি একজন ভীষণ কট্টর মেজাজের লোক বসে বসে লিখছে। কাজী সাহেবের হিসাবরক্ষক। সালাম দিলাম, তাকালেন না। খুব ভয়ে ভয়েই 'এই যে ভাই' বললাম, একটু ভুরু কুঁচকে তাকালেন। বললাম, 'শেখ আবদুল হাকিম সাহেব কি এসেছেন?' খুব রুক্ষভাবে মুখ ভেংচে তিনি বললেন, 'কত লোক যে আজ হাকিম সাহেবকে খুঁজল!' আমি বুঝলাম, আমার এখন এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, আর হবে না। এমন সময় ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'কে? নাম জিজ্ঞেস করুন।' দেখলাম হিসাবরক্ষক সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। হতচকিত হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতেই পারেননি কাজী সাহেব অন্য দরজা দিয়ে নিজের অফিস ঘরে ঢুকে বসে আছেন। হিসাবরক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কী নাম?' বললাম, 'রকিব।' ভেতরের অফিস থেকে জবাব এল, 'আসতে বলেন।' ঢুকলাম। কাজী সাহেব বসে আছেন, বললেন, 'হাকিম সাহেব চলে আসবেন এখনই।' হাকিম সাহেব এলেন খানিক পরে। তাঁকে আমি ইংরেজি বইগুলো দিলাম। এ-ই হচ্ছে সেবা প্রকাশনীতে আমার ঢোকার গল্প। সম্ভবত সেটা '৭৭-এর শেষ দিকে।

ওই দিন কি কোনো লেখার প্রস্তাব পেয়েছিলেন?

পাঁচ-সাত দিন পরে কাজী সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেদিন বিকেলে দেখা করতে বললেন। ভাবলাম, কিছু অপমান-টপমান আছে কপালে। কারণ, বড় বড় কথা বলেছি তো! বয়স কম, আত্মবিশ্বাসের কিছুটা অভাব আছে। তারপরও হঠাৎ করে শক্ত হয়ে গেলাম। কাজী আনোয়ার হোসেন, শেখ আবদুল হাকিম, শাহাদত চৌধুরী, সাজ্জাদ কাদির, জ্ঞানে-গুণে বড় বড় সব মানুষ—আমার তাতে কী? আমার মতো ইংরেজি বই তো তাঁরা পড়েননি (হাসি)। সবাই আমার চেয়ে কম পড়ছেন। তখনো জানি না, ওঁরা কোনো অংশেই আমার চেয়ে কম পড়া মানুষ নন। আমার চেয়ে বেশি শিক্ষিত, বয়সে বড়, অভিজ্ঞ। আমি ভাবলাম, হতে পারেন কেউ বড় কবি, কেউ পত্রিকার সম্পাদক, কেউ লেখক; কিন্তু আমার মতো এত ইংরেজি থ্রিলার কেউ পড়েননি। এসব ভেবে নিজেকে বোঝালাম আরকি, সাহস সঞ্চয় করলাম। গেলে আর কী হবে? বড়জোর বলবেন, আপনার বই দিয়ে মাসুদ রানা হবে না। তখন চলে আসব।

তারপর গেলাম সেবায়। আমাকে বসতে বলা হলো। হাকিম শুরুতেই বললেন, 'ভাই, এত পড়লেন কী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে? এত অল্প বয়সে?' বললাম, 'একটা বই পড়তে দু-তিন দিন লাগে, কত বই-ই তো পড়া যায়!' তিনি বললেন, 'আপনার বইগুলো প্রায় সবগুলোই হবে।' কাজী সাহেব একটু নাটক করে বলতে চেয়েছিলেন, হাকিম তাঁকে সেটা করার সুযোগ দিলেন না, প্রথমেই আসল কথাটা ফাঁস করে দিলেন। আমি বললাম, 'ওই দিন আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি দোকানে...' বাধা দিয়ে হাকিম বললেন, 'ধুর সাহেব, করে ভুলে গেছি সে কথা! আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, এতগুলো মাসুদ রানা দিয়েছেন। আমি তো প্লট পাচ্ছিলাম না, লিখতে পারছিলাম না।' তখন আমি চিন্তা করলাম পড়তে পারি, লিখতে অসুবিধে কী? আমি একটা মাসুদ রানা লিখব। একটা বই পড়লাম, খুব ভালো একটা বই ছিল। সেটা পড়ে মনে হলো, এটা মাসুদ রানা হয়েই আছে। কাজী সাহেবকে গিয়ে বললেই হয়। তারপরে গিয়ে কাজী সাহেবকে বললাম যে এই বইটা মাসুদ রানা হয়। তিনি বললেন, 'যেগুলো দিয়েছেন, ওগুলোর চেয়ে ভালো?' বললাম, 'হ্যাঁ, ওগুলোর চেয়ে ভালো।' তিনি রসিকতা করে বললেন, 'এটা আগে না দিয়ে নিজে রেখে দিলেন কেন?' বললাম, 'হাতের কাছে যা পেয়েছি তা-ই নিয়ে ছুট দিয়েছিলাম।' কাজী সাহেব বললেন, 'তো, লিখতে পারবেন?' বললাম, 'আমি পারব কি না আপনি বলেন।' তিনি বললেন, 'পারবেন।' আমি বললাম, 'কী করে বুঝলেন পারব?' তিনি বললেন, 'কারণ, আপনি পড়তে পারেন। লিখতে পারার মূলে হলো পড়া। আপনার বাংলাও পড়া আছে, ইংরেজিও পড়া আছে।' সেই প্রথম একটা মাসুদ রানা লিখলাম। ভুল-ভাল হয়েছিল অনেক। কাজী সাহেব বইটা পড়লেন। পড়ে আবার ডেকে পাঠালেন। গেলাম এবার ভয়ে ভয়ে। পাণ্ডুলিপিটা আমার সামনে ছেড়ে দিলেন। দেখলাম যে অনেক লাল কালির দাগ, বানান ভুল, কাটাকুটি। ভাবলাম, আমাকে দিয়ে হবে না। উনি বললেন, 'না, হবে। হয়েই আছে। খুব ভালো লিখেছেন।' আমি একটু সাহস পেলাম। তিনি বললেন, 'এই এই জিনিসগুলো একটু মেরামত করে নিয়ে আসেন। তারপর হাকিমকে দিয়ে সম্পাদনা করাব। সবশেষে আমি দেখব।' সেসব করার পর বেরিয়ে গেল মাসুদ রানার বই। খুব সহজেই বলতে হবে। তখন সাহস পেয়ে গেলাম। বললাম এরপর কী লিখব? উনি বললেন, 'মাসুদ রানা আর লিখতে যেয়েন না। কারণ এটা লিখতে অভিজ্ঞতা দরকার, অনেক কঠিন কাজ। আপনি সহজ কোনো কাজ দিয়ে শুরু করেন।' পরে চিন্তা করলাম যে কী দিয়ে শুরু করতে পারি? জুল ভার্ন আমার খুব ভালো লাগত। বললাম যে জুল ভার্ন অনুবাদ করলে কি চলবে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, চলতে পারে। আপনি চেষ্টা করেন।' বললাম, 'মাসুদ রানা তো লিখলাম কাজী আনোয়ার হোসেনের নামে, *জুল ভার্ন*-এর অনুবাদটায় কী হবে?' হাকিম আমাকে সাবধান করল, 'রকিব! খবরদার! নিজের নামে লিখতে যেয়েন না! কাজী সাহেবকে রাজি করান। কাজী আনোয়ার হোসেনের নামে অনুবাদ করেন।' বললাম, 'কেন?' বলল, 'ওই নামে লিখলে ভুল হলেও বই চলবে।' (হাসি) তো কাজী সাহেব বলেন, 'না, জুল ভার্ন-এর অনুবাদ ওর নিজের নামেই বের হবে। আপনার সাহস নাই। যদি ওর সাহস থাকে লিখুক।' আমি কিন্তু আমার নামে লিখতে রাজি আছি। কিন্তু হাকিম আমাকে কিছুতেই ছাড় দিল না। তারপর কাজী সাহেব বলেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, একটা ছদ্মনামে লিখেন, শামসুদ্দীন নওয়াব নামে লিখেন।' শামসুদ্দীন নওয়াব হচ্ছে কাজী সাহেবেরই আরেক নাম। তখন থেকেই শুরু হলো অনুবাদ। প্রথম অনুবাদ করলাম শামসুদ্দীন নওয়াবের নামে *পাতাল অভিযান*, তারপর *সাগরতলে*, তারও পর *রহস্যের খোঁজে*। তিনটা লিখলাম, এর মধ্যে একদিন সাজ্জাদ কাদির এনে হাজির করলেন *বারমুডা ট্রায়াঙ্গল* নামে একটা বই। সাজ্জাদ কাদির খুব প্রশংসা করতে লাগলেন বইটার। বললেন, অসাধারণ সব গল্প আছে। আমি বইটা পড়িনি। উল্টেপাল্টে দেখলাম। বললাম, 'এ তো পড়ি নাই।' সাজ্জাদ হো হো করে হাসলেন। বললেন, 'রকিব পড়ে নাই, এমন বই আমরা পড়েছি! তো রকিব, কী করবা?' আমি বললাম,'এটা আমাকে দিয়ে দেন। আমি এটার অনুবাদ করব।' তিনি বললেন, 'এটা তো আমি অনুবাদ করব ভেবে কিনেছি। এই জন্যই কাজী সাহেবকে দেখাতে এনেছি।' তিনি যে খেপাচ্ছেন আমাকে, উত্তেজনায় সেটাও বুঝতে পারলাম না। আমি বললাম, 'না, এটা আমাকে দিয়ে দেন।' তিনি বললেন, 'তুমি কী করে বুঝলা এটা ভালো হবে?' আমি বললাম, 'ব্যাকগ্রাউন্ড পড়েই বুঝেছি।' কাজী সাহেব বললেন, 'আচ্ছা এটা নিয়ে যান। দেখি, কী করে আনেন।' করে আনলাম এবং ওইটাও শামসুদ্দীন নওয়াবের নামে ছাপা হলো। এবং এটা হলো এখন পর্যন্ত আমার ছদ্মনামে লেখা সুপারহিট বইগুলোর একটা। শামসুদ্দীন নওয়াব নামে লেখা। তারপরই এল *জঙ্গল*! তখন আমার সাহস হয়ে গেছে। তখন আমি বলেছি, আমি আমার নামেই লিখব। হাকিমের বাধা আর মানলাম না। রকিব হাসানের জন্ম হলো। *জঙ্গল* হচ্ছে ক্যানেথ অ্যাণ্ডারসনের শিকারকাহিনি।

এটাই নিজের নামে প্রথম লেখা ছিল?

হ্যাঁ। দ্বিতীয় হলো ব্রাম স্ট্রোকারের বিখ্যাত বই *ড্রাকুলা*। 'আশির শেষ দিকে বেরিয়েছিল।

আপনার ছেলেবেলা কেটেছে ফেনী শহরে। তখনকার দিনগুলো কেমন ছিল?

স্কুলে যেতে ইচ্ছে করত না। পাঠ্যবই পড়তে ইচ্ছে করত না। পাঠ্যবইয়ের মধ্যে দ্রুতপঠন, আর বাংলা বইতে যেসব গল্প থাকত, সেগুলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে শেষ করে ফেলতাম। স্কুলে যেতে ইচ্ছে না করলেও কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে স্কুলে যেতেই হতো। আব্বা চলে যেত অফিসে, আর মা ছিল ভীষণ কঠোর! কোনোভাবেই মাকে ফাঁকি দেওয়া যেত না, স্কুলে যেতেই হতো। আমার ভাই নেই। বোন তিনজন। একজন বড়, আর দুজন ছোট। পাঠ্যবইয়ের ভেতর গল্পের বই লুকিয়ে নিয়ে পড়তাম, এখনকার বাচ্চারা যা করে, এই যে (দেখিয়ে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠিন একটা প্রশ্ন করে রকিব হাসানকে চিন্তায় ফেলতে পেরে দারুণ খুশি কিঅা সাক্ষাৎকার দল

AMARBOI.COM

এভাবে। (হাসি)। মায়েরা যখন বাধা দেন, তখন সব কিশোর পাঠকেরাই বোধ হয় এই কাজটা করে।

তখন লেখালেখি করতেন?

লেখালেখি তখনো শুরু করিনি। সে সময় নীহাররঞ্জনের *কালো ভ্রমর* খুব জনপ্রিয় বই ছিল। সেটা পড়ে মনে হলো, দারুণ তো! *দস্যু বাহরাম* পড়ি, *টারজান* পড়ি আর নানা রকম কল্পনা তৈরি হয় মগজে, লিখতে ইচ্ছে করে। বাহরামের অনুকরণে একটা দস্যু সিরিজ লেখার খুব ইচ্ছে হলো। তখন ক্লাস এইটে পড়ি। একটা বই লিখে ফেলে নাম দিলাম *ডাকু মনসুর*। দ্বিতীয় বইটা আর লেখা হয়নি। পাণ্ডুলিপিটা আমার এক বন্ধু পড়ে বলল, 'দারুণ লেখছস।' বলল ঠিকই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে সে হারিয়েও ফেলল। বইটা আর প্রকাশিত হয়নি। যাহোক, ক্লাস এইটে উঠেও পাঠ্যবই পড়তে চাইতাম না। স্কুলে যেতাম, টিচারের কথাগুলে' মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। তবে হোমওয়ার্ক করতাম, না হলে পিটুনি খাওয়া লাগত। কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। মা অনেক কঠোর হলো। পরীক্ষার আগে ৭ দিন পড়ে নিলাম, ভালোমতো। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা। একবার ক্লাস ফাইভে বোধ হয় না পড়েও ফার্স্ট হয়ে গিয়েছিলাম। যাহোক, না পড়েও মোটামুটি পাস করলাম এইটেও। এখনকার মায়েরা স্কুলে নিয়ে যান, সারাক্ষণ কড়া নজর রাখেন, তখন তো ওসব ছিল না, মায়েরা খালি দেখতেন ছেলে ঠিকমতো পড়তে বসছে কি না। আর ঠিকমতো স্কুলে গেল কি না। আমার ক্ষেত্রেও তাই। আমি কী পড়লাম, কী লিখলাম, অত তদন্তের মধ্যে যেত না মা। আর আব্বা খেয়ালই দিত না। আব্বার মত হচ্ছে স্বাধীনভাবে বড় হবে—পড়লে পড়ল, না পড়লে নাই। ছেলে হয়ে জন্মেছে যখন, কিছু তো একটা হবেই, চোর-ডাকাত কিংবা খারাপ মানুষ না হলেই হলো।

আব্বা কী করতেন?

সরকারি চাকরি করতেন। উনি নিজেও পাঠক। আমি স্কুল থেকে কোনো বই আনলে সেটা কেড়ে নিয়ে পড়তেন। যখন তাঁর আঙুলে ধরে বাজারে যাওয়া শিখলাম, তখন একদিন বলেছিলাম, 'আপনি লেখাপড়া কতখানি করেছেন?' আব্বা বললেন, 'যা করেছি, তোর মতোই।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি স্কুল ফাঁকি দিতেন?' আব্বা হেসে জবাব দিলেন, 'আমারও স্কুলে যেতে ইচ্ছে করত না, কিন্তু বাবা সব সময় একটা কঞ্চি রাখত। তোর বাপের মতো অত সহজ বাপ ছিল না সে! মা কিছু বলত না, কিন্তু বাবা কঞ্চির বাড়ি দিত, কাজেই আমাকে স্কুলে গিয়ে পড়তে হতো।' আমার আব্বার এসব স্বাধীনতা দেওয়া আমাকে খারাপ বানায়নি, বরং বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে আমার কাজে লেগেছে। মায়ের কঠোরতাটাও কাজে লেগেছে। না হলে আমি যা ছিলাম, এসএসসিও পাস করতাম না। তবে এখন বাচ্চাদের ওপর অভিভাবকেরা পড়ালেখার যে চাপ দেন, সেটা ভয়ংকর। বাচ্চাগুলোর জন্য কষ্ট হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দিয়ে...এই পাও-ওই পাও-জিপিএ পাও-এটাতে ভর্তি হও-ওটাতে... এত্ত বেশি চাপ, রীতিমতো নির্যাতন। এ ধরনের কথা সম্ভবত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সাক্ষাৎকারেও পড়েছি, বোধ হয় তোমাদের কিশোর আলোতেই।

আপনার স্কুলের কোনো মজার ঘটনা মনে পড়ে?

স্কুলে আমার উর্দু ক্লাস করতে ইচ্ছে করত না। মনে হতো, কী হবে উর্দু শিখে। ফাঁকি দেওয়ার চিন্তা করতে লাগলাম। উর্দু ক্লাসে টুপি পরতে হতো। উর্দু শিক্ষককে আমরা বলতাম ছোট হুজুর। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হতো, উর্দু একটা মহাপবিত্র ভাষা, শেখার সময় টুপি না পরলে অপবিত্র হয়ে যাবে। একদিন দেখলাম, ছোট হুজুর সামনের বেঞ্চে বসা একটা ছেলেকে ধরলেন, তার মাথায় টুপি নেই। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাই তোর টুপি কই?' ছেলেটা বলল, 'হুজুর, আনতে ভুলে গেছি।' ছেলেটার কান ধরে হুজুর বললেন, 'বাইর হ।' সোজা বের করে দিলেন। মানে টুপি মাথায় না থাকলে উর্দু ক্লাসে থাকা যাবে না। বুদ্ধি পেয়ে গেলাম। আমার টুপিটা বের করে মাথায় দিতে গিয়েও দিলাম না, পকেটে রেখে দিয়ে খুব নিরীহ ভঙ্গিতে বসে রইলাম। 'অ্যাই, তোর মাথায় টুপি নাই কেন?' আমাকে জিজ্ঞেস করলেন হুজুর। বললাম, 'হুজুর, আনতে ভুলে গেছি।' আমারও কান ধরে বললেন, 'বাইর হ!' পেয়ে গেলাম সুযোগ। তখন থেকে যেদিনই হুজুরের ক্লাস থাকত, টুপি পরতাম না। তারপরে একদিন হুজুর ধরে ফেললেন ফাঁকিটা। বললেন, 'অ্যাই, জাতীয় সংগীতের সময় আমি তোর মাথায় টুপি দেখছি! ক্লাস ফাঁকি দিস, না?' (হাসি)।

আপনি বাবার চাকরির জন্য ফেনীতে থাকতেন, নাকি বাড়ি ছিল ওখানে?

বাবার চাকরির জন্য। বাড়ি, মানে জন্ম কুমিল্লায়।

কত সালে?

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বরে জন্ম। এখানে সার্টিফিকেটের একটা সমস্যা আছে। আমাকে আব্বা বাসায় পড়াতেন। একদম ছোটবেলা থেকে। একদিন ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। সুপারিনটেনডেন্টকে বললেন, 'একে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করে দেন।' সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, 'না, আগে ওয়ানে ভর্তি করানো নিয়ম।' আব্বা বললেন, 'না, আপনি দেখেন, ও পারবে। ক্লাস ফোরেরগুলোও পারবে।' সুপারিনটেনডেন্ট দেখলেন আমি সত্যিই ক্লাস ফোরের পড়াও পারি। আমাকে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করা হলো। সে জন্য আমার বয়সের তুলনায় ক্লাস এগিয়ে গেল। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী এসএসসি দিতে সাড়ে চৌদ্দ বছর বয়স হতে হতো তখন। সে জন্য এসএসসির আগে বয়সটা ইচ্ছে করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

চারদিকে তো অনেক পেশা। বৈমানিক কিংবা ০০৭! ছোটবেলায় আপনি কী হতে চাইতেন?

আমি মনে হয় লেখকই হতে চেয়েছি। এর বাইরে কোনো কিছুতে আমার কোনো আকর্ষণ নেই। অনেক কাজেরই সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু যাইনি। যে চাকরিগুলোর কথা বলছি, ওগুলোর কোনোটাই কিন্তু ফেলনা ছিল না। তবু ঘরে বসে বেকুবের মতো লিখে যাওয়াতেই মন সায় দিচ্ছিল আমার।

আপনি কখনো অন্য কোনো পেশায় ছিলেন?

১২-১৩টা চাকরিতে ঢুকেছি, কোনোটার মেয়াদ ৮ ঘণ্টা, কোনোটা ২০ ঘণ্টা, কোনটা ১২ ঘণ্টা, কোনোটা ১০ দিন! (হাসি) ওইসব করে-টরে আমি বুঝলাম বসের ঝাড়ি আমার সহ্য হবে না, নিয়মিত অফিসে যাওয়া আমাকে দিয়ে হবে না, স্যার বলতে আমি পারব না, সালাম দিতে পারব না। আমি স্বাধীন টাইপের মানুষ, স্বাধীনভাবে থাকাই ভালো। তাতে টাকা কামাই হলে হোক, না হলে নাই।

সেবা প্রকাশনীর *রহস্য পত্রিকার* সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘদিন। ওটা তো একধরনের চাকরি...

না, চাকরি ছিল না। আমিই কাজী আনোয়ার হোসেনকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম যে *রহস্য পত্রিকা* বের করেন আবার, একটা আড্ডাবাজি করা যাক। কারণ, খালি বই লিখতে লিখতে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলাম; যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। সবাই অফিস যায়, ছাতা মাথায় দেয়, বাদুড়ঝোলা হয়ে বাসে যায়। আমরা কোথাও যেতে পারি না। খালি ঘরে বসে বসে বই লেখা, টাইপরাইটারে। এমন কিছুর একটা ব্যবস্থা করেন যাতে একটু আড্ডাবাজির ব্যবস্থা করা যায়। আমি বললাম, *রহস্য পত্রিকা*টা আবার চালু করলে একটা সুবিধা হবে; *রহস্য পত্রিকায়* অনেক মানুষ আসবে, অনেক মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা হবে, আড্ডাবাজি হবে, চা খাওয়া হবে, লেখালেখি হবে, ওরা লেখাগুলো আনবে, সেগুলো কাটাকাটি হবে, একটা বৈচিত্র্য হবে। সেই সঙ্গে যদি *রহস্য পত্রিকার* কাজটা করে দিই, তাহলে আপনার ব্যবসা হবে। ব্যবসা হলে আমাদের চা খাওয়া, আসা-যাওয়ার খরচাপাতিটা দিয়ে দেবেন। তাহলেই তো আমাদের হয়ে গেল।' বললেন, 'আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব।' পাঁচ-সাত দিন পর বললেন, 'আমি ঠিক করেছি, *রহস্য পত্রিকা* আবার বের করব।' প্রথমে আমাদের যাওয়ার কোনো বিধিনিষেধ ছিল না, সবাই মোটামুটি সন্ধ্যাটাকে বেছে নিলাম এবং যার যার মতো যেতাম-আসতাম। কারণ বাঁধাধরা নিয়ম কাজী সাহেব নিজেও পছন্দ করেন না। উনি নিজেও তো চাকরি করেননি। পুরো স্বাধীনতা আর আড্ডাবাজির মধ্যে পত্রিকাটা বের হতো। তবে যেই মুহূর্তে এটা পেশাদার হয়ে উঠতে লাগল; মানে বিক্রি বাড়তে লাগল, পয়সা আসতে লাগল অনেক বেশি, আমাদেরও বেতন বাড়তে লাগল, আমি ছেড়ে দিলাম। মানে আমার কাজটাই হলো যেটা তুঙ্গে ওঠে, সেটা ছেড়ে দেওয়া (হাসি)। কারণ, সেটা তখন আমার জন্য ফাঁদ হয়ে যায়। স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ মানেই আমি ছেড়ে দেব।

সব সময় তো এত রহস্য আর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লেখেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো কি মনে হয়েছে নিজেও এসব অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়বেন?

হুমায়ূন আহমেদের একটা বই-ই আমি পড়েছিলাম সে সময়, নাম *দারুচিনি দ্বীপ*। এক ঝড়ের দিন সকালে বইটা পাওয়ায় পড়তে শুরু করলাম। হুমায়ূন আহমেদ যে কী জিনিস, এটা তখনো বুঝিনি। আমাকে শেষ করিয়ে ছাড়লেন। আমার অনেক কাজ তখন। *দারুচিনি দ্বীপ* পড়ে মনে হলো, তিনিও লেখক, আমিও লিখি। বয়স সমানই দুজনের। হুমায়ূন আহমেদ যদি সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যেতে পারেন, গিয়ে বাড়ি বানাতে পারেন, আমার সেখানে যেতে অসুবিধাটা কোথায়? আমি ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম টেকনাফ। ওই সময়টাতে শান্তিবাহিনীর সমস্যা, টেকনাফে রোহিঙ্গা। সম্রাট হোটেল নামে একটা হোটেল ছিল। হোটেল ম্যানেজার আমাকে দেখে বললেন, 'আপনি এই ঝড়ের মধ্যে সেন্ট মার্টিন যাবেন?' আমি বললাম, 'আমাকে নিয়ে যেতে পারলে যাব।' তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। জানালাম। সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটা হোটেলের ম্যানেজার তিনি, লাফ দিয়ে উঠলেন, 'আপনি তিন গোয়েন্দার লেখক না তো?' বললাম,'হ্যাঁ, আমি তিন গোয়েন্দারই লেখক।' উনি বললেন, 'আমার দুই মেয়ে তিন গোয়েন্দার অন্ধ ভক্ত।' এরপরে আর আমাকে কিছু করতে হলো না। বেয়ারাকে ডাক দিয়ে বললেন, 'ব্যাগ-ট্যাগ যা আছে সব নিয়ে যাও। খাবার দাও, হাত-মুখ ধোয়ার জায়গা দাও।' তারপরে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি সত্যিই যেতে চান?' আমি বললাম, 'হুমায়ূন আহমেদ যাননি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, গিয়েছেন।' বললাম, 'আমিও যাব।' তারপর তিনি ট্রলারের মাঝিকে ডেকে আনালেন। বললেন, 'এই ভদ্রলোক আমার লোক। তাঁকে সেন্ট মার্টিনে পৌঁছানোর দায়িত্ব তোমার।' পরদিন সকালে ঝড় থেমে গেল, হঠাৎ করে রোদ উঠল। ট্রলারের লোক আমাকে শুরুতে নিয়ে গেল টেকনাফের চায়নিজ মার্কেটে। দুই জোড়া রাবারের স্যান্ডেল, জালের দড়ির ব্যাগ, তার মধ্যে গামছা, কিছু কাপড়চোপড় আর একটা বিশেষ টুপি কেনাল আমাকে দিয়ে। বলল, আপনার ব্যাগ-ট্যাগ সঙ্গে করে ঢাকা থেকে যেগুলো নিয়ে আসছেন, ওগুলা লাগবে না, আপনি এগুলা রাখেন। তারপরে হাঁটা দিল ম্যানগ্রোভের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। তখন ভাটার সময়। হাঁটু পর্যন্ত দেবে যায়, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তারা আমাকে হাঁটাচ্ছে তো হাঁটাচ্ছে। বললাম, 'আমি যাব সেন্ট মার্টিন, তোমরা আমাকে সুন্দরবনে ঢোকাচ্ছ কেন?' মাঝি বলল, 'চলেন!' এ রকম করতে করতে বহুদূর নিয়ে যাওয়ার পর নাফ নদী দেখা গেল। নাফ নদীর ঠিক মাঝখানে একটা ট্রলার। সেই ট্রলারটা এত পুরোনো, মনে হচ্ছে প্রাচীনকালের স্প্যানিশ জলদস্যুরা যেগুলো নিয়ে বের হতো, সে রকম কিছু। একটা ডিঙি নৌকা করে সেখানে পৌঁছার পর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় মনে হলো স্প্যানিশ জলদস্যুদের জাহাজেই উঠেছি। ছোটবেলায় আমার টারজান হওয়ার, স্প্যানিশ জলদস্যু হওয়ার শখ ছিল।

যাচ্ছি আর ভাবছি, সমুদ্র নেই কেন? ভটভট করে ট্রলার চলছে। যখন মোহনাতে পড়ল, তখন গিয়ে মনে হলো, যাক, এতক্ষণে সমুদ্র দেখা গেল। মোহনায় গিয়ে পড়ার পর ট্রলার একটা ঝাঁকি খেল। ঝাঁকি খেয়ে মোহনাটা পার হলো, পার হয়ে সমুদ্রে পড়ল। ঝকঝকে রোদ। কিছুদূর যাওয়ার পর বড়ই হতাশ লাগতে লাগল। মনে হলো, ধুর! আমাদের বাড়ির কাছে যে লেকটা আছে, যেটার মধ্যে বর্ষাকালে নৌকা নিয়ে যেতাম, এ তো সেই জিনিস। সমুদ্র তো এমন কিছু না। তারপরে গেলাম সেন্ট মার্টিন। দ্বীপটা অসম্ভব ভালো লাগল।

আপনি সমুদ্র পাড়ি দিলেন, আপনার ভয় লাগল না?

না। বললামই তো, দিঘির পানির মতো শান্ত। বাতাস নেই, তখন ঝড়টর সব থেমে গেছে। এবং আমি হতাশও হয়েছি যে কেন একটু দোলাল না, সমুদ্রে তো একটু দোলানি-টোলানি খাবই! তারপরে গেলাম, গিয়ে নামলাম, হুমায়ূন আহমেদের বাড়িটাড়ি দেখলাম। এখন যেখানে বন্দরটা হয়েছে, ওইটার সামনে একজন জেলের বাড়ি ছিল। ২৬টা নারকেলগাছ, ২ বিঘা জমি, একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর, তা-ও খুঁটির ওপর বসানো। হুমায়ূন আহমেদ তো আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বাড়ি দেখার পর, আমার মনে হলো আমি এই দ্বীপেই থাকি, আর যাব না। সঙ্গে যে ছিল, তাকে বললাম, 'আচ্ছা, এই জেলের বাড়িটা কেনা যায় না?' বলল, 'হ্যাঁ, যায়।' সে ডাকতেই জেলে পরিবার নেমে এল। যে ঘরটা থেকে নামল, ওইটাও আমার পছন্দ। একটা কুঁড়েঘর, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। কেনার প্রস্তাব দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। নিবন্ধনসহ ৮০ হাজার টাকা। আমি হিসাব করে

শেখ আবদুল হাকিম। তাঁর সঙ্গে রকিব হাসানের প্রথম দেখা হয়েছিল নীলক্ষেতের পুরোনো বইয়ের দোকানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম যে টেকনাফ গিয়ে আমি হাজার বিশেক টাকা এদের অগ্রীম দিতে পারব। বললাম, 'আমার সঙ্গে চলো।' এল। দিয়ে দিলাম ২০ হাজার টাকা। অর্থাৎ ওটা আমি কিনলাম। এরপরে নেশা হয়ে গেল। সেন্ট মার্টিনে জায়গার মালিক হয়ে গেছি, এখন তো নেশা হবেই! ঘনঘন যাই। মাসে দুবার। এ রকম করতে করতে চার-পাঁচবার, ছয়বার, সাতবার গেলাম। সপ্তম কিংবা অষ্টমবারে একটু ঝিরঝিরে বাতাস। এই বাতাসটা এত দিন ছিল না। হোটেল থেকেই দেখলাম, নারকেলগাছের মাথাটা একটু একটু কাত হয়ে যাচ্ছে। সম্রাট হোটেলের ম্যানেজার বললেন, 'আপনি কিন্তু একটা ধাক্কা খাবেন।' বললাম, 'কিসের ধাক্কা?' তিনি বললেন, 'এই যে, বাতাস।' কিসের বাতাস! মুখে বরং ফুরফুরে বাতাস লাগে, আরাম-শান্তি। নাফ নদীতে উঠলাম, নদীটা কেমন কালো হয়ে আছে। একটা গা ছমছমে ভাব, কিন্তু রোদ। দূর থেকে চেনা মোহনাটাকে দেখে ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে। ট্রলারটা যাচ্ছে, যাচ্ছে, হঠাৎ একটা টান দিল। টান দেওয়ার পর কামানের কয়েকটা গোলা একসঙ্গে ফাটলে যে শব্দ হয়, ওরকম একটা শব্দ হলো। খুঁজে বেড়াচ্ছি, শব্দটা কোথায়? আসলে ট্রলারের নিচে পানি দিচ্ছে বাড়ি। সাগরের ঢেউ। পড়ল মোহনায়। মোহনা যখন পেরোচ্ছে, ক্রমাগত বাড়ি মারছে। আর এমন এমন ঢেউ! সাগরের কাছে আমি তখন ক্ষমা চাইলাম যে আমি তোমায় ছোট করে দেখছিলাম, দিঘি বলেছিলাম। একবার কাত হতে হতে কয়েক ইঞ্চি বাকি থাকে, আবার সোজা হয়। প্রত্যেকটা দুলুনিতে আমার মনে হয় আয়ু শেষ। কোনোরকমে সেন্ট মার্টিন পৌঁছালাম। জমিটা তখনো রেজিস্ট্রি হয়নি। রেজিস্ট্রির জন্যই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, গাছের মাথাগুলোকে বাতাস একপাশে কাত করে ফেলেছে। নারকেলগাছ কিন্তু খুব শক্ত। সেগুলো একদম বাঁকা, অ্যাঙ্গেলের মতো করে ফেলেছে। দেখলাম, দ্বীপ সব সময় স্বর্গ নয়! কেয়া বনগুলো থরথর করে কাঁপছে, মনে হচ্ছে যেন ভয়ে। দূরে সমুদ্রে রোল হচ্ছে, নীলচে-সবুজ পানিটা আর নাই। সাদা সাদা ধোঁয়ামতো উঠছে। ভালোও লাগল, যে এত দিনে তাহলে জলদস্যুর সমুদ্র দেখলাম। যা-ই হোক, তারপরে ফেরার পথে আরও ভালোমতো দেখলাম।

ওই দিনই ফিরেছিলেন?

ওই দিনই। আর কি থাকি! ফিরে আসার সময় খানিক পরপরেই দেখি, গাল চটচট করে। তখন আমি পড়তাম মেটালের চশমা। ঢেউ বাড়ি দিলেই জ্বালা করে নাক। তারপরে দেখি নাকের কাছে ঘা হয়ে গেছে। ওই রোদটা তো খাড়া লাগে, গরম করে পুড়িয়ে ফেলেছে নাকের দুপাশ। হাত দিলে দেখি চটচট করে পুরু লবণ। বোধ হয় রাজশাহীর কোনো একটা স্কুলের একদল ছাত্র গিয়েছিল সেদিন। সবাই পানিতে ভেসে থাকার জ্যাকেট-ট্যাকেট পরে কান্নাকাটি। আমিও তো ভয় পাচ্ছি। ওদের বললাম, তোমরা যে চেঁচামেচি করছ, লাফালাফি করছ, এই ট্রলার কিন্তু একেবারেই হালকা। একপাশে যদি কাত করে দাও, মাত্র কয়েক ইঞ্চি। ডুবে যাবে। মোহনা পেরোবার পর, আমি ভাবতে ভাবতে আসছি। সাগরের কাছে জীবন বাজি। একজন পাগলামি করেছেন বলে আমিও পাগল হব নাকি (হাসি)। মোহনাটা পেরোলাম। পেরোনোর পরে সে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। একটা চর আছে, সে চরটাকে দূর থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে বিঘার পর বিঘা লাল টকটকে হয়ে আছে। সাদা চর। শাহপরীর দ্বীপটা তখন তো চরই ছিল। বাড়িঘর ছিল না। কাছে আসার পর বুঝলাম, এগুলো কিছুই না, স্রেফ সাগরের কাঁকড়া। ঝড়ের সংকেত পেয়ে কোটি কোটি লাল কাঁকড়া পানি থেকে উঠে পড়েছে, বালুতে বিছিয়ে আছে। লাল চাদরের মতো। আরেকটু এগোলাম, দেখি ম্যানগ্রোভের জঙ্গলগুলো সব ধবধবে সাদা। সাদা বকের দল এত এসেছে, এসে গাছগুলো সাদা করে ফেলেছে। মানে সবাই সংকেত পেয়েছে, আশ্রয়ের সন্ধানে চলে এসেছে। তখন কিন্তু ঝকঝকে রোদ, ঝড়ের কোনো চিহ্নই নেই। আসার সময় কতগুলো দর্শন তৈরি হয়েছে মগজে। জায়গাজমি সব মাথা থেকে উধাও হয়েছে তখন। গাংচিলদের দেখলাম কত সাবলীলভাবে পানিতে ভেসে আছে। ওগুলোর তুলনায় আমার মনে হচ্ছিল মানুষ কত অসহায়। পানির বোতল হাতে নিয়ে বসতে বলেছিল মাঝি। আমি জানি এই পানির বোতল নিয়ে বসে কোনো লাভ হবে না। যদি ডুবে যাই, তাহলে ওই পানি খাওয়ার সুযোগও আমার হবে না। কিন্তু ওই গাংচিলটা? পানি খেতে পারছে, পা নাড়াচ্ছে, ইচ্ছে করলেই উড়ে যাচ্ছে। অথচ আমি কত অসহায়! নিজেকে এত বিরাট ভাবার কী হলো মানুষের? যাহোক, নাফ নদী পাড়ি দিলাম। ওটাই আমার শেষ যাত্রা। পরে জমির মালিক আর দালালেরা ফোন করতে করতে অস্থির। আমি বললাম ২০ হাজার টাকা গেছে, যাক। আমার বায়না ফেরত দেওয়া লাগবে না। আমি জমির জন্য সাগরের কাছে জীবন বাজি রাখতে পারব না। আমার স্প্যানিশ জলদস্যু হওয়ার শখ শেষ। (হাসি)।

তিন গোয়েন্দার ৩০ বছর পূরণ হতে চলেছে। একটা সিরিজ হিসেবে বেশ লম্বা পথ পাড়ি দিল কিশোর-মুসা-রবিনরা। এর শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

বড়দের বই পড়তে পড়তে একসময় আমি কিশোরদের বই পড়তে শুরু করলাম। একদিন দুপুরে খাওয়ার পর একটা হালকা ধরনের বই পড়তে বসলাম—*থ্রি ইনভেস্টিগেটরস* সিরিজের একটা বই নিলাম। দারুণ লাগল। পড়ে আমার মনে হলো এটা যদি আমাদের দেশের কিশোরদের জন্য রূপান্তর করা যায়, তাহলে ওদের অনেক ভালো লাগবে। আইডিয়াটা এভাবেই এল। একসময় ঠিক করলাম, বড়দের জন্য লেখা বন্ধ করে আমি ছোটদের জন্যই লিখব। তিন গোয়েন্দার শুরুটা এভাবেই। পরে সেই বইটা থেকেই *কাকাতুয়া রহস্য* বইটা লিখেছি। রবার্ট আর্থারের এই বইটাই আমার লেখক জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আর্থারের মতোই, কিশোর-মুসা-রবিন—এদের সৃষ্টি করার সময় আমি তিনটা চরিত্রকে তিন ভাগে ভাগ করেছি। চিরকালই দেখে এসেছি, গোয়েন্দা কাহিনিতে একজন থাকে গোয়েন্দা আর আরেকজন তার সহকারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহকারীটা একটু বোকা আর মারামারিতে ওস্তাদ; অন্যদিকে গোয়েন্দার থাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আমি চিন্তা করলাম তিনজন গোয়েন্দা থাকবে—একজন বুদ্ধি খাটাবে, আরেকজন শক্তিতে পারদর্শী আর আরেকজনের মাথায় সব ধরনের তথ্য জমা থাকবে। এভাবে তারা তিনজন মিলে একজন হয়ে যাবে।

গুরুর সময় কি ভেবেছিলেন, এই সিরিজ একদিন এতটা জনপ্রিয়তা পাবে, কিশোরদের বই পড়া শেখাবে?

কিশোরদের বই পড়া শেখাবে কি না জানতাম না, তবে জানতাম যে এই সিরিজ দাঁড়াবে। তার কারণ হচ্ছে যে বইটা পড়ে আমি এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, একজন বয়স্ক লোক, তাতে আমার মনে হয়েছিল এটা কিশোরদের ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এতটা জনপ্রিয় হবে, এটা ভাবিনি। এতদিন টিকবে, এটাও ভাবিনি। কিন্তু জনপ্রিয় হবে, আমি নিশ্চিত ছিলাম।

নামগুলো কীভাবে পেলেন? কিশোর-মুসা-রবিন—এই নামগুলোর পেছনে কি কোনো গল্প আছে?

না। কোনো গল্প নেই। আমি ঠিক করেছিলাম একটু সহজ নাম নেব, কিন্তু যেগুলো খুব বেশি প্রচলিত নয়। ও রকম তিনটে নাম বাছাই করা দরকার, বিশেষ করে বাঙালি নামটা।

কিশোর মুসা রবিন তো রকি বিচের একটা স্কুলে পড়ত। কিন্তু কখনো তাদের ক্লাসের কথা বলা হয় না কেন?

বলা হয় না এ জন্য যে, বয়স দিলেই একটা সমস্যা তৈরি হয়। যেমন ১৩ বছর বয়স দিলে প্রতি বছর বয়স বাড়তে থাকবে, সেটা লিখতে হবে। কল্পনা করো, আস্তে আস্তে ওদের গোঁফ গজাচ্ছে, চুল আরও বড় হচ্ছে, ওরা টিনএজ হচ্ছে। ভালো লাগবে তোমাদের? আমি লক্ষ করেছি, খ্যাতিমান কিশোর সাহিত্যিকেরা সবাই এই জিনিসটা এড়িয়ে যান। কিংবা বয়স একটা জায়গায় আটকে রাখেন। কারণ পাঠক চায় না বয়স বাড়ুক।

তিন গোয়েন্দা মূলত বাংলাদেশি কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা। কিন্তু এর প্রায় সব গল্পই সেই সুদূর আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রেক্ষাপটে কেন?

আমি যখন তিন গোয়েন্দা লেখা শুরু করি, তখন এটি লেখার মতো এমন আধুনিক, সমৃদ্ধ আর তথ্যবহুল পটভূমি বাংলাদেশে তৈরি করা সম্ভব ছিল না। এতে পুলিশকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, মানুষকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, তা আমাদের দেশে দেখানো সম্ভব ছিল না। এ দেশের প্রেক্ষাপট এমন স্বাধীনতা, সামাজিকতা, উদারতা গ্রহণ করত না। তাই মনে হলো আমেরিকার প্রেক্ষাপটেই লিখি। তাতে অনেক ধরনের গল্প বলতে পারব। তবে এখন যদি শুরু করতাম তাহলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই লিখতাম।

তিন গোয়েন্দার প্রথম দিককার অনেক বইয়ে আমরা দেখতাম কাহিনি শুরু হচ্ছে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড দিয়ে। রাশেদ পাশা বসে আছেন, তিন গোয়েন্দা ভীষণ ব্যস্ত, মেরি চাচি ওদের কাজ করতে চাপ দিচ্ছেন। পরবর্তী সময়ে তিন গোয়েন্দাকে কেন ও রকমভাবে পাইনি?

ও রকমভাবে না পাওয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে থ্রি ইনভেস্টিগেটরের বই ফুরিয়ে গেছে। তারপরেও আমি নিজে বানিয়ে লিখে অনেক দিন চালিয়েছি। তারপরে একটা সময় দেখলাম আমি নিজেই বিরক্ত হয়ে গেছি। ওই একই তো কাজ। কুকুরের চোখ টিপে ওখান দিয়ে কিংবা সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢোকা—একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল। এরা এত বুদ্ধিমান তিনটা ছেলে, এত স্মার্ট, বর্তমানের চেয়ে এগিয়ে থাকা, সব সময় কি একই কাজ করবে নাকি? যুগ পাল্টেছে। ওরা এখন নতুন ধরনের গাড়ি চালাবে, মোটরসাইকেল

প্রিয়

অভিনেতা
একেক সময় একেকজনকে ভালো লাগত। এখন এদের দেখলে মনে হয়, কী দেখে আমি এদের পছন্দ করতাম। সব ন্যাকা ন্যাকা। সেই অর্থে আমার কোনো প্রিয় অভিনেতা নাই।

পোশাক
নাই।

বেড়ানোর জায়গা
কৈশোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রবিনগর। এরপরে আর প্রিয় বেড়ানোর জায়গাও নাই।

খাবার
ছোটবেলা থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত প্রচুর রসগোল্লা খেতাম। এখন দেখি রসগোল্লাও ভালো লাগে না। অর্থাৎ আমার কোনো প্রিয় খাবারও নাই।

গান
সর্বপ্রথম রবীন্দ্রসংগীত। তারপরে ধ্রুপদী সংগীতের সুর। সেতার, সরোদ, তবলা, বাঁশি—এক কথায় সংগীত খুবই ভালো লাগে।

গায়ক
যারা গায়, তাদের সবার গানই ভালো লাগে। যারা বাজায়, তাদের সবার বাজনাই ভালো লাগে। সংগীত নিয়ে আমার মনে নেতিবাচক কিছু নাই।

রং
একেক জায়গায় একেক রং মানায়, দেখতে সুন্দর লাগে। সেটা ওখানেই সুন্দর। রং মানে প্রাকৃতিক রং, স্কুলের রং, পাখির রং—প্রকৃতির সব রং ভালো লাগে।

লেখক
বাংলায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংরেজিতে জেমস হ্যাডলি চেজ।

বই
দেয়ার অলওয়েজ আ প্রাইস ট্যাগ, ওজের জাদুকর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালাবে, প্লেন, জাহাজ, মহাকাশযান সবই চালাবে। নইলে এখনকার ইন্টারনেট যুগের পাঠকেরা পড়বে কেন? সব সময় আমি তিন গোয়েন্দায় বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করি। নেটে আমি নতুন পাঁচটা থ্রি ইনভেস্টিগেটরের বই পেয়েছি। জার্মান এক লেখক পাঁচ-ছয়টা থ্রি ইনভেস্টিগেটর লিখেছেন। সেগুলোর ইংরেজি অনুবাদ পড়তে গিয়ে দেখি তিন-চার চ্যাপ্টার পড়ার পরেই ঝিমুনি আসে। বুঝলাম, এসব আর চলবে না। কারণ, আমার যেটা ভালো লাগবে না, সেটা দিয়ে পাঠককে ভালো লাগাতে পারব না। তিন গোয়েন্দা যখন শুরু করেছিলাম, তখন বাঙালি পাঠকদের কাছে জাঙ্ক ইয়ার্ড বিষয়টা নতুন ছিল। এখন বরং জিনা আর রাফিয়ান বেশি জনপ্রিয়। মুরল্যান্ড, ঘাসের জমি, আউটিংয়ে বেরিয়ে যাওয়া, চাষির বাড়িতে ধোঁয়া ওঠা, কেক-বিস্কুট-রুটি কিনে এনে তাঁবুর ভেতরে বসে খাওয়া, রাতে চোর দেখে কুকুরটার ঘেউ ঘেউ করা, বুনো ফুলের সুবাস, প্যাঁচার ডাক, এগুলো পৃথিবী যত দিন টিকে থাকবে তত দিন থাকবে। কিন্তু স্যালভিজ ইয়ার্ড পুরোনো হয়ে যাবে।

তিন গোয়েন্দা, রকিব হাসান আর সেই নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা সেবা প্রকাশনীর বই—বাংলাদেশের অগণিত মানুষের কৈশোরের স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই তিনটি বিষয়। কিন্তু এখন সেবা প্রকাশনী ছাড়া অন্য অনেক স্থান থেকেই আপনার লেখা কিশোর-মুসা-রবিনের গল্প প্রকাশিত হয়। এই পরিবর্তনটা কেন?

আসলে আমি আর নিউজপ্রিন্টে থাকতে চাইনি। যখন লেখক হিসেবে আমার খ্যাতি এসে গেল, তখন আমি চারপাশে আরও প্রচুর লেখককে দেখলাম। হুমায়ূন আহমেদকে দেখলাম, জাফর ইকবালকে দেখলাম, আরও অনেক ভালো লেখককে দেখলাম—কেউই পেপারব্যাকের মধ্যে বসে থাকেন নাই। পেপারব্যাকের সৃষ্টি হয়েছে সস্তায় সবস্তরের পাঠকের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এটা কাজী আনোয়ার হোসেনের নিজস্ব আইডিয়া এবং এটা সফল হয়েছে। কিন্তু আমি তো প্রকাশক না, আমি একজন লেখক। আমার পেপারব্যাকে মন ভরছিল না। জানতাম, আমাকে হোয়াইট প্রিন্টে যেতে হলে পেপারব্যাকের তিন গোয়েন্দা ছেড়ে দিতে হবে। সেই সময়টায় তিন গোয়েন্দার জনপ্রিয়তা-বিক্রি-সবকিছু একেবারে তুঙ্গে, একদম সর্বোচ্চ শিখরে। পাত্তা দিলাম না। সিদ্ধান্ত নিলাম এটা ছেড়ে দেব, আর এটাই উপযুক্ত সময়। এখন যদি আমি এটা ছেড়ে না দিই, আর ছাড়তে পারব না। হোয়াইটপ্রিন্টে কিশোর-মুসা-রবিনের গল্প লিখলে প্রথম দিকে আমার কতগুলো অসুবিধা হবে, কিন্তু আমার যদি যোগ্যতা থাকে, তিন গোয়েন্দার জন্য যদি পাঠকের ভালোবাসা থাকে, দামটা আসলে বিষয় হবে না। পাঠকেরা সেটা মেনে নেবে। আর এখন তো দেখতে পাচ্ছি পেপারব্যাকের চেয়ে হোয়াইটপ্রিন্টই পাঠকেরা বেশি পছন্দ করছে।

আগের সেই তিন গোয়েন্দা কি কোথাও হারিয়ে গেছে? অনেকের মতে সেই স্বাদ, উদ্দীপনা এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

এগুলো তো শুধুই সাধারণ অনুবাদের কাজ না। একটা গল্প বলতে হবে, পাঠককে ধরে রাখতে হবে, ভালো লাগাতে হবে—অনেক ধরনের ব্যাপার আছে। একটা মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে। চার শর বেশি বই লিখে ফেলার পর একটা মগজে আর কত কুলায়? তবে আমি আমার সাধ্যমতো সৎ, বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করছি পাঠকের কাছে। আমি যতটা ভালো কিছু সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমার বইগুলো তো কম বিক্রি হচ্ছে না। এখনকার কিছু কিছু বই আগের লেখা বইয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে। আসলে সেই প্রথম বইটা থেকে শেষ বইটা পর্যন্ত কোনোটাই কম বিক্রি হচ্ছে না।

চরিত্রগুলো সবই কাল্পনিক। তবু বাস্তব জীবনে কাউকে দেখে কি মনে হয়েছে যে এ ঠিক কিশোরের মতো বুদ্ধিমান, মুসার মতো সাহসী কিংবা রবিনের মতো প্রতিভাবান?

নাহ্! মনে হয়নি।

বাস্তব জীবনে কোনো রহস্যের সমাধান করতে না পেরে কি কখনো মনে হয়েছে, ইশ্, এখন কিশোর পাশা থাকলে কী ভালোই না হতো!

না। আমি রহস্য নিয়েই মাথা ঘামাই না!

ব্যক্তিজীবনে আপনার সঙ্গে কার মিল আছে—কিশোর, মুসা নাকি রবিন?

কারও সঙ্গেই না।

একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলেন আপনি শুয়ে আছেন টেরর ক্যাসেলের কোনো কক্ষে। গা ছমছমে ভৌতিক একটা সুর বেজে আসছে অনেক দূর থেকে। কী করবেন?

হাসব, হাহা করে। বিষয়টা হবে পুরোই হাস্যকর, যেহেতু আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।

একদিন সকালে টেবিলে বসে তিন গোয়েন্দার গল্প লিখছেন, এ সময় কেউ কলবেল বাজাল। দরজা খুলে দেখলেন কিশোর, মুসা আর রবিন দাঁড়িয়ে, কী করবেন?

আমি ভূত, অবাস্তব বা অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি না। কাজেই ওরা কখনো দাঁড়াবে না। এরা আমার মগজের মধ্যে বসে আছে। আমি যদি বের করে দেই, তখন ঘুরে এসে বড়জোর একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে বলতে পারে, বের করলেন কেন? আবার লিখুন! (হাসি)

নানা রকম সিরিজ লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন। সেগুলো এখনো তুমুল জনপ্রিয়। নিজের লেখা কোন সিরিজটি আপনার সবচেয়ে প্রিয়?

যেটা সবচেয়ে প্রিয় সেটা চলে না। মানে তিন গোয়েন্দার চাইতে কম চলে। এডগার রাইস বারোজের *টারজান* সিরিজের বারোটা বই অনুবাদ করেছিলাম। এটাই আমার সবচেয়ে প্রিয় সিরিজ। জনাব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ টারজান সিরিজের সবগুলো বই বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশ করেছেন।

আপনি যখন লেখেন, তখন কি একটানা লেখেন? গল্পটা কি আগে পুরোটা ভেবে নেন?

একটানা লিখি না। আর গল্প আগে মাথায় নেওয়া যায় না। লিখতে থাকি, লিখতে লিখতে একটা গল্প দাঁড়িয়ে যায়। তা ছাড়া বিদেশি কাহিনি থেকে রূপান্তর করলে, সামনে একটা নমুনা থাকলে, কাজটা অনেক সহজ হয়।

আপনি দিনের কোন সময়টাতে লিখেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন সময়ে লেখার সময়টা বদলেছে। দীর্ঘকাল আমি লিখেছি রাত ১১টা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত। লেখা, পত্রিকার সম্পাদনা, বই পড়া—সব। তারপরে ঘুমিয়ে বেলা একটার সময় উঠেছি। এখন নিয়মিত সকালবেলা উঠি, উঠে কম্পিউটারের সামনে বসি। যা লেখা দুপুরের খাবারের আগেই, এ সময়ের মধ্যে না লিখতে পারলে নেই।

আপনি কি সবসময়ই কম্পিউটারে লেখেন?

হ্যাঁ, আমি কখনোই হাতে লিখিনি। জীবনের প্রথম বইটাও না। হাতে লিখলে আমার লেখা পড়া যায় না। ক্লাস এইটে পড়ার সময় একটা বই হাতে লিখেছিলাম। ওই যে, 'ডাকু মনসুর'! এরপরে যখন লিখতে গেলাম, তখন দেখলাম মুনীর কিবোর্ডে টাইপ করে বাংলা লেখা যায়। কাজী সাহেব আমাকে বুদ্ধি দিলেন, আপনি একটা পুরোনো টাইপরাইটার কিনে ফেলেন। তারপর টাইপরাইটার দিয়ে চলল, কম্পিউটার আসার পর কম্পিউটার কিনে ফেললাম। যখন অ্যাপল ম্যাকিনটশ ঢাকার বাজারে এল, ১৯৯০-৯২ সালের দিকে, তখন থেকেই।

এখন কোন ধরনের বই বেশি পড়েন?

আগে যা পড়তাম, তা-ই। গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার-ভূতের বই; শিশু-কিশোরদের বই-ই বেশি। রূপকথাও পড়ি।

প্রজাপতি প্রকাশনী থেকে ১৯৯৪ সালে বেরিয়েছিল আপনার লেখা আত্মজীবনী আমার কৈশোর। ভবিষ্যতে কি আরও আত্মজীবনী লেখার ইচ্ছে আছে?

না। কৈশোরে যেসব ঘটনা ঘটিয়েছি, সেগুলো ছোটবেলার ঘটনা। এখন লিখলে হবে বড়দের ঘটনা। ছোটরা পড়বে কেন? তিন গোয়েন্দার পাঠকেরাই বা পড়বে কেন? আসলে আমি বড়দের জন্য আত্মজীবনী লিখতে চাই না।

আপনি তো প্রচারবিমুখ। সত্যি বলতে অনেক পাঠকই আপনাকে সামনাসামনি দেখতে পেলে হয়তো চিনতে পারবে না, কিন্তু নাম শোনামাত্রই চিনতে পারবে। এই প্রচারবিমুখতার কারণ কী?

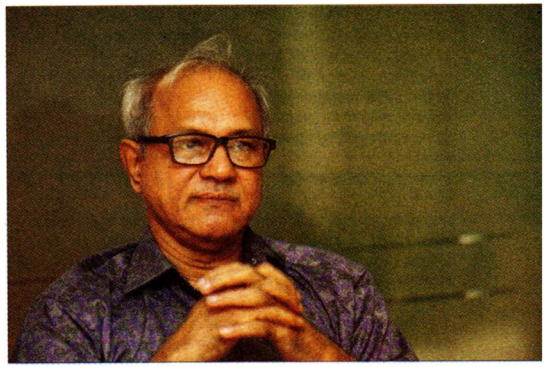

রকিব হাসান লেখালেখি শুরু করেছিলেন টাইপরাইটারে

জেমস হ্যাডলি চেজ নামে একজন থ্রিলার লেখক ছিলেন। তিনি প্রচারবিমুখ মানুষ। তাঁর নামটাও ছদ্মনাম। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'তুমি ছদ্মনামে লেখো কেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমার নাম যা-ই হোক, পাঠক তো আমাকে চিনবে আমার লেখা দেখে।' আমি হঠাৎ করে জনপ্রিয় হয়ে যাওয়ার পর মাঝেমাঝে বাংলা একাডেমির বইমেলায় যেতাম। বাচ্চারা ঘিরে ধরত, অটোগ্রাফ নিত, নানা প্রশ্ন করত। ভালোই লাগত। হঠাৎ একসময় দেখলাম এই জিনিসটা আমার জন্য সমস্যা হয়ে যাবে। খ্যাতির বিড়ম্বনা। আমি খুবই সাধারণভাবে চলাফেরা করি; এক জোড়া স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে একটা ছাতা নিয়ে বৃষ্টির দিন হয়তো বেরিয়ে পড়লাম, বাসায় ফিরতে হয়তো রিকশায় বা পুরোনো একটা ভাঙা বাসে উঠে পড়লাম, কেউ আমাকে চিনল না। বাজারে গেলাম, কেউ আমাকে চিনল না। 'হাই রকিব আংকেল' বা 'রকিব ভাইয়া' বলল না। রাস্তায় কেউ বলুক, সেটা চাইও না। আমি সাধারণ মানুষ হিসেবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে থাকতে চাই। তাই আমি ছবি দিতে চাই না। টেলিভিশন বা পত্রিকায় সাক্ষাৎকার বা টক শোতে ডাকা হয়, আমি যাই না। এখন এই প্রচারবিমুখতা আমার ভালোই লাগে। সবচেয়ে ভালো লাগে যখন দেখি উইকিপিডিয়ায় তিন গোয়েন্দা বা রকিব হাসান সম্পর্কে প্রচুর তথ্য আছে, কিন্তু পাশের ছবির বাক্সটার মধ্যে লেখা আছে 'কামিং সুন'! (হাসি) এখন অবশ্য একটা পুরোনো ছবি দেওয়া হয়েছে। দু-তিনটা পুরোনো ছবি প্রকাশিত হয়েছে, সব জায়গায় ওগুলোই ঘুরেফিরে ছাপা হয়। পুরোপুরি জেমস হ্যাডলি চেজ আর হতে পারলাম না! পারতাম, যদি বাচ্চাদের লেখক না হতাম।

সম্প্রতি তিন গোয়েন্দার ওপরে একটি টিভি সিরিজ করা হয়েছে। ওগুলো কি আপনি দেখেন?

না, দেখি না। তিন গোয়েন্দার নাটক বানাতে দিতে আমি মোটেও আগ্রহী ছিলাম না, এখনো আগ্রহী না। আমি জানতাম, তাতে কিশোর-মুসা-রবিনের আসল চেহারাগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে না। যারা তিন গোয়েন্দার ভক্ত, তাদের ভালো লাগবে না। কিন্তু পরিচালক খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে 'আমি এমন একটা জিনিস বানাব রকিব ভাই, আপনার ভীষণ পছন্দ হবে।' আমি বলেছি, 'আমার যদি চল্লিশ ভাগও পছন্দ হয়, তাহলে আমি আপনাকে থ্যাংকস জানাব।' টিভিতে তিনটা পর্ব দেখার পরে তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এটা কী হলো?' তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'এটা তো অত্যন্ত জনপ্রিয় হচ্ছে। প্রশংসা জানিয়ে অনেক চিঠি আসে।' অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। আমার তিন গোয়েন্দার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাটক দেখে আমি পাথর না, জমে বরফ হয়ে গিয়েছিলাম। এরপরে আমি আর যোগাযোগ করিনি তাঁর সঙ্গে। কোনো পর্বও দেখিনি।

বিদেশি টেলিভিশনগুলোতে ছোটদের নিয়ে বেশ সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম হয়। এখানে বাজেট হয়তো বা...

বাজেট নেই, তা আমি বলব না। আসলে ভালো প্রোগ্রামের জন্য প্রথমেই দরকার মেধা। শুধু টাকা ঢাললেই হয় না। আর ছোটদের জিনিস বানানো অনেক কঠিন কাজ। আমাদের দেশে অনেকেই 'আমি এই করব, ওই করব' বলতে পারে, পরে দেখা যায় অশ্বডিম্ব প্রসব করল। এদের দিয়ে আর যা-ই হোক, বাচ্চাদের জিনিস হবে না। বাজেট দিলেও না।

আপনি কি কখনো লস অ্যাঞ্জেলেস গিয়েছেন? বা যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে কখনো?

না। তাতে আমার স্বপ্নভঙ্গ হবে। আমি কল্পনার জগতেই থাকতে ভালোবাসি। যেটা আমার কল্পনায় ভালো লাগে, সেই জায়গায় আমি কক্ষনো যাই না। কেউ যদি আমাকে নিয়েও যেতে চায়, তাহলেও যাব না।

মুসার যেমন মুদ্রাদোষ আছে 'খাইছে' বলার, তেমনি আপনারও কি কোনো মুদ্রাদোষ আছে?

আসলে 'খাইছে' শব্দটা আমি একসময় নিজের অজান্তেই বলে ফেলতাম। মনে হলো শব্দটা ঢুকিয়ে দিই। আমার কাছ থেকে মুদ্রাদোষটা সংক্রমিত হয়েছে মুসার মাঝে। যদিও আমি নিজে এখন আর 'খাইছে' বলি না।

ছোটবেলায় তিন গোয়েন্দা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। কারণ, আব্বু-আম্মু দেখলেই রাগ করত, বকা দিত। অথচ বিপদে পড়লে কীভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ধার পাওয়া যায়, কীভাবে বিপদে মাথা ঠান্ডা রেখে ভাবতে হয়—এমন অসংখ্য জিনিস তিন গোয়েন্দা পড়ে শিখেছি। যে অভিভাবকেরা আমাদের তিন গোয়েন্দা পড়তে দেন না, তাঁদের উদ্দেশে আপনার কী বলার আছে?

আমাদের সময় 'আউটবই' বলে একটা শব্দ ছিল। বাবা-মা মনে করতেন পাঠ্যবইয়ের বাইরের বই আউটবই। আমার মনে হয়, বই না পড়াটাই মূর্খতা। আর বই পড়লে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়, কথাটা মোটেও ঠিক নয়। বরং বই মগজকে শাণিত করে। বুদ্ধি বাড়ায়। মানুষের উদারতা বাড়ায়। ভালোমন্দ বুঝতে শেখায়। খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। বইয়ের চেয়ে ভালো আর উপকারী বন্ধু আমি তো অন্তত দেখি না।

যারা লেখালেখি করতে চায়, তাদের উদ্দেশে আপনার পরামর্শ কী?

প্রথমত প্রচুর বই পড়তে হবে। দ্বিতীয়ত লেখাটাকে কোনো অবস্থাতেই সহজ-সরল একটা বিষয় মনে করা চলবে না। এখানে বিন্দুমাত্র অবিশ্বস্ততা ও ফাঁকি দেওয়া চলবে না। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটা বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে, যদি সফলতা পেতে চাও। সোজা কথা ধৈর্য, অধ্যবসায়, বিশ্বস্ততা এগুলো থাকতে হবে। সেই সঙ্গে পড়তে হবে অনবরত।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

তোমাদেরও অনেক ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার দলের পাঁচজন ছাড়াও আরও যাদের প্রশ্ন নির্বাচিত হয়েছে—আফসানা চৌধুরী, ফারিহা রাইসা, হাসানুল ফেরদৌস, মীর মাইনুল ইসলাম, মুহসী রহমান, নাফিসা মালিয়াত, এস কে শাহরিয়ার, শাফায়াতুল ইসলাম ও উম্মে হানি।

AMARBOI.COM

কিআর সাক্ষাৎকার দল শিগগিরই যাবে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ **ড. মুহম্মদ ইউনূস**, জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী **রুনা লায়লা**, ব্যান্ড তারকা **আইয়ুব বাচ্চু**, ফ্যাশন ডিজাইনার **বিবি রাসেল**, মনোবিদ **ড. মেহতাব খানম**, ছড়াকার **লুৎফর রহমান রিটন**, চলচ্চিত্র পরিচালক **মোস্তফা সরয়ার ফারুকী**, এভারেস্ট বিজয়ী **ওয়াসফিয়া নাজরীন**, গলফার **সিদ্দিকুর রহমান** ও বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক (টেস্ট) **মুশফিকুর রহিম**-এর কাছে। সেই দলগুলোর একজন হতে চাইলে তুমি যাকে বা যাদের প্রশ্ন করতে চাও, আলাদা কাগজে তাঁর বা তাঁদের জন্য কমপক্ষে ১০টি করে প্রশ্ন লিখে ফেলো। তুমি কেন ওই তারকার সাক্ষাৎকার নিতে চাও, সর্বোচ্চ ২০০ শব্দের মধ্যে লিখো সেটিও। আর লিখো তোমার পুরো নাম, ঠিকানা, যোগাযোগের নম্বর, বয়স, শ্রেণি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম ও আগ্রহের বিষয়। তারপর খামের ওপর 'সাক্ষাৎকার' লিখে কিআর ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

ঘোষণা

কেন পড়ি কিআ?

মানুষ তো কত কিছুই পড়ে বা পরে। এই যেমন, বাবা চশমা পরেন। মা শাড়ি পরেন। অনেকে আছাড় খেয়েও পড়ে। কেউবা খাট থেকে পড়ে যায়। আবার এবার গরমটাও পড়েছে বেজায়। শ্রাবণের বৃষ্টিও পড়েছে ঢের। এসব পড়া-পরির ভীড়ে তুমি এখন সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কিআ পড়ছ সেটি কিন্তু নিশ্চিত। তাও আবার এই মুহূর্তে ঠিক এই লেখাটিই পড়ছ। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন তুমি কিআ পড়ো? কিংবা কিআ কি তোমার জীবনকে পাল্টে দিয়েছে? যদি দেয়, তাহলে কীভাবে? আসছে অক্টোবরে কিআ পা দিচ্ছে দুবছরে। শুভ জন্মদিন সংখ্যায় তোমাদের কাছ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর চাইছি আমরা। তাই দেরি না করে এক্ষুণি কাগজ কলম নিয়ে বসে যাও। আর লিখে পাঠাও 'কেন পড়ি কিআ এবং...' শিরোনামের লেখা। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের ঠিকানায়। ভালো কথা, খামের ওপর অবশ্যই 'কেন পড়ি কিআ এবং...' লিখতে হবে।

সেরা ১০ লেখককে দেওয়া হবে বিশেষ পুরস্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

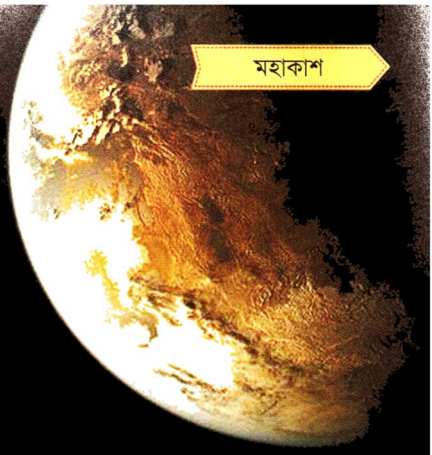

দ্বিতীয় পৃথিবীটি কি আমাদের 'সেকেন্ড হোম' হতে পারে?

আব্দুল কাইয়ুম

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, নাসা (ন্যাশনাল অ্যারনটিকস অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) ২৪ জুলাই এক সুসংবাদ দিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়। ওরা মহাকাশে পৃথিবীর মতোই এক গ্রহ আবিষ্কার করেছে, যেখানে কোনো প্রাণীর বাঁচার মতো পরিবেশ থাকতে পারে। বলা হচ্ছে, এটি দ্বিতীয় পৃথিবী! গ্রহটির নাম দেওয়া হয়েছে কেপলার ৪৫২বি। এটি আমাদের সূর্যের মতোই একটি নক্ষত্রের চারপাশে প্রায় সমান দূরে থেকে প্রদক্ষিণ করছে। এর আয়তন পৃথিবীর চেয়ে মাত্র ৬০ শতাংশ বেশি এবং সেখানে ৩৮৫ দিনে বছর, আমাদের চেয়ে মাত্র ২০ দিন বেশি। এত মিল আছে বলেই বিজ্ঞানীরা ভাবছেন সেখানে একদিন মানুষ গেলে হয়তো বেঁচে থাকতে পারবে।

আমাদের সৌরজগতের বাইরে পৃথিবীর সঙ্গে মিল আছে এমন অন্তত হাজার খানেক গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের মধ্যে সদ্য আবিষ্কৃত গ্রহটিতে প্রাণের টিকে থাকার অনুকূল পরিবেশ সবচেয়ে ভালো। সেখানে পৃথিবীর মতো পাহাড় ও জলবায়ু রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পানি থাকার সম্ভাবনার কথাও বিজ্ঞানীরা বলছেন। এ জন্যই সারা পৃথিবীতে এ গ্রহ নিয়ে এত হইচই পড়ে গেছে।

তাহলে কি একদিন সেই পৃথিবীটি আমাদের 'সেকেন্ড হোম' অর্থাৎ দ্বিতীয় আবাসভূমি হতে পারে? পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এখানে যদি আমরা টিকে থাকতে না পারি, তাহলে আমরা কি ওই গ্রহে গিয়ে থাকতে পারব?

এখানেই সমস্যা। গ্রহটি ১৪ শ আলোকবর্ষ দূরে। আলোর গতি সেকেন্ডে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল। এ বেগে আলো এক বছরে যত দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে বলে 'এক আলোকবর্ষ' দূরত্ব। সেকেন্ডে ১০ মাইল গতিতে কোনো নভোযান বা রকেটে ঢাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে লাগবে ১৫ মিনিট। প্লুটোতে পৌঁছাতে এ গতিসম্পন্ন একটি নভোযানের লেগেছে ১০ বছর। আর আমাদের সেকেন্ড হোম, কেপলার ৪৫২বি-তে যেতে লাগবে অন্তত ২ কোটি ৬০ লাখ বছর। তারপরও সেখানে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। ১৫০ ছেলে-মেয়ের একটি দল রকেটে আজ রওনা দিলে তাদের নাতি-পুতি-নাতি-পুতি...এবং তাদের নাতি-পুতি কোনো একদিন হয়তো সেখানে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু দলের সদস্য ১৫০ জন কেন? কারণ, অতীতে যখন মানুষ ছোট ছোট ক্ল্যানে বা দলে বিভক্ত ছিল, তখন দেখা গেছে ১৫০ জন সদস্যের একটি ক্ল্যান অনায়াসে সব বাধাবিপত্তি কাটিয়ে টিকে থাকতে পারত। সে জন্যই আধুনিক ব্যবস্থাপনায় বলা হয়, কোনো অসাধ্য সাধনে ১৫০ জনের দল লাগে।

এটা ঠিক যে আজ যে পৃথিবীর মতো গ্রহটি নাসার বিজ্ঞানীরা দেখছেন, সেটি তো আসলে গ্রহটির ১৪ শ বছর আগের চেহারা। কারণ, সেখান থেকে যে আলোকরশ্মি রওনা দিয়েছিল ১৪ শ বছর আগে, সেটিই আজ যখন নাসার বিজ্ঞানীদের কেপলার টেলিস্কোপে পৌঁছাল, তখনই তো বিজ্ঞানীরা তাকে দেখলেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে এত সময় পর সেই গ্রহটি টিকে আছে কি? আর থাকলে, তার পরিবেশ কি অবিকল সে রকমই আছে? এর মধ্যেই গ্রহটি ভেঙেচুরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে কি না? এর উত্তরে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাজাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্তন ঘটতে সময় লেগে যায় শত শত বা হাজার হাজার কোটি বছর। তাই মহাজাগতিক হিসাবের ক্ষেত্রে ২ কোটি ৬০ লাখ বছর আমাদের পৃথিবীর সময়ের পরিমাপে এক-দেড় সেকেন্ডের মতো। এই সামান্য সময়ে কী-ই বা আর পরিবর্তন ঘটবে!

এখন দেখতে হবে কেপলার ৪৫২বি-এর পরিবেশ ও জলবায়ু কতটা অনুকূল। সেখানে গাছপালা-বাতাস-সমুদ্র-নদী আছে কিনা। যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তাহলে হয়তো কয়েক হাজার কোটি বছর পর আমরা পৃথিবীর এই যমজ ভাই বা বোনের আঙিনায় পা রাখতে পারব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা সবাই রাজা

মজার স্মৃতি

গত বছরের কথা। ক্যাডেট কোচিংয়ে সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতা দিয়েছে। দেখা গেল সবার খাতাতেই নম্বরের গডগোল হয়েছে। ক্লাস নিচ্ছিলেন তখন মোমিন স্যার। কিন্তু স্যারের পড়ানোয় মনোযোগ না দিয়ে আমরা সবাই এমনভাবে নম্বর বাড়ানোর জন্য চিল্লাচিল্লি করছিলাম যে স্যার রেগে আগুন হয়ে গেলেন! দিলেন সবাইকে বকা। এমনই বকা যে সেটা সহ্য করতে না পেরে আমরাও স্যারের ওপর রেগে গেলাম। বন্ধুরা সবাই মিলে বুদ্ধি করলাম ছুটির পরে স্যারের স্যান্ডেলটা সরাব। অফিস রুমে সব টিচার স্যান্ডেল খুলে ঢোকেন। কথামতো আমি, তুলনা আর হোমায়রা মিলে গিয়ে স্যারের স্যান্ডেলটায় একটা কিক দিলাম। সেটা সোজা গিয়ে পড়ল একটা ড্রেনের মধ্য। মনের জ্বালা মিটিয়ে আমরা সবাই খুশিমনে বাড়ি চলে এলাম।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরে স্যারকে ফোন করে ক্ষমা চাইলাম। খুলে বললাম ওনাকে সব কথা। কিন্তু উনি বললেন, 'তোমরা তো আমার স্যান্ডেলটা সরাওনি। দুর্ভাগ্যবশত তোমরা হয়তো অন্য কারও স্যান্ডেল সরিয়েছ। কিন্তু আমারটা না।' তখন আর কী করব? খুব রাগ হলো আমাদের। মাঝখান থেকে শুধু শুধু নিজেদেরই অপমান! কিন্তু এখনো খুব খারাপ লাগে, আমাদের জন্য হয়তো কারও প্রিয় স্যান্ডেলটা হারিয়ে গেছে।

সামিহা তাসনীম
সপ্তম শ্রেণি, পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, পাবনা।

AMARBOI.COM

সুখী মানুষদের ছাদ!

এদিক সেদিক

আমাদের বাসার ছাদটা বেশ বড় কিন্তু গোছানো না। বাতাস ছাড়া উপভোগ করার মতো কিছুই নেই। ঠিক ডান পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদটা দেখে মনে হয়, ওটার ওপর দিয়ে আইলা কিংবা বিলকিস-জাতীয় কোনো ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে ওই ছাদে আর কেউ ওঠে না। ওই বিল্ডিংয়ের ডান পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদটা বেশ পরিপাটি। গাছ দিয়ে সাজানো আর ঝকঝকে মেঝে। বিকেলবেলা বাচ্চারা খেলাধুলা করে। আর তাদের মায়েরা একে অন্যের সঙ্গে গল্প করে। ঝুম বৃষ্টি নামলে উত্তর দিকের বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টির কণাগুলো সেফটিক ট্যাংকের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে নিচে আছড়ে পড়ে। শীতের রাতে মাঝে মাঝে দেখা যায় বারবিকিউ উৎসব।

আমাদের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে সবই দেখা যায়। মনে হয়, ওটা সুখী মানুষদের ছাদ!

হাসান আল ফেরদৌস
দ্বাদশ শ্রেণি, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, ঢাকা।

উপলব্ধি

ক্ষমা করে দিয়ো

তুলি আমার খুব প্রিয় বান্ধবী। ও এখন ক্লাস এইটে পড়লেও আমি পড়ি টেনে। যখন আমি ক্লাস এইটে ছিলাম, তখন ও আমাকে একটা ডায়েরি জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল। কী যে খুশি হয়েছিলাম! এই ডায়েরিতে আমি কবিতা লিখতাম। কিন্তু একদিন আমার বড় আপুর সঙ্গে ডায়েরি নিয়ে খুব ঝগড়া হলো। তখন রেগে গিয়ে ডায়েরিটা ঘরের মাঝখানে পুড়িয়ে ফেললাম। রাগ কমার পর খুব দুঃখ পেলাম। কিন্তু ওই ডায়েরির একটা পুড়ে যাওয়া টুকরা আমার কাছে এখনো আছে, যেখানে তুলির লেখা একটি কবিতা রয়েছে। এখনো আফসোস করি, কেন যে ওই দিন রেগে গিয়েছিলাম। তাই তুলির মতো ভালো বন্ধুর দেওয়া আদরের, ভালোবাসার স্মৃতিটা হারিয়ে ফেললাম। সরি তুলি! আমি আর কখনো রাগ করে কিছু নষ্ট করব না।

আইভি নিজাম
দশম শ্রেণি, কলমেশ্বর রোকেয়া সরণি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বোর্ডবাজার, গাজীপুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলংকরণ : **শিখা**

যন্ত্র পরীক্ষা

আমার কোনো দোষই ছিল না। আগেই স্বরূপকে বলেছিলাম, যন্ত্রটা কাজ করবে। ও-ই তো বিশ্বাস করল না! বরং উল্টোপাল্টা কত কিছুই না বলল। এরপরেই তো আমি আমার তৈরি 'দেশবিহার' যন্ত্রটা চালিয়ে ওকে দেখালাম। ও যদি বিশ্বাস করত, তাহলে তো আগে নিজে নিজে একটু 'এক্সপেরিমেন্ট' করে নিতাম।

'দেশবিহার' যন্ত্র দিয়ে অনায়াসেই তুমি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারবে। এমনকি এক দেশ থেকে অন্য দেশেও! ঠিক যেন গুপী গাইন আর বাঘা বাইনের একসঙ্গে হাততালি দেওয়ার মতো ঘটনা! তবে অন্য গ্রহে যেতে পারবে না, এটার সিগন্যালটা একটু দুর্বল কিনা!

বেশ কিছুদিন ধরেই এ যন্ত্রটির পেছনে লেগে ছিলাম। উফ! কম যন্ত্রণা হয়েছে এর জন্য? স্কুল মিস, হোমওয়ার্ক করিনি (তার জন্য অবশ্য অঙ্ক পরীক্ষায় গোল্লাও পেয়েছি), রাত জেগে কাজ করায় বাবার কানমলা, মায়ের বকাঝকা...তবুও কাজ করে গেছি। তবেই না এই আবিষ্কারটা সম্ভব হলো।

এই মহা আবিষ্কারের কথাটা প্রথমে কাউকেই বলিনি। স্বরূপকেই প্রথম বললাম। ও আমার খুব ভালো বন্ধু। গ্রামে থাকে। ছুটিতে গ্রামে গেলে ওর সঙ্গেই আমার দিন কাটে। এবার ঈদে গ্রামে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা হলে বিশ্বাস করে ওকেই প্রথম জানালাম যন্ত্রটার কথা। ওমা! ও কিছুতেই বিশ্বাস করে না! বলে নিজের চোখে দেখবে। তো দেখুক! আমি নিজেও আগে এটার পরীক্ষা করিনি। ভাবলাম দুজন মিলেই করব।

দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আস্তে করে বেরোলাম। ও আগেই এসে গেল। যন্ত্রটাকে নিয়ে দুজনে মিলে পুকুরপাড়ে গেলাম। চারদিকে মাঝ দুপুরের সুনসান নীরবতা।

AMARBOI.COM

গল্প

আমি যন্ত্র ঠিকঠাক করে নিয়ে স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বল, এখন, কোথায় যেতে চাস?'

'তোর যন্ত্র আদৌ কাজ করলে তবে তো!'

আমি বেশ রেগে গেলাম। 'অবশ্যই কাজ করবে। আমি নিজের হাতে কচি বাঁশের সঙ্গে চুম্বক বেঁধে তার ওপরে শক্তিশালী মোটর লাগিয়ে এটা বানিয়েছি। এ ছাড়া আরও অনেক কিছুই আছে। তবে সব ফর্মুলা তো আর তোকে বলব না?'

আমার কথাগুলো ও কানেই নিল না। বলল, 'আমার বয়ে গেছে তোর ওই ফালতু যন্ত্রের ফর্মুলা নিতে! আমি নিশ্চিত এটা কাজ করবে না। তবুও তুই এত করে বললি, তাই দেখতে এলাম কেমন কাজ করে।' বলেই বিশ্রী করে হাসল।

আমি অনেক কষ্টে রাগ চেপে যন্ত্রের ওপরের চেয়ারটা দেখিয়ে বললাম, 'ওইখানটায় বোস। আর বল কোথায় যাবি।' ও মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। রাঙাপুরে মেলা হচ্ছে, পারিস তো ওখানেই পাঠা।'

আমি কাগজে রাঙাপুরের মেলা লিখে যন্ত্রের মধ্যে ফেললাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'রেডি তো?'

স্বরূপ একটু চিন্তিত স্বরে বলল, 'হুম, রেডি।'

আমি যন্ত্রটা চালিয়ে দিলাম। কিন্তু তারপরে যা হলো, তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না!

হিসাবমতে, চেয়ারসুদ্ধ বাঁশটা দুই পাক ঘুরেই স্বরূপের চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা তো হলোই না, কীভাবে যেন বাঁশটাই গেল উল্টে! আর স্বরূপ উড়ে গিয়ে ঝপাৎ শব্দ করে পড়ল গিয়ে ঠিক পুকুরের মাঝখানে। আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম! এখন কী করব আমি!

সমস্যা হলো না, স্বরূপ বেশ ভালোই সাঁতার জানে। ও ভেসে উঠেই সাঁতরে পাড়ে চলে আসতে লাগল। ও সাঁতার জানে বোঝার পরেই আমি আর অপেক্ষা করিনি। যন্ত্রটন্ত্র রেখে দৌড়ে বাড়ি ফিরে এলাম...।

পুরো ঘটনাটা তো শুনলে, এখন তোমরাই বিবেচনা করে বলো, আমার কি আদৌ কোনো দোষ ছিল?

অংকন ঘোষ দস্তিদার
দ্বাদশ শ্রেণি, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবণ এল

আষাঢ় শেষে ঘন বাদল
শ্রাবণ এল রে।
কালো মেঘে আকাশটা ওই
ঢেকে গেল রে।
এই শ্রাবণে পানি এল
মাঠও ডোবে রে।
তাই বলে কি আমি আবার
বের হব না রে?
এই শ্রাবণে আবার আমার
শুভ জন্মদিন।
গিফট যদি দাও তোমরা সবাই
নাচব তা ধিন ধিন

মো. মমিনুর রহমান
অষ্টম শ্রেণি, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

বৃষ্টি

মেঘ জমছে আকাশ এখন কালো,
এদিক ওদিক একটু একটু আলো।
ঝর ঝরিয়ে এল হঠাৎ বৃষ্টি,
দেখছি আমি, লাগছে বড় ভালো।

বৃষ্টি এল নূপুর পায়ে
পাতায় পাতায় নাচতে,
পাখিরা সব ফিরল নীড়ে
বৃষ্টি থেকে বাঁচতে।

শ্রেয়া তাসনিয়া
চতুর্থ শ্রেণি
ধানমন্ডি কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা।

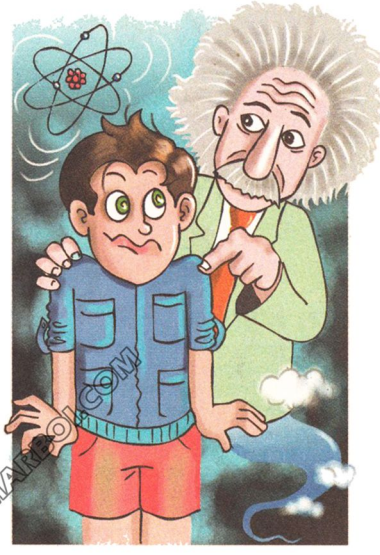

সাগর

ঐ যে দূরে সাগরজুড়ে
জোয়ার, ভাটার ঢেউ।
থাকে সেথায় ঝিনুক, শামুক,
তা কি জানে কেউ?
ওই দেখা যায় সূর্যডুবি
ছোট্ট খুকি দেখছে
বাংলাদেশের সাগরপারে
স্বপ্ন বুনে রাখছে।

নাজমুস সাকিব
শিবচর নন্দকুমার মডেল ইনস্টিটিউশন, মাদারীপুর।

আইনস্টাইনের ভূত

কাল রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম ভালো মানুষ আমি,
হুট করে এক আওয়াজ শুনে খাটের থেকে নামি।
এধার দেখি, ওধার দেখি, দেখি খাটের নিচে,
ওমা এ যে আইনস্টাইন দাঁড়িয়ে আমার পিছে।
চোখ পিট পিট করি আমি, চিমটি কাটি গায়ে,
আইনস্টাইন ঠায় দাঁড়িয়ে অটল দুটি পায়ে।
তৃষ্ণা ভীষণ, বলল, 'আনো ঠান্ডা পেপসি কোলা',
'পেপসি তো নেই' শুনেই আমায় কানমলা।
সারাটা রাত তত্ত্ব নিয়ে চলল যে পাঠদান,
গোঁফ নাচিয়ে বলল এবার 'science is not fun!'
ঘুম ভাঙল উঠে দেখি পড়ে আছি bed-এ,
বাজ একটা পড়ল ভীষণ তখন আমার head-এ।
স্বপ্ন নাকি সত্যি এটা, মনে বেজায় খুঁত,
আইনস্টাইন এসেছিল? নাকি সে তার ভূত?

রেহনুমা কাদীর
মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজার স্মৃতি

বৃষ্টি পড়ে...

একদিন ইংরেজি স্যার ক্লাসে ঢুকে আমাদের পড়া ধরছিলেন। হঠাৎ স্যারের চোখ যায় শেষ বেঞ্চে বসে থাকা এক শিক্ষার্থীর কাছে। তাকে স্যার পড়া ধরলেন—

স্যার : এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। এটার ইংরেজি করো।

শিক্ষার্থী : Since Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thusday, Friday it is raining.

শৈবাল দাশ গুপ্ত
ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুল, ঢাকা।

স্কুলের অভিজ্ঞতা

লাল গুড়া

প্রতিবছরই আমাদের স্কুলে প্রশিক্ষণ নিতে 'টিচার্স ট্রেনিং কলেজ' থেকে শিক্ষকেরা আসেন। একবার একজন শিক্ষক আমাদের বাংলা ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা সবাই 'লাল গুড়া' পড়ো। আমরা কেউ বুঝতে পারছিলাম না দেখে তিনি আবারও বললেন, তোমরা পৃষ্ঠা ৭-এ গিয়ে 'লাল গুড়া' পড়ো। পরে আমরা বুঝতে পারলাম তিনি আমাদের 'লাল ঘোড়া' পড়তে বলছিলেন।

আমরিন ইসলাম
নবম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল।

AMARBOI.COM

আজব ঘটনা

কঙ্কালের হাতে খুন

মানুষের হাতে খুন হয় এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কঙ্কালের হাতে জীবন্ত মানুষ খুন হয়েছে, এমন ঘটনা কেউ কখনো শোনেনি। এমন একটি সত্য ঘটনা ঘটেছিল পর্তুগালে।

পর্তুগালের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পিটার পিউমেটেইন নিহত হয়েছিলেন কঙ্কালের হাতে, ১৯৬২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। ঘটনার সময় তিনি নিজের ঘরে বসে ছবি আঁকছিলেন। এই সময় তাঁর ঘরে থাকা কঙ্কালটি নড়ে ওঠে। আর দড়ি ছিঁড়ে পড়বি তো পড় একেবারে তাঁর গায়ের ওপর। এতে তিনি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।

তবে আসল ঘটনা ছিল অন্য রকম, ভূমিকম্পের ফলে কঙ্কালটি নড়ে ওঠে। পুরোনো দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকায় দড়িটি ছিঁড়ে যায়। এবং কঙ্কালটি তাঁর শরীরে এসে পড়ায় তিনি ভয় পান আর সেখানেই মারা যান।

ইমতিয়াজ আহমেদ
নবম শ্রেণি, ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুল, ঢাকা।

মজার তথ্য

শার্লক হোমসের মজার তথ্য

১. শার্লক হোমস জানে না যে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। এমনকি জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে তাঁর জ্ঞান একেবারেই শূন্য।

২. এ বিশ্বে এ পর্যন্ত ৯০০-এরও বেশি শার্লকিয়ান সোসাইটি আছে।

৩. শার্লক হোমস তাঁর জীবনে একটি মাত্র কেসের সঠিক সমাধান করতে পারেননি।

৪. শার্লক হোমসের ব্যবহৃত বেশির ভাগ টেকনিক ছিল অজানা ও অপ্রচলিত। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস, রক্তের দাগের সময়কাল নির্ণয় এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ফায়ারিং ডিসট্যান্স নির্ণয়প্রক্রিয়া তাঁরই আবিষ্কার।

৫. শার্লকের বড় ভাই মাইক্রফটকে মাত্র দুটি গল্পে দেখা গেছে।

৬. শার্লকের বিখ্যাত লাইন 'এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন, আসলে বিকৃত। ওটা হবে। ওয়াটসন; এক্সিলেন্ট, শার্লক : এলিমেন্টারি।

৭. শার্লক হোমসকে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল 'ফাইনাল প্রবলেম' গল্পে হত্যা করেছিলেন। পরে অবশ্য পাঠকের চাপে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়।

৮. গল্প ও উপন্যাস থেকে বোঝা যায় শার্লক হোমস বেশ শক্তিশালী।

৯. শার্লক হোমসের আইকিউ ছিল ১৫০ থেকে ১৯০-এর মধ্যে।

১০. শার্লক হোমস গল্পানুযায়ী, তিনি কখনোই হরিণশিকারি টুপি পরতেন না, যেমনটা দেখা যায় 'শার্লক' সিরিজে।

সাজিদ করিম
অষ্টম শ্রেণি
গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

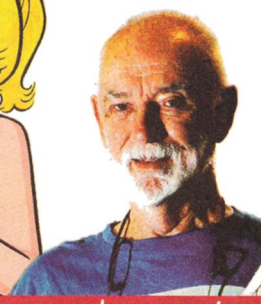

আর্চি-ভেরোনিকা-বেটি আছে টম নেই

মারা গেছেন আর্চির আঁকিয়ে টম মুর। খবরটা শুনতেই যেন পিছিয়ে গেলাম এক যুগ। আর্চি, বেটি, ভেরোনিকা, জাগহেড, রেজি—এ নামগুলো তো একসময় প্রিয় বন্ধুর মতোই ছিল। নব্বইয়ের দশকে যাঁদের স্কুলজীবন কেটেছে, আর্চিকে তো তাঁরা চিনবেই। সেই আর্চির কার্টুনিস্ট আর নেই। ২০ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে মারা যান টম মুর। জীবনের শুরুতে ইউএস নেভিতে চাকরি করতেন টম মুর। কোরিয়া যুদ্ধের সময় একদিন তাঁদের ক্যাপ্টেনের একটা ক্যারিকেচার আঁকেন। তলব পড়ে ক্যাপ্টেনের ঘরে। বেশ প্রশংসাও পান। যুদ্ধ শেষে ১৯৫৩ সালে আর্চি কমিকসে যোগ দেন তিনি। এরপর আশির দশকের শেষ পর্যন্ত এঁকে গেছেন আর্চি কমিকস।

স্পাইডারম্যান কিংবা সুপারম্যানের মতো কোনো শক্তি নেই আর্চির। চাচা চৌধুরীর মতো কম্পিউটারের চেয়ে প্রখর মস্তিষ্কও নেই। টিনটিনের মতো দারুণ সব রোমাঞ্চকর অভিযানে বেরোয় না সে। তবু আর্চি অ্যান্ড্রুজকে ভালোবাসে সব্বাই।

সাদামাটা দেখতে লাল চুলের এক কিশোর। রিভারডেল স্কুলের ছাত্র। স্কুলের সবাই তাকে পছন্দ করে। দারুণ এক বন্ধুদের দল আছে তার। দুর্দান্ত সুন্দরী ভেরোনিকা আর মিষ্টি বেটি—দুজনই আর্চি বলতে পাগল। ভেরোনিকা না বেটি—কে আর্চির উপযুক্ত সঙ্গী, এ নিয়েও কত ভাবনা সবার। আর্চি কমিকস পড়েনি—স্কুল-কলেজে এমন কাউকে কমই পাওয়া যাবে। এ সময়ের কিশোর-কিশোরীরা অনেকেই হয়তো চেনো না আর্চিকে। বড় ভাই কিংবা বোনকে জিজ্ঞেস করো। আর্চি কমিকস নিয়ে কেমন কাড়াকাড়ি পড়ত একসময়। নীলক্ষেতের বইয়ের দোকানে কেমন খোঁজ পড়ত আর্চির। এখনো হয়তো পুরোনো বইয়ের সংগ্রহে পেয়ে যাবে বাদামি হয়ে যাওয়া আর্চি কমিক।

আর্চি কেমন জনপ্রিয় ছিল? এ সময়ে ওয়ান ডিরেকশন কিংবা জাস্টিন বিবার যেমন। ঠিক আছে, বিবার শুনে নাক কুঁচকাচ্ছ অনেকেই। বিবারের বদলে এড শিরান বললাম। আর বেটি কিংবা ভেরোনিকা? সেলেনা গোমেজ কিংবা টেইলর সুইফট বললেও বোধ হয় বাড়াবাড়ি হবে না। জাগহেডের দুষ্টুমির তুলনা দেওয়া মুশকিল। গ্রাম্পি ক্যাট মেমেগুলো দেখলে যেমন মজা লাগে, জাগহেডের কাণ্ডকারখানাও অনেকটা তেমনই। এরা সবাই কিন্তু শুধু কমিক বইয়ের চরিত্র। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম—কিছুই ছিল না এদের। গুগল সার্চ দিলেও চলে আসত না এদের খোঁজখবর। নব্বইয়ের দশকের কিশোর-কিশোরীদের কাছে তবু এরাই হয়ে উঠেছিল খুব কাছের। অন্যান্য কমিকসের মতো বাংলাতেও পাওয়া যেত না আর্চি কমিক। সেটা কিন্তু তার জনপ্রিয়তায় কখনো বাধা হয়নি এ দেশে।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এই কমিক সিরিজ। এঁকেছিলেন বব মন্টানা। বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকেই এটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তেমন সহজলভ্য ছিল না বলেই হয়তো এতটা দেরি। তবে একটি কমিক চরিত্র এতদিন জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে এমন উদাহরণও কম। গত বছর অবশ্য এর প্রকাশক প্রতিষ্ঠান বড় পরিবর্তন এনেছে সিরিজটিতে। নতুন রূপে হাজির করা হয়েছে আর্চি সিরিজের চরিত্রগুলোকে। ডিজিটাল ফরম্যাটেও আর্চি পাওয়া যাচ্ছে এখন। এমনকি মোবাইল ফোনের অ্যাপ্লিকেশনও আছে। নীলক্ষেতে গিয়ে খোঁজাখুঁজি না করতে চাইলে অনলাইনেও পড়তে পারো। গুগলে একটা খোঁজ নিলেই নানা ফরম্যাটে পাবে। সময় বা প্রেক্ষাপট এখনকার চেয়ে বেশ আলাদা হলেও মজাই পাবে আর্চি পড়তে। তবে শুধু আর্চি নয়, আহ্লাদী ভেরোনিকা আর সহজ-সরল বেটিকেও পছন্দ হবে তোমাদের।

রুহিনা তাসকিন

তথ্যসূত্র : মেইল অনলাইন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের ছাপে আঁকাআঁকি

গোয়েন্দা কাহিনিতে অপরাধী ধরতে হাতের ছাপের গুরুত্ব কে না জানে। তাই ঝানু অপরাধীরা হাত বা আঙুলের ছাপ নিয়ে সদাসতর্ক। কিন্তু সাধারণ বা ভালো মানুষের কিন্তু এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। তুমিও যদি অপরাধী না হয়ে থাকো, তাহলে হাতের ছাপ দিয়ে মজার কিছু খেলা খেলতেই পারো। এই যেমন তুলি ছাড়াই আঁকতে পারো দারুণ সব ছবি। বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই তো! তাহলে নিচে তাকাও। নিচের সব ছবিই আঙুলের ছাপ দিয়ে আঁকা হয়েছে।

খুদে মানুষ

আঙুলের ছাপ দেওয়ার পর, কলম দিয়ে ইচ্ছেমতো চোখ, মুখ, নাক, হাত-পা এঁকে দাও।

চাকরি আর শখ

আঙুলের ছাপ দিয়ে তার সঙ্গে কাপড় আর অন্যান্য জিনিস এঁকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আঁকতে পারো।

চুলের বাহার

এখানে বিভিন্ন রকম চুলের সাজ আর অভিব্যক্তি দিয়ে কয়েকটি চেহারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে আঁকবে

নিচে আঙুলের ছাপ দিয়ে বিভিন্ন চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমন করে আঁকতে চাইলে একটি পুরোনো থালা বা বাটিতে কয়েক রকম রং ছড়িয়ে নাও। এরপর তোমার হাতের আঙুলে আলতো করে রং লাগিয়ে একটু টুকরো কাগজে আঙুল চেপে ধরো। সাবধান! ঘরের দেয়ালে বা অন্য কোথাও কিন্তু এই রং লাগানো যাবে না।

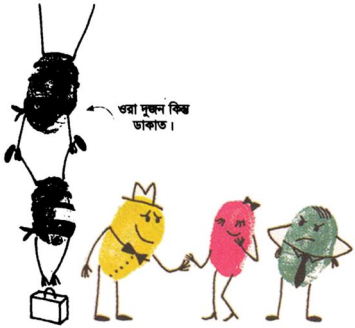

আবারও খুদে

আগের নিয়মেই এখানে আরও কিছু খুদে মানুষ আঁকা হয়েছে।

আরও পেশাজীবী

আগের নিয়মেই আরও পেশাজীবী মানুষ আঁকা হয়েছে।

আরও চুলের বাহার

আগের নিয়মে আঁকা আরও চুলের সাজসজ্জা দেখো। সেই সঙ্গে মুখের ভাব বিভিন্ন রকম।

ফিয়োনা ওয়াটের *থ্রি সিক্সটি ফাইভ থিংস টু মেক অ্যান্ড ড্র* থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত হোসেন

শায়েস্তা খাঁর এক টাকা

AMARBOI.COM

ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি, শায়েস্তা খাঁর আমলে এক টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। এখন তো পরিস্থিতি উল্টো। আট মণ চাল দিলেও বাজারে এক টাকার নোট আর পাওয়া যাবে না। এই যুগে এক টাকার নোট পুরোটাই অচল। এক টাকায় বলতে গেলে এখন কিছুই পাওয়া যায় না, তাই কেউ আর পকেটে রাখেন না এক টাকার নোট।

অনেকেরই হয়তো মনে আছে, কিছুদিন আগে আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, এক ও দুই টাকার নোট আর রাখবেন না। ধাতব মুদ্রার সর্বনিম্ন মান পাঁচ টাকার ঘোষণাও দিয়েছিলেন তিনি। চিন্তার কিছু নেই, অর্থমন্ত্রী হয়তো সবাইকে একটু ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন।

আসল কথাটি বলি। শায়েস্তা খাঁ ছিলেন মোগল বাংলার সুবেদার। তাঁর শাসনকালটি ছিল ১৬৬৪ থেকে ১৬৮৮ সাল পর্যন্ত। ঐতিহাসিকেরা অবশ্য বলছেন, আরেক নবাব সুজাউদ্দীন খানের (১৭২৭-১৭৩৯) আমলেও টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। তবে তাঁর কথা কেবল ঐতিহাসিকেরা মনে রেখেছেন, বইপত্রে খুব একটা পাওয়া যায় না। আর আমরা এখন যারা নিয়মিত বাজারে যাই, টাকায় আট মণ চালের কথা শুনে হয়তো লম্বা দীর্ঘশ্বাসও ছাড়ি।

এবার সত্যের আড়ালের আসল সত্যটা বলি। ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন, শায়েস্তা খাঁর সময়ে এক টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত ঠিকই, কিন্তু ওই এক টাকা আয় করাই ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। খুব কম মানুষই ছিল, যাদের পকেটে এক টাকা থাকত। তখন বাংলার মানুষ ছিল অত্যন্ত গরিব। সে সময়ের অর্থনীতিকে বলা হতো খোরাকি অর্থনীতি। অর্থাৎ জমিতে ফসল ভালো হলেও সবাই দুই বেলা খেতে পারত না। কোনো কারণে ফসল ভালো না হলে পরবর্তী ফসল না হওয়া পর্যন্ত প্রায় উপোস করেই থাকতে হতো। বলা হয়, সে সময়ে অনাহারে, দুর্ভিক্ষে, রোগে এত বেশি মানুষ মারা যেত যে, অতীত বাংলায় জনসংখ্যা খুব বেশি বাড়ত না।

এ থেকে অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা আমরা শিখতে পারি। আর তা হলো সত্তাধিকার। অর্থাৎ বাজারে বস্তা ভরা চাল মানে এই নয় যে দেশের সব মানুষ খুব ভালো আছে। বাম্পার ফলন মানে এই নয় যে দেশে কোনো খাদ্যাভাব নেই। আমরা অনেকেই অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী প্রথম এবং একমাত্র বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের কথা জানি। সত্তাধিকারের কথা তিনিই দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন। অর্থাৎ বাজারে চাল থাকলেই হবে না, সেটি কেনার সামর্থ্য থাকতে হবে, অধিকার থাকতে হবে। অমর্ত্য সেনের ভাষায় বলি, 'পণ্যসমষ্টির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আমরা খাই-পরি। যেসব অধিকার আইনগতভাবে পাকা অধিকার বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকৃত হয়, সে অধিকারগুলোকেই সত্ত্বাধিকার বলে।' আমাদের সংবিধানেই আছে, অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থান আমাদের চারটি মৌলিক অধিকার।

শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া গেলেও তা কিন্তু বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচয় ছিল না। দেখা গেছে, যদি আবহাওয়া ভালো থাকত, তাহলে সারা দেশেই অনেক বেশি ফলন হতো। এতে কৃষকের কোনো লাভ হতো না। তখন টাকায় আট, এমনকি নয় মণ চালও পাওয়া যেত। আবার এমনও হয়েছে দাম এতটাই কমে যেত যে কৃষকেরা মাঠ থেকে ফসল তুলতই না। ধান মাঠেই পচে যেত। সেই পচা ধান জমিতে সারের কাজ করলেও চাষির জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ত। কৃষকের হাতে কোনো টাকা থাকত না। সুতরাং শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত, তবে তা মোটেই প্রাচুর্যের লক্ষণ ছিল না। খুব কম মানুষেরই সে সময়ে এক টাকা থাকত। এক টাকা থাকা মানেই তিনি ধনী হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিলেন।

সে সময়ে কিন্তু বিনিময়ের জন্য অনেক ধরনের মুদ্রা ছিল। আর গ্রামাঞ্চলে কড়িই ছিল কেনাবেচার মাধ্যম। কড়ির হিসাবটা এ রকম—৪ কড়িতে এক গন্ডা, ২০ গন্ডায় ১ পণ, ৪ পণে এক আনা, ৪ আনায় ১ কাহন, ৪ কাহনে ১ টাকা। সুতরাং বুঝতেই পারছ, শায়েস্তা খাঁর আমলে ওই টাকাওয়ালাদের দেখা পাওয়াটাই ছিল বিরল।

তোমাদের জানার জন্য বলি, স্বাধীনতার পরপর এই বাংলাদেশেই মাত্র ৪০ টাকায় পাওয়া যেত এক মণ চাল। আর এখন? এখন একটু ভালো মানের মোটা চালের কেজিই ৪০ টাকা। ইতিহাস বইয়ে উল্লেখ আছে, ইস্ট ইন্ডিয়া নামের যে কোম্পানি বাংলা শাসন করেছিল, সে আমলেও টাকায় তিন মণ চাল পাওয়া যেত।

তবে এ কথা ঠিক, শায়েস্তা খাঁর আমলে ঢাকার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তবে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যাই থাকুক, টাকায় আট মণ চালের জন্যই সবাই তাঁকে মনে রাখবে, বারবার বইয়ে পড়বে। শায়েস্তা খাঁও হয়তো তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তো ঢাকা থেকে বের হওয়ার একটি তোরণে তিনি লিখে রেখেছিলেন, 'শস্যের এ ধরনের সস্তা বিক্রয়মূল্য প্রদর্শনকারীরাই একমাত্র এ তোরণ উন্মুক্ত করবে।'

ইতিহাসের কথাই যখন উঠল,

আরেকটা মজার তথ্য দিই। সময়টা উনিশ শতক। উন্নত বিশ্বে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে। কিন্তু সেখানে শ্রমিক নেই। শ্রমিক আছে এখানে—ভারতবর্ষে, বাংলায়। শিল্প ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আবাদের কাজ করার জন্যও শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা ছিল। এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে সেসব দেশে চা, রাবার, তামাক, আখ, তুলা চাষ, ইত্যাদি করা হতো। এ জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হতো।

শ্রমিক পেতে বিলেতের কোম্পানিগুলো এখানে নিয়োগ বা রিক্রুটিং কেন্দ্র খোলা শুরু করেছিল। তখন তো আর পত্রিকা বা টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার চল ছিল না। সে সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো অভিনব কায়দায়। একদল ঢোলক নিয়োগ দেওয়া হতো। তারা জায়গায় জায়গায় ঢোল পিটিয়ে মুখে মুখে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করত। এখন যেমন এটা নিলে ওটা ফ্রি পাওয়া যায়, শ্রমিক নিয়োগ পেতেও সে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাড়তি সুবিধার কথাও ঢোল বাজিয়ে প্রচার করা হতো। যেমন, বাড়ি থেকে বিদেশে কর্মস্থল পর্যন্ত আসা-যাওয়ার খরচ, পরিবারের আসা-যাওয়ার খরচ, আকর্ষণীয় বেতন, বিনা খরচে থাকার ব্যবস্থা, চিকিৎসা, বিমাসুবিধা এবং একটানা কাজ করলে বাড়তি বোনাস, ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হলো এই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে সবচেয়ে বেশি গেল বিহারি, উড়িষ্যা, তামিল ও তেলেগুরা। গেল না কেবল বাঙালিরা। লাখো লাখো তামিল-তেলেগু গেল মালয়েশিয়া, মরিশাস, ফিজি, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। সেই ভারতীয় শ্রমিকদের বংশধরেরাই কিন্তু এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ওই সব দেশের অর্থনীতি, এমনকি রাজনীতিকেও।

বাঙালিরা কেন গেল না?

আগেই বলেছি সাধারণ মানুষের মধ্যে ধনী মানুষ ছিল খুবই কম। অধিকাংশ সাধারণ মানুষই ছিল অত্যন্ত গরিব। প্রায়ই দেখা দিত দুর্ভিক্ষ। আর তাতে মারা যেত হাজার হাজার মানুষ। তারপরেও বাঙালিরা গেল না বিদেশে চাকরি করতে। কারণ দুটি। একটি কারণ হচ্ছে সমুদ্র বা কালাপানি পাড়ি দেওয়াকে চরম ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বলে মনে করা হতো। আরেকটি কারণ, অলসতা। না খেয়ে থাকবে, তবু অন্য দেশে যাবে না।

আর এখন সেই বাঙালি একটু কাজের আশায়, আরেকটু ভালো থাকার আকাঙ্ক্ষায় অবৈধভাবে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে গণকবরে ঠাঁই করে নিচ্ছে।

তথ্যসূত্র : ঐতিহাসিকের নোটবুক, সিরাজুল ইসলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

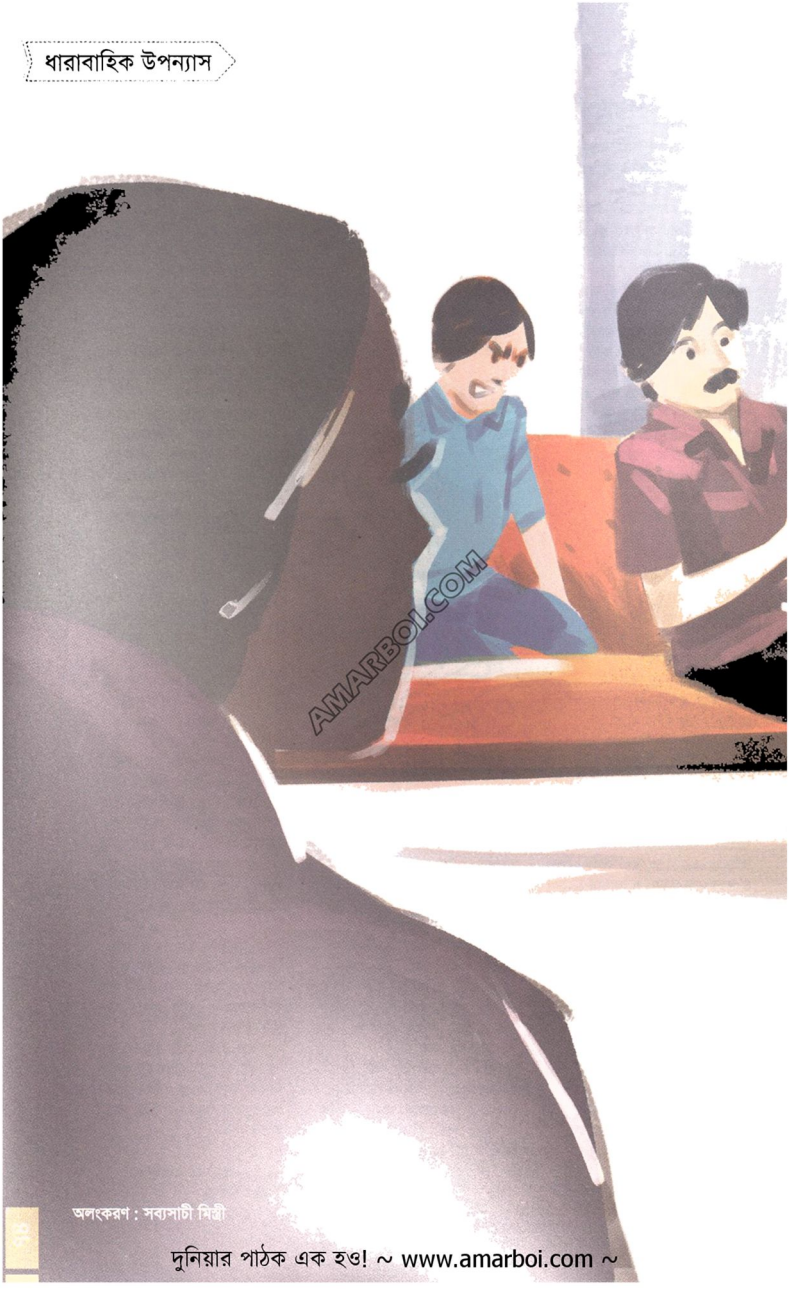

অলংকরণ : সব্যসাচী মিস্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিতুনি এবং তিতুনি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

AMARBOI.COM

গত সংখ্যার পর

খাবার টেবিলে আব্বু বললেন, 'কালকে সবাই মিলে ঢাকা যাব।' টোটন আনন্দের মতো শব্দ করল আর তিতুনি যন্ত্রণার মতো একটা শব্দ করল। ঢাকা শহর টোটনের খুবই পছন্দ, তার একটা কারণ ঢাকা গেলে তারা সাধারণত বড় ফুফুর বাসায় ওঠে আর বড় ফুফুর বড় ছেলে ঠিক টোটনের বয়সী, স্বভাবও ঠিক টোটনের মতো। বড় ফুফুর অন্য ছেলেমেয়েগুলোও জানি কী রকম আঠা আঠা, কথা বলে না, হাসে না। যখন হাসে তখন মুখটা জানি কী রকম বাঁকা করে হাসে, দেখেই তিতুনির মেজাজ গরম হয়ে যায়! ঠিক কী কারণ কে জানে বড় ফুফুর সব ছেলেমেয়ে মিলে সব সময় টোটনকে নিয়ে তিতুনির ওপর চড়াও হয়। তাকে জ্বালাতন করে, টিটকারি মারে, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তা ছাড়া ঢাকায় ফুফুর সেই অ্যাপার্টমেন্টে তিতুনির দম বন্ধ হয়ে আসে, চারদিকে বিল্ডিং আর বিল্ডিং। কোথাও এতটুকু ফাঁকা জায়গা নেই। ফুফুর ছেলেমেয়েরা কখনো অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয় না, সবার গায়ের রং ইটের নিচে চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মতো ফরসা, সবাই গোলগাল, নাদুসনুদুস। চব্বিশ ঘণ্টা কম্পিউটার গেম খেলে, না হয় টিভি দেখে দেখে সবার চোখে চশমা।

আব্বু বললেন, 'অনেক দিন ঢাকা যাই না। একটু ঘুরে আসি। বুবুর সঙ্গে একটা কাজও আছে।' টোটন টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক! আমরা কেন এই জঙ্গলে পড়ে থাকি আব্বু? আমরা কেন বড় ফুফুর মতো ঢাকা থাকতে পারি না?'

আব্বু বললেন, 'ঢাকা থাকা কি মুখের কথা নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিভিং কস্ট কত জানিস? সেখানে গেলে তোরা কোন স্কুলে পড়বি? কী করবি?'

তিতুনি বলল, 'আমি ঢাকা যেতে চাই না।' টোটন বলল, 'তুই হচ্ছিস গেরাইম্যা মেয়ে! তুই কেন শহরে যেতে চাইবি?'

তিতুনি বলল, 'আমি সেটা বলি নাই।' 'তাহলে কী বলেছিস?' 'আমি বলেছি, আমি কালকে ঢাকা যেতে চাই না।' আম্মু বললেন, 'ঢাকা যেতে চাই না মানে?'

'আমার ঢাকা যেতে ভালো লাগে না। এত ভিড়, এত মানুষ—'

'আব্বু বললেন, 'তোর বড় ফুফু তোদের কত আদর করে।'

'বড় ফুফুকে বলো এখানে চলে আসতে।'

'সে কত ব্যস্ত, কীভাবে সময় পাবে?'

তিতুনি যদিও মুখে এই কথাগুলো বলছে, কিন্তু তার মাথায় সারাক্ষণ এলিয়েন তিতুনির কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার পুরো জীবনটা এখন এলিয়েন তিতুনির হাতে। এত বড় একটা ব্যাপার অথচ ব্যাপারটা কাউকে জানাতে পারছে না—ঠিক কেন জানাতে পারছে না সেটাও বুঝতে পারে না। এলিয়েন তিতুনি যদি দেখতে অন্য রকম হতো তাহলে ব্যাপারটা কত সোজা হতো, কিন্তু শুধু যে দেখতে হুবহু এক তাই নয়, তার কথাবার্তা চিন্তাভাবনা তার মতো—তার পুরো মগজটাও সে কপি করে নিজের মাথায় রেখেছে, সে যেটা জানে অন্য তিতুনিও সেটা জানে। মাঝে মাঝে তার সন্দেহ হতে থাকে আসল তিতুনি কোনজন, সে নাকি অন্যজন!

কাজেই যখন ঢাকা যাওয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন তিতুনির মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে অন্য তিতুনির কথা। সে এখন কী করবে? তাদের সঙ্গে যাবে নাকি এখানে একা একা থেকে যাবে? তিতুনি অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করছিল। তখন হঠাৎ শুনল আব্বু বলছেন, 'খুব ভোরে রওনা দেব। একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছি। চারজন একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে যেতে পারব।'

টোটন বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক।'

তিতুনি বলল, 'আমি যেতে চাই না।'

আম্মু একটু গরম হয়ে বললেন, 'বাসায় তুই একা একা থাকবি নাকি?'

তিতুনির ইচ্ছে হলো বলে, 'আমি মোটেও একা থাকব না। আমার সঙ্গে থাকবে একটা এলিয়েন। তোমরা আমাকে যতটুকু দেখেশুনে রাখবে, এই এলিয়েন আমাকে তার থেকে এক শ গুণ বেশি দেখেশুনে রাখবে।' কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর সেটা বলতে পারে না, তাই চুপ করে রইল।

আম্মু বললেন, 'থাওয়ার পর ছোট একটা ব্যাগে দুই দিনের জামাকাপড় গুছিয়ে নিস। সকালে যেন দেরি না হয়।'

তিতুনি কোনো কথা বলল না, একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। আজকে স্কুল থেকে ফেরার পর অন্য তিতুনির সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কোথায় আছে কে জানে। আজকে কোন কায়দায় বাসায় ঢুকবে, ঢুকে আবার কোন ঝামেলা পাকাবে সেটাই বা কে জানে। স্কুলে ফাকু স্যারের ক্লাসে সে একটা বড় কিছু অঘটন ঘটিয়েছে টের পেয়েছে, অঘটনটা ঠিক কী সেটাও তিতুনি জানে না। না জানা পর্যন্ত সে খুব অস্বস্তিতে আছে, কারণ ক্লাসের সবাই ধরেই নিয়েছে ঘটনাটা ঘটিয়েছে সে।

তিতুনি চুপচাপ খেয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে চমকে উঠল। বিছানায় লম্বা হয়ে অন্য তিতুনি শুয়ে আছে। তিতুনি চমকে উঠে ফিস ফিস করে বলল, 'তুমি?

অন্য তিতুনি মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ। আমি।'

'কেমন করে ঢুকেছ?'

অন্য তিতুনি বলল, 'জানালা দিয়ে।'

'জা-জানালা দিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'দোতলার জানালায় উঠেছ কেমন করে?'

'হ্যাঁচড়-প্যাঁচড় করে খামচাখামচি করে।'

'জানালার শিকের ভেতর দিয়ে ঘরে ঢুকেছ কেমন করে?'

'শিক বাঁকা করে নিয়েছি।'

তিতুনি জানালার দিকে তাকাল, শিক কোনোটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁকা নয়। অন্য তিতুনি দাঁত বের করে হাসল, বলল, 'আবার সোজা করে রেখেছি।'

তিতুনি চোখ বড় বড় করে তাকাল, এই মোটা মোটা লোহার শিক কেমন করে বাঁকা করল? কেমন করে আবার সোজা করল? অন্য তিতুনি বলল, 'আজকে তোমার কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমি খেয়ে এসেছি।'

'খেয়ে এসেছ? কোথা থেকে খেয়ে এসেছ?'

'ওই তো!' বলে অন্য তিতুনি বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

তিতুনি চাপা গলায় যতটুকু সম্ভব কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা থেকে খেয়ে এসেছ?'

তিতুনির কঠিন গলায় কথা বলার কারণ আছে, কারণ সে যেখান থেকেই খেয়ে আসুক সবাই ধরে নিয়েছে এটা তিতুনির কাজ। তিতুনি আবার চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বলো, কোথায় খেয়ে এসেছ?'

অন্য তিতুনি একটু লাজুক মুখে বলল, 'মাহতাব চাচার বাসা থেকে।'

তিতুনি চোখ কপালে তুলে বলল, 'মা-হ-তা-ব-চা-চা-র বাসা থেকে? তুমি মাহতাব চাচার বাসায় গিয়েছিলে? ভাত খেতে?'

'জোর করে খাইয়ে দিলেন। চাচি খুবই সুইট। মাহতাব চাচার ছোট বাচ্চাটা খুবই কিউট।'

তিতুনির তখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, যে চোখ দুটো কপালে তুলেছিল সেগুলো কপালে রেখেই বলল, 'তুমি শুধু ভাত খেতে মাহতাব চাচার বাসায় চলে গেলে? তোমার লজ্জা করল না?'

মেয়েটা আবার দাঁত বের করে হাসল, 'লজ্জা করবে কেন? আমার জায়গায় তুমি হলে তুমিও চলে যেতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক তখন দরজা খুলে আম্মু ঘরের ভেতর ঢুকলেন, তিতুনি ঘরে আম্মুর দিকে তাকাল, এখন আম্মু নিশ্চয়ই একটা ভয়ংকর চিৎকার করে উঠবেন, কিন্তু আম্মু চিৎকার করলেন না, হাতে ধরে রাখা একটা ব্যাগ তিতুনির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নে, এইখানে তোর জিনিসগুলো রাখ।'

তিতুনি তার বিছানার দিকে তাকাল, এক সেকেন্ড আগেও সেখানে অন্য তিতুনি লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল, এখন সেখানে কেউ নেই। কোথায় গেল মেয়েটা?

আম্মু তার ঘরের চারদিকে তাকালেন, বললেন, 'ঘরের একি অবস্থা করে রেখেছিস? একটু পরিষ্কার করতে পারিস না?'

তিতুনি চোখের কোনা দিয়ে মেয়েটাকে তখনো খুঁজে যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে। মেয়েটা বিছানায় গড়িয়ে একপাশে চলে গিয়ে চাদরের নিচে ঢুকে গেছে, তাই চোখের সামনে নেই। আম্মু বিছানার দিকে ভালো করে তাকালেই দেখতে পাবেন বিছানার এক কোনায় এলোমেলো চাদরের নিচে একজন মানুষ। কিন্তু আম্মু সেদিকে তাকালেন না, তাকালেও দেখলেন না। একজন মানুষ যেটা দেখবে বলে আশা করে না, সেটা মনে হয় দেখেও দেখে না।

ব্যাগটা তিতুনির হাতে দিয়ে বললেন, 'একটা-দুইটা ভালো জামা নিবি। খালি রং ওঠা টি-শার্ট নিয়ে রওনা দিবি না।'

তিতুনি দুর্বলভাবে বলল, 'টি-শার্ট পরতে আরাম।'

'এত আরামের দরকার নেই। খুব সকালে উঠতে হবে, এখন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়।'

আম্মু নিজের মনে গজ গজ করতে করতে বের হয়ে গেলেন। তখন চাদরের নিচ থেকে মাথা বের করে অন্য তিতুনি উঁকি দিল, চোখ পিট পিট করে আসল তিতুনির দিকে তাকিয়ে একটু হাসার ভঙ্গি করল।

তিতুনি ফিস ফিস করে বলল, 'তোমাকে আম্মু দেখলেন না কেন?'

'অনেক তাড়াতাড়ি সরে গেছি তো, তাই।'

'অনেক তাড়াতাড়ি সরেছ তো কী হয়েছে? সরতে দেখা যাবে না কেন?'

'যখন ফ্যানের পাখা ঘুরতে থাকে, তখন তুমি সেটা দেখো?'

তিতুনি চোখ বড় বড় করে বলল, 'তুমি ফ্যানের পাখার মতো তাড়াতাড়ি যেতে পারো?'

অন্য তিতুনি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেমন জানি ঘাড় ঝাঁকাল, উত্তর দিতে না চাইলে আসল তিতুনি যেভাবে ঘাড় ঝাঁকায়! চাদরের নিচ থেকে বের হয়ে মেয়েটা ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাল ঢাকা যাচ্ছ?'

তিতুনি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি যেতে চাই না।'

মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, 'জানি।'

'কিন্তু না যেয়ে উপায় কী? যেতেই হবে।'

মেয়েটা আবার মাথা নাড়ল, বলল, 'জানি।'

'তোমাকে এই দুই দিন একা থাকতে হবে। তুমি তো আর আমাদের সাথে মাইক্রোবাসে ঢাকা যেতে পারবে না।'

মেয়েটা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'জানি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যখন আমি নাই তখন তোমার বাইরে ঘোরাঘুরি করা ঠিক হবে না। পরিচিত কেউ দেখে ফেললে অবাক হয়ে যাবে।' মেয়েটা আবার একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'জানি।' তিতুনির তখন তাদের স্কুল এবং ফাক্কু স্যারের কথা মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আজকে ক্লাসে কী হয়েছিল? তুমি ফাক্কু স্যারকে টাইট করেছ?'

'নাহ্, সে রকম কিছু না। শুধু ব্রেনের ভেতর আকার-উকার বলার অংশটা মুছে দিয়েছি। এখন ঠিক করে কথা বলতে পারছে না।'

তিতুনি বলল, 'আমি যখন বললাম হোমওয়ার্কের কথাটা ব্রেন থেকে মুছে দিতে তখন রাজি হলে না, এখন পুরো আকার-উকার মুছে দিয়েছ? এখন কোনো দোষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি?'

'এটা অন্য ব্যাপার। আকার-উকার মুছে দিলেও ক্ষতি নাই। আস্তে আস্তে আবার শিখে নেবে। একটা স্মৃতি মুছে দিলে সেটা আমার ফেরত আসবে না। আমি সেটা করতে পারব না।'

'তোমার ঢং দেখে আমি বাঁচি না।'

মেয়েটা তিতুনির দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সমস্যাটা কি জানো?'

'কী?'

'তোমার মনে থাকে না যে আমি দূর গ্যালাক্সি থেকে আসা একটি এলিয়েন! তুমি মনে করো আমিও বুঝি তোমার মতো বোকাসোকা একটা মেয়ে!'

তিতুনি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'আমি বোকাসোকা?'

অন্য তিতুনি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে এখন ঘুমাও। মনে আছে তোমার খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে?

তিতুনি বলল, 'আগে আমার ব্যাগ গোছাতে হবে।'

'সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমি তোমার ব্যাগ গুছিয়ে দেব।'

'তুমি পারবে?'

'এইটা হচ্ছে তোমার দুই নম্বর সমস্যা! তুমি ভুলে যাও যে আমি হচ্ছি তুমি। একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট তুমি। বলা উচিত হানড্রেড অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট তুমি!'

'সেইটাই হচ্ছে সমস্যা।'

তিতুনি বালিশে মাথা রাখতেই ঘুমিয়ে গেল। এটা কি তার নিজের সত্যিকারের ঘুম নাকি অন্য তিতুনি কোনো একটা কায়দা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল সে বুঝতে পারল না।

ঠিক যত সকালে তার ঘুম থেকে ওঠা উচিত তিতুনির ঘুম ভাঙল তার থেকে পরে। ঘুম থেকে উঠে সে বাসার ভেতরে অন্যদের কথা শুনতে পেল এবং রীতিমতো আঁতকে উঠল। শুনল আম্মু বলছেন, 'টোটন, তুই তোর ঘরের জানালা বন্ধ করেছিস?'

'করেছি আম্মু।'

'মনে আছে একবার জানালা খুলে রেখে গেলি, বৃষ্টিতে ঘরবাড়ি ভেসে গেল। আমার এত দামি টেবিল ক্লথের বারোটা বাজিয়ে দিলি।'

টোটন বলল, 'না আম্মু,' এইবার জানালা বন্ধ করে এসেছি।'

তখন আম্মু বললেন, তিতুনি। তুই?'

তিতুনি নিশ্বাস বন্ধ করে শুনল, অন্য তিতুনি বলছে, 'জি আম্মু, আমার ঘরের জানালা বন্ধ।'

তার মানে অন্য তিতুনি আম্মু-আব্বু আর টোটনের সঙ্গে ঢাকা যাচ্ছে! তাকে এখানে একা ফেলে রেখে! এখন সে কী করবে? চিৎকার করে বলবে, 'আমি আসল তিতুনি? আমাকে নিয়ে যাও।'

তিতুনি শুনল আব্বু বলছেন, 'সবাই বের হও। মাইক্রোবাস অপেক্ষা করছে। ট্রাফিক জ্যাম শুরু হওয়ার আগে পৌঁছে যেতে হবে।'

টোটন বলল, 'চলো আব্বু।'

তিতুনি শুনল অন্য তিতুনি বলছে, 'আমি রেডি।'

তারপর মনে হলো সবাই দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে গেল। এখন সে কী করবে? চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বের হবে? বলবে, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমাকে নিয়ে যাও।' সবাই তখন হাঁ করে তার দিকে তাকাবে? অন্য তিতুনি তখন সবার ব্রেনে ঢুকে সবকিছু মুছে দেবে? তখন কে যাবে? সে নাকি অন্য তিতুনি?

তিতুনি সাবধানে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। বাসার সামনে হালকা নীল রঙের একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের হুড খুলে সব ব্যাগ রাখা হচ্ছে। ব্যাগ ওঠানোর পর ড্রাইভার হুড বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আব্বু আর আম্মু উঠলেন। টোটন সামনে বসতে চাচ্ছিল, আব্বু বসতে দিলেন না। মুখ ভোঁতা করে সে পেছনে বসল। তার সঙ্গে অন্য তিতুনি। আসল তিতুনি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে, কত বড় ধড়িবাজ মেয়ে। তাকে ফেলে রেখে নিজে আসল তিতুনি সেজে ঢাকা চলে যাচ্ছে।

তিতুনি কী করবে ঠিক করার আগেই ড্রাইভার গাড়িতে উঠে মাইক্রোবাসটা স্টার্ট করে রওনা দিয়ে দিল। দেখতে দেখতে সেটা বাসার সামনে সড়কে উঠে যায়, তারপর সড়ক ধরে ছুটতে থাকে। কয়েক মিনিটের মাঝে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ্যতা প্রমাণের জন্য সেখানে লেগে রইলাম কাঁঠালের আঠার মতো। মাত্র তিন মাসের মাথায় অ্যানিমেশন স্টুডিও 'বারডেল'-এ চাকরি পেয়ে গেলাম প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। কাজ শুরু করলাম বড়দের জনপ্রিয় কার্টুন রিক অ্যান্ড মরটিতে। ছয় মাস যেতে না যেতেই পদোন্নতি পেয়ে প্রোডাকশন সমন্বয়ক হিসেবে যোগ দিলাম ভিএফএক্স স্টুডিও মুভিং পিকচার কোম্পানিতে (এমপিসি)। এক বছরের বেশি সময় ধরে একে একে কাজ করি হালের বিখ্যাত টিভি সিরিজ *গেম অফ থ্রোন্স*, চলচ্চিত্র *নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম থ্রি*, *এক্সোডাস*, *ফিফটি শেডস অব গ্রে* ও *ফিউরিয়াস সেভেন*-এর মতো চলচ্চিত্রে। এই মুহূর্তে কাজ করছি *ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান* চলচ্চিত্রে, যেটা মুক্তি পাবে ২০১৮ সালে।

এই চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে আমার কোনো ধারণাই ছিল না, কত বিশাল আকারে এই পোস্ট প্রোডাকশন স্টুডিওগুলো কাজ করে। এমনও হয় যে ছোট্ট একটা অ্যানিমেশন দৃশ্যের বাজেট থাকে এক মিলিয়ন ডলার। তোমরা যখন ছবিতে সেই দৃশ্যটা দেখো, তখন সেটা এক পলকেই শেষ হয়ে যায়। আর কাজগুলো এত ডিটেইলে হয় যে কল্পনাও করা যায় না। সময়ক হিসেবে আমার কাজ আর্টিস্টদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া, সুপারভাইজার, ডিরেক্টরদের নোটে সময় সাধন করা, আর্টিস্টরা যেন নির্ধারিত সময়সূচি মিস না করে, তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। সারা দিন এই কাজ করতে করতে আমি অবাক হয়ে দেখি সিনেমার পেছনের এই দারুণ দক্ষযজ্ঞ, যা এখানে না এলে কখনোই জানা হতো না। তবে এক লেখায় তো সব বলা সম্ভব না। আজ তিনটি বিষয় নিয়ে বলি।

প্রি ভিজ্যুয়ালাইজেশন ডিপার্টমেন্ট

স্টোরিবোর্ড জিনিসটা কী, আমরা সবাই কি তা জানি? সিনেমার পাণ্ডুলিপি লেখার পর পরিচালকরা শট টু শট কেমন হবে তা কমিকসের মতো করে এঁকে ফেলেন। এটাই স্টোরিবোর্ড। এতে পুরো সিনেমার একটা চিত্রগত ধারণা পাওয়া যায়। ক্যামেরা কোথায় বসবে, লেন্স কী হবে, চরিত্ররা কে কোন জায়গায় থাকবে ইত্যাদি সব খুব সহজেই ধারণা করা যায়। হলিউডের কম্পিউটার সিজিনির্ভর ছবিগুলো স্টোরিবোর্ডের এক ধাপ ওপরে। তারা শুরুতেই পুরো সিনেমার একটা অ্যানিমেটেড সংস্করণ বানিয়ে ফেলে। অনেক দ্রুত বানানো হয় বলে এই অ্যানিমেশনগুলো হয় একদম প্রাথমিক মানের। কিন্তু এর ফলে সেট কেমন হবে, চরিত্ররা কে কোথায় থাকবে, ক্যামেরা কীভাবে ব্যবহার করা হবে, কী কী স্পেশাল এফেক্টস হবে—সবকিছু সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পরিচালকেরা তাঁদের স্টুডিওর কর্মীদের বুঝিয়ে দেন। অনেকটা মূল শুটিংয়ের আগে ডিজিটাল শুটিং হয়ে যায় আরকি!

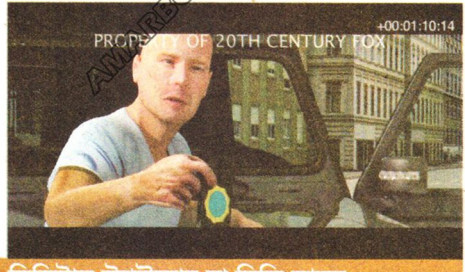

ডিজিটাল স্ট্যান্টম্যান বা সিজি ডাবল

স্ট্যান্টম্যানদের কথা তো সবারই জানা। নায়ক-নায়িকা বা ভিলেনদের যত বিপজ্জনক অ্যাকশন দৃশ্য আছে, তা সবই করেন আমাদের এই স্ট্যান্টম্যানরা। এ জন্য তাঁদের অ্যাকশনের সময় ক্যামেরা এমন অ্যাঙ্গেলে ধরা হয়, যাতে ঠিকমতো চেহারা না বোঝা যায়। এখনকার হলিউডের সিনেমায় স্ট্যান্টম্যানদের পাশাপাশি ডিজিটাল স্ট্যান্টম্যানও থাকে। প্রত্যেক অ্যাকশন হিরো-হিরোইনের একটা কম্পিউটার সংস্করণ বানানো হয়। কঠিন অ্যাকশনের দৃশ্যগুলোয় অভিনেতাদের জায়গায় ব্যবহার করা হয় তাঁদের কম্পিউটার অ্যানিমেটেড সংস্করণ। অনেক দ্রুত অ্যাকশনগুলো হয় দেখে বোঝার উপায়ই থাকে না যে কোনটা আসল আর কোনটা কম্পিউটারের মডেল। সিজি ডাবলের সবচেয়ে বড় কাজটি হয় 'ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস' সিরিজের সপ্তম ছবি *ফিউরিয়াস সেভেন*-এ। পল ওয়াকারের মৃত্যুর পর সিনেমাটা শেষ করেন তাঁর দুই ভাই। কম্পিউটারের মাধ্যমে পাল্টে দেওয়া হয় তাঁদের মুখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

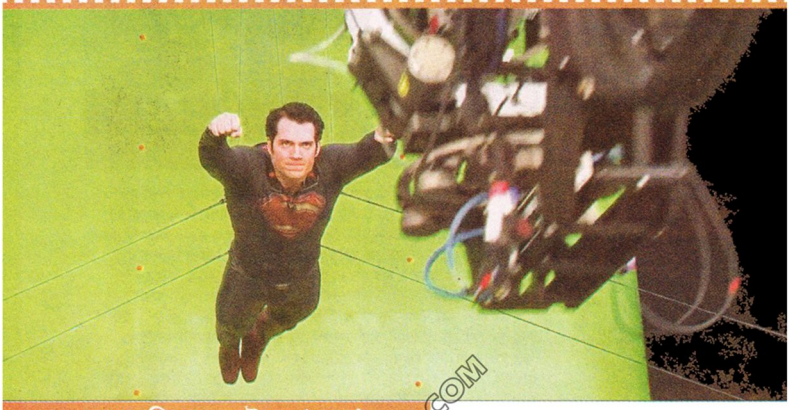

সুপার হিরোদের উড়ন্ত 'কেপ'

আচ্ছা, মানুষ না হয় ডিজিটাল হলো, কিন্তু তাই বলে সুপার হিরোরা দৌড়ানোর সময় পেছনে যে ঝান্ডার আমরা উড়তে দেখি, যাকে বলা হয় 'কেপ', তা-ও কি ডিজিটাল হবে? সুপারম্যান সিরিজের *ম্যান অব স্টিল* ছবিটি যারা দেখেছে, তারা নিশ্চয়ই জানে পুরো সিনেমায় সুপারম্যান তার আইকনিক কেপটি কমিকস বা কার্টুনের মতোই খেলিয়ে গেছে। আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি, যখন শুনি এই কেপটি ছিল সম্পূর্ণ ডিজিটাল! শুটিংয়ের সময় একটি কেপ ব্যবহার করলেও সেটা কাজ করে প্লেস হোল্ডার হিসেবে। যেকোনো সুপার হিরোর সিনেমাতেই নাকি এ রকম হয়। কেন? কারণ, কেপটি কম্পিউটারে বানালে ইচ্ছামতো তাকে নিয়ে খেলা যায়, ইচ্ছামতো লাইট দেওয়া যায়, অ্যানিমেশন করা যায়। আগের দিনের সুপার হিরো মুভিতে দেখা যাবে কেপগুলো সব গলায় ঝুলে থাকে। আর এখন শরীরের সঙ্গে এমনভাবে থাকে, অ্যাকশনে এমনভাবে জড়িয়ে যায়, মনে হয় শরীরেরই অংশ। এই সবই হয় ডিজিটাল কেপের কল্যাণে!

আয়োজন

ভিকারুননিসায় বিজ্ঞান উৎসব

৬ থেকে ৯ আগস্ট রাজধানীর বেইলি রোডের ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে আয়োজিত হচ্ছে বার্ষিক বিজ্ঞান উৎসব। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিবছরই ভিকারুননিসা নূন বিজ্ঞান ক্লাব এই উৎসব আয়োজন করে আসছে। এবারের উৎসব ক্লাবটির ১৮তম আয়োজন, যেখানে অংশ নিচ্ছে দেশের অর্ধশতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। উৎসবের প্রিন্ট মিডিয়া পার্টনার কিশোর আলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমা প্রকাশনের বই

রহস্য/গোয়েন্দা উপন্যাস

রকিব হাসান
- ছায়াশহর ৳ ২২০

আনিসুল হক
- বাগানবাড়ি রহস্য ৳ ১৮০
- ভয়ংকর দ্বীপে বোকা গোয়েন্দা ৳ ১৮০
- কিডন্যাপারের কবলে গুড্ডুবুড়া ৩য় মুদ্রণ, ৳ ১২০

মশিউল আলম
- তুমুলের আঙুলরহস্য ৳ ২০০

কিশোর ক্ল্যাসিক

ভিক্টর হুগো, অনু : শেখ আবদুল হাকিম
- দ্য ম্যান হু লাফস ২য় মুদ্রণ, ৳ ২২০

আনতোয়ান দ্য স্যাঁত-একসু পেরি
অনুবাদ : হায়দার আলী খান
- ছোট্ট রাজকুমার ৳ ৩০০

গণিত

আব্দুল কাইয়ুম
- গণিতের জাদু ২য় মুদ্রণ, ৳ ৩০০

কীর্তিমান বাঙালি সিরিজ

আবুল মোমেন
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৳ ১৫০

বিপ্লব বালা
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৳ ১৫০

মালেকা বেগম
- সুফিয়া কামাল ৳ ১৫০

গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিন সিরিজ

রকিব হাসান
১. রহস্যের দ্বীপ ৫ম মুদ্রণ, ৳ ২২০
২. হাইপারসনিক রহস্য ৩য় মুদ্রণ, ৳ ২০০
৩. গোল্ডেন বাইক রহস্য ২য় মুদ্রণ, ৳ ২০০
৪. অর্গান পাইপ রহস্য ২য় মুদ্রণ, ৳ ২০০
৫. অপারেশন বাহামা আইল্যান্ড ২য় মুদ্রণ, ৳ ২২০
৬. বাঘের মুখোশ ২য় মুদ্রণ, ৳ ২২০
৭. গোলকরহস্য ৳ ২০০

সভ্যতা সিরিজ

এ কে এম শাহনাওয়াজ
১. মিসর ২. মেসোপটেমিয়া ৩. পারস্য ও অন্যান্য
৪. প্রাচীন ভারত ৫. চীন ৬. হিব্রু ও প্রাচীন ইউরোপ
৭. গ্রিস ৮. রোম প্রতিটি ৳ ১৫০

ছোট্টপিডিয়া সিরিজ

শরীফ খান
- পাখি ২য় মুদ্রণ, ৳ ১৩০

মোকারম হোসেন
- ফুল ২য় মুদ্রণ, ৳ ১৩০

দ্বিজেন শর্মা
- গাছ ৳ ১৫০

পড়াশোনা

- সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি : ভালো করার নিয়মকানুন ৪র্থ মুদ্রণ, ৳ ১৮০
- বিবিসি জানালা ইংরেজি শেখার বই ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড ৳ ১৩০, ১৫০ ও ১৬০

AMARBOI.COM

প্রথমা প্রকাশন
প্রথমা বইয়ের দুনিয়া, ঢাকা : ১৯ কারওয়ান বাজার ৮১৮০০৭৮,০১৮৪২-৩২২৫৭৭, ৪৩-৪৪ আজিজ মার্কেট শাহবাগ, ৯৬৬৪৮২৫, ০১৯৩৩-৩৪৭৩৩৭, চট্টগ্রাম : ৬১৬১৬৫, অর্ডার : ০১৭১৩-০৬৮১০৩, ০১৯৫৫-৫৫২০৬২ বিকাশ : ০১৯৫৫-৫৫২০৬৯, ই-মেইল : prothoma@prothom-alo.info

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনে রাখা ভালো

বলো তো, লাউ, কুমড়া, পেয়ারা, আপেল, শসা—এগুলোর মধ্যে কোনটি ফল আর কোনটি সবজি? এত সহজ প্রশ্ন শুনে নিশ্চয়ই অনেকে বিরক্ত হচ্ছ। কিন্তু উত্তরটি শুনলে তুমি নিশ্চিতভাবেই অবাক হবে। উদ্ভিদবিদদের ভাষায়, ওপরের উল্লেখ করা সবগুলো বস্তুই ফল। শুনে চোখ কপালে উঠেছে তো! অবশ্য কারণটি শুনলে তোমার চোখ আবারও যথাস্থানে ফিরে যেতেও পারে। উদ্ভিদবিদ্যার হিসেবে, ফল হচ্ছে গাছের এমন অংশ, যা ফুল থেকে বেড়ে ওঠে। পাশাপাশি ফলের মধ্যে বীজ থাকে, যা থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে। ফলের মধ্যে একটিমাত্র বড়সড় বীজ থাকতে পারে (বরই) কিংবা অনেকগুলো ছোট ছোট বীজও (কাঁঠাল) থাকতে পারে। এসব বৈশিষ্ট্য থাকলেই তাকে আমরা ফল বলতে পারব। সে হিসেবে লাউ, কুমড়াও ফল! (অবশ্য সবাই এগুলো সবজি হিসেবেই জানে।)

অন্যদিকে সবজি হচ্ছে উদ্ভিদ বা গাছের একটি অঙ্গ, যা আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। এ হিসেবে খাবার উপযোগী গাছের মূল, পাতা, কাণ্ড ইত্যাদিই সবজি। যেমন : আমরা গাছের মূল বা শিকড় (মুলা, গাজর) খাই, তেমনি গাছের কন্দ (আলু), পাতা (লাল বা সবুজ শাক), ফুল (ফুলকপি) বা কাণ্ডও (কচুর লতি বা শাকের ডাঁটা) খাই। অনেকেই সবজি খেতে মোটেও পছন্দ করে না। কিন্তু তারপরও যদি বাবা-মা কুমড়া খেতে চাপাচাপি করেন, তাহলে জিনিসটাকে একটা ফল মনে করে খেয়ে নিয়ো। বোঝা গেছে জিনিসটা! ইটস সিম্পল!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফল আর সবজির মধ্যে কী?

নিজে করো

উদ্ভিদবিদদের মতে, নিচের কোনটি ফল আর কোনটি সবজি সেটি খুঁজে বের করো। পরে নিচে উল্টো করে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

১. লেটুস
২. নারকেল
৩. বেগুন
৪. পটোল
৫. জলপাই
৬. ভুট্টা
৭. বাঁধাকপি
৮. শালগম
৯. কাঁচা মরিচ
১০. ঝিঙা

উত্তর : ফল : ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯, ১০।
সবজি : ১, ৭, ৮।

টমেটো নিয়ে কেলেঙ্কারি

সাধারণ মানুষ টমেটোকে সবজি হিসেবেই জানে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, টমেটো ফল। কারণ, এতে বীজ থাকে। কিন্তু টমেটো ফল না সবজি সেটি নিয়ে রীতিমতো আইনি হাতাহাতি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে, ১৮৯৩ সালে। সে বছর মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট আদালত এ বিষয়ে একটি রুল জারি করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল, বিজ্ঞানীরা কী ভাবলেন আর কী ভাবলেন না, তাতে কিছু আসে যায় না। জনগণ টমেটোকে সবজি হিসেবে বিবেচনা করে এবং সেই হিসেবেই এটি ডিনারে খাওয়া হয়। মার্কিন আদালতের মতে, যেহেতু খাবার টেবিলে ফল ডেজার্ট হিসেবে খাওয়া হয় কিন্তু টমেটো ডেজার্ট হিসেবে খাওয়ার কথা কেউ কখনো শোনেনি, সেহেতু টমেটো কোনোমতেই ফল হতে পারে না। এটি অবশ্যই সবজি।

আরও একটু...

১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাস রাজ্যে টমেটোকে জাতীয় ফল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি জাতীয় সবজি হিসেবে ঘোষণা করা হয়...কাকে? সেই টমেটোকেই।

কিআ প্রতিবেদক

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারাবাহিক কমিকস

সোমোর মঙ্গল অভিযান

শাহরিয়ার

(গত সংখ্যার পর...)

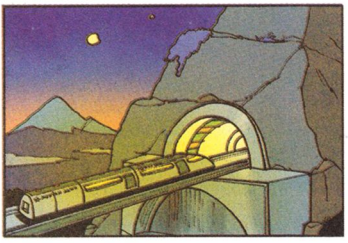

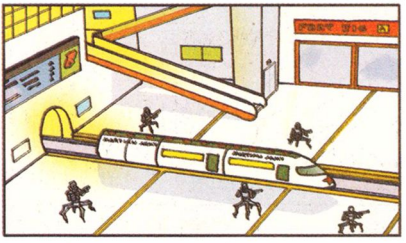

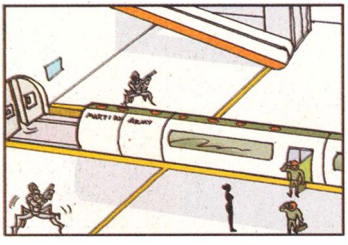

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলুন উৎসব

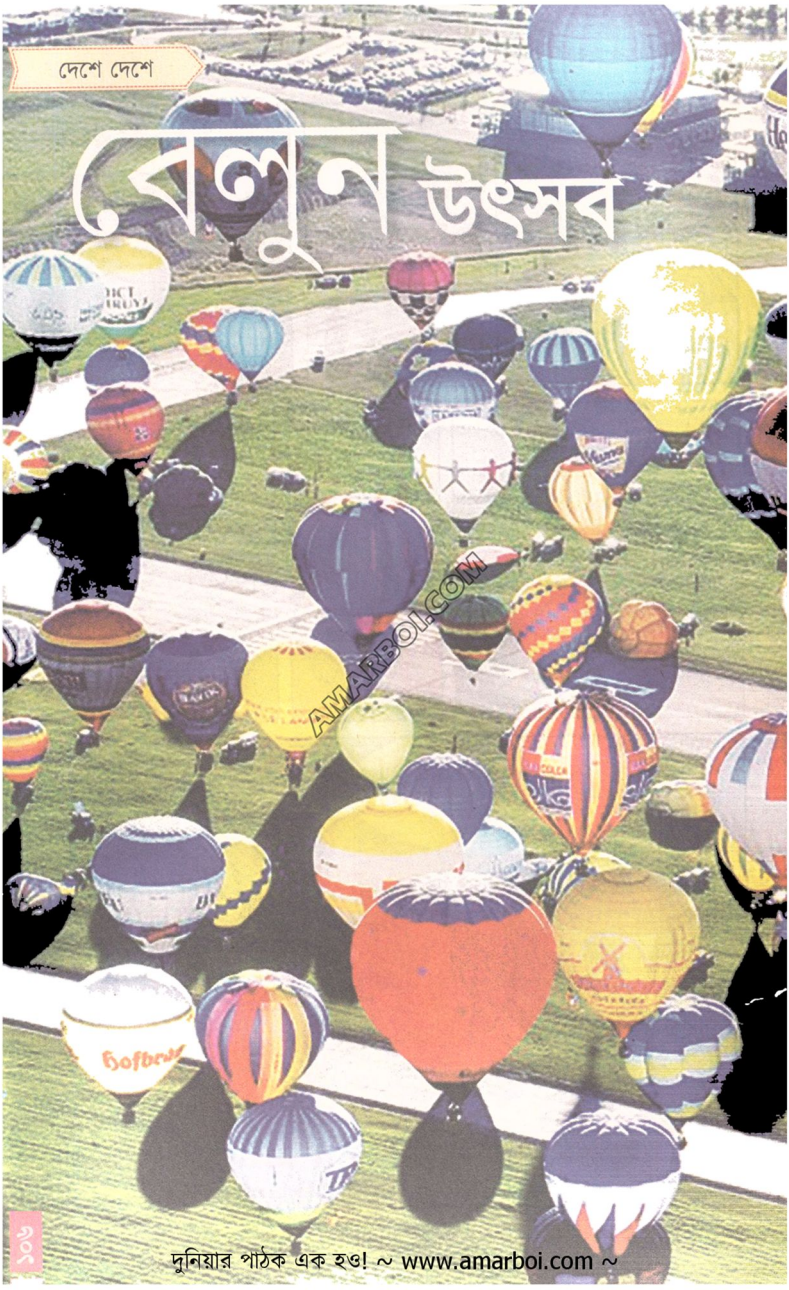

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরজুড়েই বিচিত্র সব উৎসব পালিত হয় সারা বিশ্বে। আজ ফল উৎসব তো কাল খাদ্য উৎসব। পরশু সংগীত তো তার পরের দিন গল্প বলা উৎসব কিংবা অন্য কিছু। এই তো গত জুলাই থেকে ফ্রান্স আর যুক্তরাষ্ট্রের আনাচে-কানাচে শুরু হয়েছে মজার গরম বাতাস বেলুন উৎসব। ও, মা! বাংলায় বললাম বলে বুঝতে পারোনি বুঝি! ঠিক আছে, ইংরেজিতেই বলি : হট এয়ার বেলুন ফেস্টিভ্যাল। জুলাইয়ে ইন্ডিয়ানা আর ওহাইও রাজ্যে শুরু হওয়া এই উৎসব চলতি মাসে পালিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে। অন্যদিকে গত ২৪ জুলাই থেকে ফ্রান্সের লোরিনে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক বেলুন উৎসব। ১০ দিন ধরে অনুষ্ঠিত এ উৎসবের নাম লোরিন ম্যান্ডিয়াল হট এয়ার বেলুন ফেস্টিভ্যাল। ২০ বছর ধরে শুরু হওয়া এ উৎসবে বিশাল সাইজের অন্তত এক হাজারটি রংবেরঙের বেলুন উড়বে আকাশজুড়ে। এটি অবশ্যই একটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড। কারণ, ২০১৩ সালে ফ্রান্সের এই শহরে ওড়ানো হয়েছিল মাত্র ৪০৮টি বেলুন। তাতেই সেবার সবচেয়ে বেশি বেলুন ওড়ানোর রেকর্ড গড়েছিল ফরাসি উৎসবটি।

অনেকেই হয়তো জানো, বিশেষ এই বেলুন ওড়ানোর জন্য কোনো গ্যাস ব্যবহার করা হয় না। তাহলে বেলুন আকাশে ওড়ে কীভাবে? আসলে বেলুনের নামের সঙ্গেই এর উত্তর দেওয়া আছে। গরম বাতাসই হট এয়ার বেলুনের প্রাণভোমরা। বিশেষ পদ্ধতিতে গরম বাতাস বেলুনের ভেতর ঢোকানো হয়। তাতেই ফুলে ওঠে বেলুনটি। গরম বাতাস স্বাভাবিক বাতাসের চেয়ে হালকা হওয়ার কারণে একসময় তা ভেসে ওঠে ওপরে। এই প্রযুক্তি অনেক প্রাচীনকাল থেকেই জানত মানুষ। তবে এ ধরনের বেলুনে প্রথম মানুষ চড়ার সাহস দেখিয়েছিল ১৭৮৩ সালের নভেম্বরে। সেবার দুই ফরাসি দুঃসাহসী রোজিয়ার ও আরল্যান্ডস প্যারিসে জনসম্মুখে বেলুনে চেপে আকাশে উড়েছিলেন।

তবে হট এয়ার বেলুন নিয়ে উৎসবের শুরু গত শতাব্দীর '৬০-এর দশকের দিকে। প্রথম আধুনিক হট এয়ার বেলুন বানানোর কৃতিত্ব অবশ্য ব্রিটিশদের। হট এয়ার বেলুনে চেপে সবচেয়ে উঁচুতে ওঠার রেকর্ড রয়েছে ভিজাপাত সিংহানিয়ার। ২০০৫ সালে তিনি ভারতের মুম্বাই থেকে একটি বেলুনে চেপে ২১ হাজার ২৭ মিটার উঁচুতে উঠেছিলেন। আর এ বেলুনে চেপে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রমের রেকর্ড গড়েছেন সুইডিশ বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক পার লিন্ডস্ট্যান্ড ও রিচার্ড ব্রানসনের। তাঁরা ১৯৯১ সালে এই বেলুনে চেপে ৭ হাজার ৬৭১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিলেন।

কিআ প্রতিবেদক

তথ্যসূত্র : এএফপি, উইকিপিডিয়া

পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প

শিকারী লুলেং

মেহেদী হক

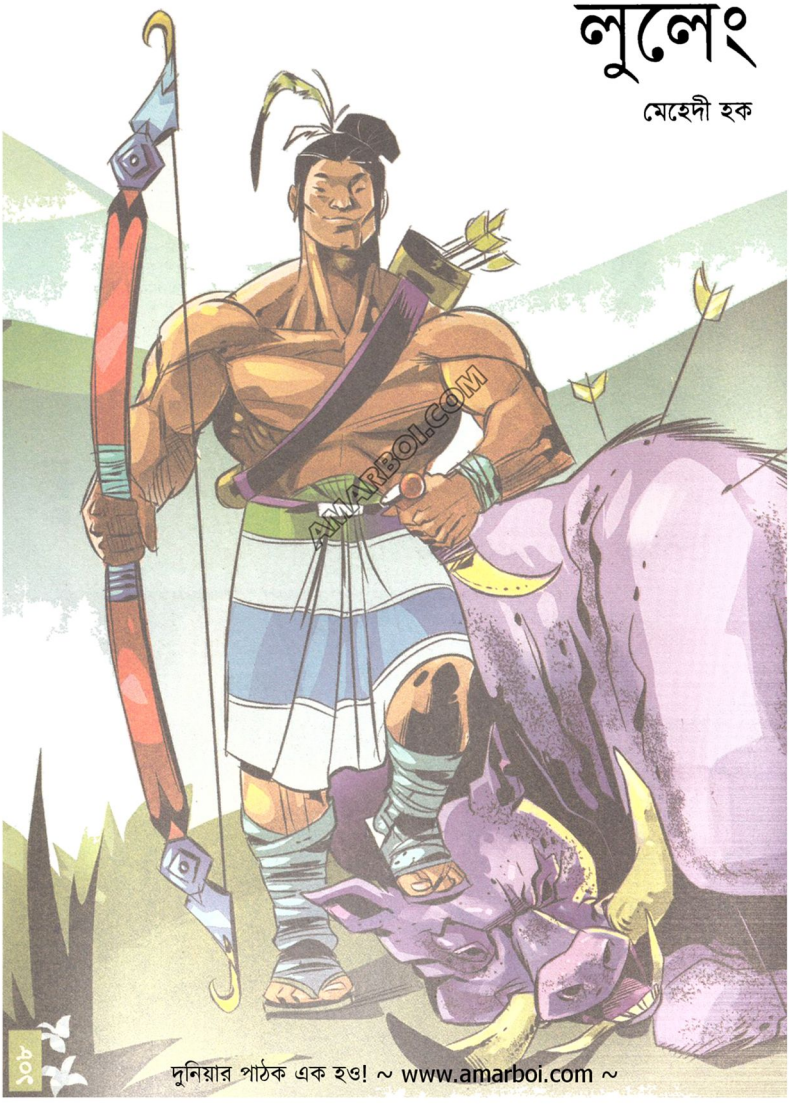

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে অনেককাল আগের কথা, বান্দরবানের সান চি রাজ্যে থাকত এক বিরাট শিকারি, নাম তার লুলেং। লুলেং তার আশপাশের কয়েক রাজ্যের মধ্যে তলোয়ার লড়াই, তির ছোড়া আর কুস্তি লড়াইয়ে সবার সেরা, তার ওপর দেখতেও যেন রাজকুমার সে। এমনিতে দুর্ধর্ষ শিকারি হলেও সবার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার তার। সবাই তাকে অনেক পছন্দ করে, এমনকি সান চির রাজা তেরেম সানও তাকে নিজের হাতে সেরা বীরের পালক পরিয়ে দিয়েছেন। সান চি রাজ্যের সবার কাছে সে হলো সবার সেরা লুলেং। সান চির সবাই সুখেই দিন যাপন করছিল। হঠাৎ একরাতে কোত্থেকে বিরাট এক দ্রাগিন* এসে পড়ল সান চিতে। সে এসেই সব তছনছ করে দিতে লাগল। তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষ-বাতাস বের হয়ে সব জ্বালিয়ে দিতে লাগল। কারও গায়ে সেই বাতাস লাগলেই সে সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয় যেতে লাগল। খবর পেয়ে ছুটে এল লুলেং। ভয়ানক লড়াই হলো তাদের, কেউ কাউকে ছাড়ে না, যুদ্ধ করতে করতে প্রায় ভোর হয়ে এলে সেই দ্রাগন হঠাৎ ছুটে কোথায় পালিয়ে গেল। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, আপদ বিদায় হলো। রাজা তেরেম লুলেংকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন।

লুলেং কিন্তু হাল ছাড়ল না, সে সেই দ্রাগনের পায়ের ছাপ ধরে ধরে তাকে খুঁজে চলল। মারামারির সময় দ্রাগনের একটা আঁশ তার হাতে রয়ে গিয়েছিল। সেই আঁশের ঘ্রাণ শুঁকে লুলেংয়ের পোষা কুকুর 'থুম' সারা দিন জঙ্গলের অনেক পথ ঘুরে অনেক খাল-নালা পার হয়ে সন্ধ্যার সময় দুর্গম একটা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছাল। লুলেং সতর্কতার সঙ্গে পাহাড়ের ওপরে উঠে একটা ছোট্ট গুহা দেখতে পেল। নিজের দুধারি তলোয়ারটা হাতে শক্ত করে ধরে সেই গুহায় ঢুকে পড়ল সে। তাকিয়ে দেখে, কোনায় এক বৃদ্ধ লোক বসে আছে। সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে তার, দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক বয়স হয়েছে। লুলেংয়ের কুকুর বৃদ্ধকে দেখে ভয়ে চুপসে গেল। আর লুলেংকে দেখে সেই বৃদ্ধ যেন খুশি হলো। বলল,

—আমি জানতাম তুমি আসবে, লুলেং।

লুলেং অবাক।

—আমি-ই সেই দ্রাগিন! বলল বৃদ্ধ। হতবাক লুলেং অবিশ্বাসের চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকাতে বৃদ্ধ তার গল্প শুরু করল। এক হাজার বছর আগে এই সান চি রাজ্যেই এই বৃদ্ধ থাকত। তার নাম 'নাকী', আর সে ছিল তার সময়ের সেরা বীর, সেরা শিকারি। এখনকার লুলেংয়ের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই। সবই ঠিকঠাক চলছিল। একদিন শিকার করতে গিয়ে একটা হরিণ তাড়া করতে গিয়ে নাকী হঠাৎ জঙ্গলের মাঝখানে একটা পুরোনো কুঁড়েঘর দেখতে পেল। এখানে কুঁড়েঘর কোত্থেকে এল ভেবে অবাক হলো সে। আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে সেই কুঁড়ের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে। সেখানে পুরো খালি একটা ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা তিন কোনা টেবিল রাখা। সেই রাখা টেবিলে তিনটা পাত্র। আর সেই পাত্রগুলো পেঁচিয়ে আছে একটা সাদা রঙের বিরাট সাপ। অবাক হয়ে নাকী সেদিকে এগোতেই সাপটা কথা বলে উঠল। বলল, কাছে এসো না ভালো মানুষ। এই পাত্রগুলো আমি পাহারা দিচ্ছি, এগুলোর মধ্যে রাখা আছে মানুষের জন্য ক্ষতিকর তিনটা কারণ। 'হিংসা', 'ঘৃণা' আর 'ভয়'। কোনো কারণে এর কোনো একটা খুলে গেলে মানুষের বিপদ। কিন্তু নাকীর ততক্ষণে মনের মধ্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে আর সাপটার পেটের কাছে রাখা এক বিরাট লাল রঙের রুবি মণি দেখা যাচ্ছে, সেটা দেখে নাকীর মনের মধ্যে লোভ জাগতে শুরু করল। সে তখন সাপের কথা অগ্রাহ্য করে তলোয়ারের এক কোপে সেটাকে শেষ করে মণিটা নিয়ে নিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই তখন পাত্র তিনটা খুলে একটা নোংরা ধোঁয়া বের হতে লাগল। আর ওদিকে সাপের কাটা মাথাটা বলতে লাগল, তুমি ভুল করলে নাকী। এই ধোঁয়া এখন মানুষের মধ্যে ক্ষতিকর বিষাক্ত তিনটি জিনিস ঢুকিয়ে দেবে। হঠাৎ নাকী বুঝল সে কী ভুল করেছে। সে চিৎকার করে বলল,

—এখন কি কোনো উপায় নেই এটাকে থামানোর?

সাপটা বলল,

—আছে। পুরো ধোঁয়াটা তুমি নিজে টেনে নাও। তাহলেই একমাত্র সবাইকে রক্ষা করা যাবে। নাকী সঙ্গে সঙ্গে তা-ই করল। সাপটা বলল,

—এবার তুমি নিজেকে শেষ করে দাও, নয়তো তোমার জীবন হবে ভয়ানক। বলতে বলতে সাপটা এবার বাতাসে মিলিয়ে গেল। নাকী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে বের হয়ে গেল। সে রাতেই নাকী সন্ধ্যা মেলানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা ড্রাগিনে পরিণত হলো। সেদিন থেকে পুরো এক হাজার বছর ধরে সে প্রতিরাতে এই একই ঘটনা ঘটছে। নিজেকে শেষ করে দেওয়ার সাহস তার এত দিনেও হয়নি। তাই সে কয়েক দিন আগে তার এক সময়ের নিজের রাজ্য সান চিতে লুলেংয়ের খোঁজেই গিয়েছিল, যাতে লুলেং তাকে মেরে ফেলে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়।

—আমাকে এখনই মেরে ফেলো লুলেং! বলে শেষ করল বৃদ্ধ।

লুলেং এতক্ষণ সব শুনছিল। সে হতভম্ব অবস্থায় বলল,

—আপনাকে আমি কীভাবে সব শোনার পরে মেরে ফেলতে পারি? আপনি তো একজন মানুষ। নাকী আবার চেঁচিয়ে বলল,

—রাত হয়ে যাচ্ছে লুলেং, এখনই আমাকে না মারলে আমি আবার ড্রাগিন হয়ে যাব, তখন আর আমাকে মারতে পারবে না। আর তখন কোনোভাবে যদি আমাকে মারতে পারো, তখন আমার শরীর থেকে সেই লোভের বাতাস আবার মুক্ত হয়ে মানুষের শরীরে ঢুকে যাবে।

—কিন্তু আমি এভাবে মানুষ অবস্থায় আপনাকে কখনোই মারতে পারব না।

—তাহলে নিজে মরো!

বলতে বলতে চোখের সামনে সেই বৃদ্ধ সেই বিকট ড্রাগনে পরিণত হলো। সে কী ভয়ানক তার চেহারা। বিকট মাথার সঙ্গে জুড়ে বসেছে গাঁইতির মতো এক সার শ্বদন্ত। লুলেং মরিয়া হয়ে তার জীবনের সেরা যুদ্ধটা শুরু করল। ভয়ানক যুদ্ধের মধ্যে লুলেং বুঝতে পারল, এখন এই ড্রাগিন অবস্থায় একে মারতে না পারলে আর কখনোই একে মারা যাবে না। কিন্তু কোনোভাবেই একে ঘায়েল করা যাচ্ছে না, এভাবে প্রায় সারা রাত লড়াইয়ের পর ভোরবেলায় ঠিক সূর্য ওঠার সময় ড্রাগিনরূপী বৃদ্ধ দুর্বল হয়ে পড়ল, ওদিকে লুলেংও একেবারে কাহিল হয়ে গেছে, কিন্তু সে বুঝতে পারল এই মুহূর্তে একে মারতে না পারলে আর কখনোই এটাকে মারা যাবে না। লুলেং এবার তার সর্বশক্তি নিয়ে ড্রাগিনকে আঘাত করল, আঘাতের পর আঘাতে এবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রাগিন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। এক কোপে এবার তার মাথা আলাদা করতে গেল লুলেং, ড্রাগিনটা তখন সেই বৃদ্ধের কণ্ঠে বলে উঠল,

—ধোঁয়াটা বের হতে দিয়ো না লুলেং।

ততক্ষণে তরবারি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালিয়ে দিয়েছে লুলেং, আর ঠিকই সেই নোংরা ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। মুহূর্ত না ভেবে লুলেং এবার নিজে সেই ধোঁয়া পুরোটা টেনে নিল!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে। ঘুরে এবার সে তার রাজ্যে দিকে তাকিয়ে ফিসফিস স্বরে বলল,

—বিদায় সান চি।

বলেই নিজের তরবারি পুরে দিল তার পেটে। লোভের ধোঁয়া যেন তার রাজ্যের কাউকে স্পর্শ করতে না পারে।

সান চির লোকজনকে লুলেংয়ের কুকুর পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে এল। রাজ্যের সবাই দেখল তাদের বীর লুলেং আর এক বৃদ্ধের মৃতদেহ পড়ে আছে। রাজা তেরেম বুঝতে পারলেন সবাইকে বাঁচাতেই লুলেং নিজেকে উৎসর্গ করেছে। সবাই সসম্মানে দুজনের মৃতদেহ সৎকার করল। রাজ্যের একেবার কেন্দ্রে বানানো হলো এই দুই বীরের মূর্তি। এখনো পূর্ণিমার রাতে সবাই জড়ো হয় সেই মূর্তির নিচে। লুলেংয়ের বীরত্ব আর ত্যাগের কথা নিয়ে গান গায় সবাই। আকাশের মিটমিটে তারার দিকে তাকিয়ে সবাই বলে—

ভালো থাকো লুলেং।

*দ্রাগিন—ড্রাগন

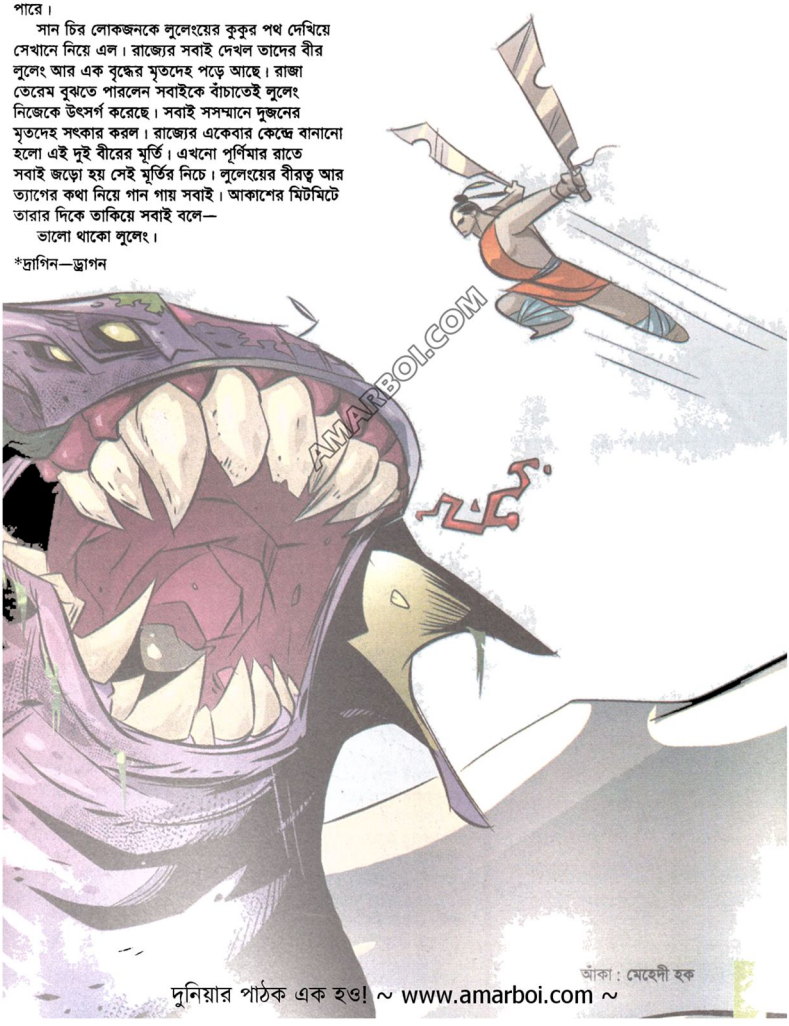

আঁকা : মেহেদী হক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় বিড়াল কোলে সুফিয়া কামাল

সবুজ দ্বীপের মতো সুফিয়া কামাল

জাহীদ রেজা নূর

এদেশে যত আন্দোলন হয়েছে, তার সিংহভাগে ছিলেন সুফিয়া কামাল। বাঙালিদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সব সময় মিছিলের সামনের সারিতে পাওয়া গেছে তাঁকে।

সুফিয়া কামালের যখন জন্ম হয়, তখন এ দেশের মুসলিম মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষায় অনেক পেছনে পড়ে ছিল। ১৯১১ সালের ১০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাবা সৈয়দ আবদুল বারী ছিলেন পেশায় উকিল। সুফিয়া কামালের সাত বছর বয়সে বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে যান। মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের কাছে বড় হতে থাকেন সুফিয়া। সুতরাং বুঝতেই পারছ, কী রকম এক অবস্থা থেকে তাঁকে উঠে আসতে হয়েছে! বাড়িতে ছিল উর্দু ভাষার চল। সুফিয়া নিজের উদ্যোগেই শিখে নিয়েছিলেন বাংলা। খুব বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না তাঁর।

মায়ের সঙ্গে ১৯১৮ সালে কলকাতায় গিয়েছিলেন সুফিয়া। সেখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। সুফিয়ার কোমল মনে বেগম রোকেয়া ঠাঁই করে নেন।

১৯২৩ সালে মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে সুফিয়ার বিয়ে হয়। পরে তিনি 'সুফিয়া এন হোসেন' নামে পরিচিত হন। সৈয়দ নেহাল হোসেন সুফিয়াকে সমাজসেবা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দেন। বরিশালের *তরুণ* পত্রিকায় ১৯২৩ সালে সুফিয়ার লেখা প্রথম গল্প 'সৈনিক বধূ' প্রকাশিত হয়।

১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী বরিশালে এসেছিলেন। সুফিয়া সাক্ষাৎ করেন তাঁর সঙ্গে। কলকাতায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হওয়া ছিল সুফিয়ার জীবনে এক অসাধারণ ঘটনা। কবি নজরুল সুফিয়ার কবিতা পড়ে মুগ্ধ হন। *সওগাত* পত্রিকায় মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন 'বাসন্তী' নামে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপেন ১৯২৬ সালে।

১৯৩১ সালে সুফিয়া মুসলিম মহিলাদের মধ্যে প্রথম 'ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালে তাঁর স্বামী মারা যান। ১৯৩৩-৪১ পর্যন্ত তিনি কলকাতা করপোরেশন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পাশাপাশি চলতে থাকে সাহিত্যচর্চা। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *সাঁঝের মায়া* কাব্যগ্রন্থটি। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। পরের বছর আপনজন ও শুভানুধ্যায়ীদের ইচ্ছায় তিনি চট্টগ্রামের লেখক ও অনুবাদক কামালউদ্দীন আহমদকে বিয়ে করেন। সেই থেকে তিনি 'সুফিয়া কামাল' নামে পরিচিত হন।

১৯৪৬ সালে কলকাতায় যখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধে, তখন তিনি লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে একটি আশ্রয়কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে সাহায্য করেন। পরের বছর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকা প্রকাশ করলে তিনি হন তার প্রথম সম্পাদক। ওই বছরেরই অক্টোবর মাসে তিনি সপরিবারে ঢাকা চলে আসেন।

১৯৪৮ সালে তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটিতে যোগ দেন। ওই বছরই তাঁকে সভানেত্রী করে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে তাঁর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সুলতানা* পত্রিকা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সুফিয়া কামাল সরাসরি অংশ নেন। শুধু তা-ই নয়,

> কলকাতায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হওয়া ছিল সুফিয়ার জীবনে এক অসাধারণ ঘটনা। কবি নজরুল সুফিয়ার কবিতা পড়ে মুগ্ধ হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিতুনির প্রথম অনুভূতিটা হলো ভয়ের, তার বাসার সবাই তাকে ঘরের ভেতর তালা মেরে চলে গেছে। তিতুনির মনে হলো অনেক দিন পর তার আব্বু-আম্মু বাসায় এসে দেখবে সে বাসায় না খেতে পেয়ে মরে পড়ে আছে। তখন তার মনে পড়ল বাসার ফ্রিজে অনেক খাবার সে আর যেভাবেই হোক না খেয়ে মারা যাবে না। তখন মনে হলো এই বাসার ভেতরে তালাবদ্ধ হয়ে থেকে সে পুরোপুরি পাগল হয়ে যাবে। তখন মনে পড়ল বাসার সামনের দরজায় তালা দেওয়া আছে সত্যি কিন্তু সে ইচ্ছে করলেই বাসার পেছনের দরজার ছিটকিনি খুলে বের হয়ে যেতে পারে। তখন মনে হলো রাত্রি বেলা যখন একা একা ঘুমাতে হবে, তখন ভূতের ভয়ে সে হয়তো হার্টফেল করে মরে যাবে। চিন্তা করেই এই সকাল বেলা দিনের আলোতেই তার হাত-পা কাঁপতে থাকে।

জোর করে সে মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দেয়। তিতুনি প্রথমে বাথরুমে গিয়ে দাঁত ব্রাশ করে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে বাসার ভেতরে এল। ফ্রিজ খুলে দেখল খাওয়ার কী আছে। এমনিতে সকাল বেলা তার কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করে না, যেহেতু আজকে সে জানে খাবার ব্যবস্থা নেই, তাই খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করতে শুরু করেছে।

তিতুনি এক স্লাইস রুটি, একটা কলা আর আধ গ্লাস দুধ মাত্র খেয়ে শেষ করেছে ঠিক তখন বাসার বাইরে সে মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেল।

তিতুনি অবাক হয়ে জানালার কাছে গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকায়, ঠিক তাদের বাসার সামনে বেশ কয়েকজন মানুষ। তার মাঝে একজন টিশটাশ মেয়ে, দুজন বিদেশি, একজনের মাথার চুল পাকা, অন্যজনের মাথায় ধু ধু টাক। বিদেশি দুজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যরা বাসার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। টিশটাশ মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'এইটা সেই বাসা?'

জিনস আর টি-শার্ট পরা একজন বলল, 'হ্যাঁ, এইটা সেই বাসা।'

'তুমি কেমন করে জানো?'

'আমি জানি। স্পেসশিপ ট্র্যাকিং ডাটা থেকে দেখেছি এই বাসার ঠিক পেছনে এলিয়েন স্পেসশিপ ল্যান্ড করেছে।'

'কেউ টের পেল না কেমন করে?'

'সবাই টের পেয়েছে কিন্তু সবাই মনে করেছে মাইল্ড ট্রেমার। ভূমিকম্প। এটা যে একটা স্পেসশিপ ল্যান্ড করেছে কেউ বুঝতে পারেনি।'

'ও।'

জিনস আর টি-শার্ট পরা মানুষটা তিতুনিদের বাসাটার ওপরে-নিচে তাকিয়ে 'বলল,' 'এলিয়েনটা স্পেসশিপ থেকে বের হয়ে এই বাসায় ঢুকেছিল।'

'তুমি কেমন করে জানো?'

'আমাদের ডাটা থেকে আন্দাজ করছি।'

'এই বাসায় কে থাকে?'

'ছোট একটা ফ্যামিলি। হাজব্যান্ড-ওয়াইফ, একটা ছেলে আর মেয়ে।'

টিশটাশ মেয়েটা বলল, 'বাসায় তো তালা মারা।'

'হ্যাঁ। পুরো ফ্যামিলি আজ সকালে বের হয়ে গেছে।

মনে হয় একটা ট্রিপে গিয়েছে।'

'বাসাটা তাহলে ফাঁকা?'

'হ্যাঁ, ফাঁকা। কেউ নেই।'

'গুড। আমরা নিরিবিলি কিছু ইনভেস্টিগেট করতে পারব।'

'হ্যাঁ এই ফাঁকে সব যন্ত্রপাতি সেটআপ করে ফেলি।' তারপর জিনস আর টি-শার্ট পরা মানুষটা হেঁটে হেঁটে বিদেশি লোক দুজনের কাছে গেল, তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। বিদেশি লোক দুজন তখন খুবই উত্তেজিত হয়ে হাত-পা নেড়ে কথা বলতে থাকে। দূর থেকে তাদের কথা শোনা যাচ্ছিল না, শোনা গেলেও তিতুনি কিছু বুঝত কি না সন্দেহ। বিদেশিদের ইংরেজি খুবই অদ্ভুত, গলার ভেতর থেকে কী রকম একটা শব্দ বের করে কথা বলে।

শুধু একটা কথা শুনতে পেল, 'এবার এই এলিয়েনটাকে ধরতেই হবে! এটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর ইতিহাসের একমাত্র সুযোগ।'

অন্যরাও মাথা নাড়ল, বলল, 'ধরতেই হবে।'

তিতুনি জানালা থেকে সরে এল, তার হাত-পা কাঁপছে। এবার এলিয়েন তিতুনিকে ওরা ধরে ফেলবে। ভুল করে যদি তাকে ধরে ফেলে? তখন কী হবে?

(চলবে)

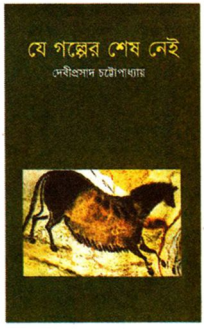

যে গল্পের শেষ নেই

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ : ১৯৫১ সাল

যদি প্রশ্ন করা হয়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গল্প কোনটি? অনেকেই হাত তুলে হয়তো একবাক্যে আরব্য রজনীর সেই সহস্র এক রজনীর গল্পের কথা বলবে। আর বিদগ্ধ পড়ুয়াদের কেউ কেউ হয়তো রুশ লেখক লিও টলস্টয়ের ওয়ার অ্যান্ড পিসের কথাও বলে বসতে পারে। কিন্তু হিসাব বলছে, কারও উত্তরই সঠিক নয়। আসলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গল্পের জন্মস্থান আরবেও নয়, রাশিয়াতেও নয়। বরং এর জন্ম আমাদের এই বাংলাদেশেই। আরও ভালো করে বললে, আমাদের গ্রাম-বাংলায় পানখেকো গল্পবুড়োদের মুখে মুখে জন্ম হয়েছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় গল্পটির।

ওই যে গল্পবুড়োর কাছে ওই আষাঢ়ে গল্পটি শোনোনি, বিশাল একঝাঁক পাখি প্রতিদিনই মাঠে নেমে বারবার খেয়ে যেত ধান। তাতে কৃষকদের সাড়ে সর্বনাশ হতে আর বাকি ছিল না। হতচ্ছাড়া পাখিদের শায়েস্তা করতে একবার বুদ্ধি করে বিশাল এক জাল ফেলা হলো, মাঠে নেমে আসা পাখির ঝাঁকের ওপর। তাতে আটকা পড়ল পাখির দল। কিন্তু জালে একটি ফুটো ছিল সেটি কেউই খেয়াল করেনি। তাই এক এক করে পাজি পাখিগুলো বেরিয়ে যেতে লাগল ফুড়ুত, ফড়ুত করে। জালের ভেতর অগণিত পাখি থাকায় পাখির ফুড়ুত আর শেষ হয় না। একই সঙ্গে গল্পও চলতে থাকে অনন্তকাল ধরে।

অবশ্য প্রায় একই রকম এক গল্প চালু আছে আফ্রিকার রূপকথায়। সেটিও নাকি বিশ্বের সবচেয়ে বড় গল্প বলে দাবি আফ্রিকানদের। অর্থাৎ যে গল্পের কোনো শেষ নেই। কিন্তু আসলেই কি তাই? গল্পবুড়োদের এ ফাঁকিবাজি আর চাপাবাজির ভিড়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শুনিয়েছেন আরেক গল্প। সে গল্পেরও কোনো শেষ নেই। চলমান, মানে টু বি কন্টিনিউ। সে গল্প হচ্ছে মানুষের গল্প। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আদিম মানুষের উত্থানের গল্প। মানুষের উঠে দাঁড়ানোর গল্প। সামান্য থেকে অসামান্য হয়ে ওঠার গল্প। আরব্য রজনীর গল্পেরও একটা শেষ আছে। এক হাজার এক রাতের পর শেষ হয়েছিল সে গল্প। কিন্তু মানুষের গল্পের আসলে কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যত দিন পৃথিবীতে মানুষ আছে, তত দিনই চলতে থাকবে এ গল্প।

বিশাল একঝাঁক পাখি প্রতিদিনই মাঠে নেমে বারবার খেয়ে যেত ধান। তাতে কৃষকদের সাড়ে সর্বনাশ হতে আর বাকি ছিল না।

আদিম সময় থেকে মানুষ আর তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব রাজনীতি আর বিজ্ঞান নিয়ে বিস্তর মোটা মোটা বই লেখা হয়েছে। রয়েছে অতি মূল্যবান রেফারেন্স বই কিংবা প্রমাণ সাইজের এনসাইক্লোপিডিয়া। কিন্তু এ বইটিতে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে শূন্য থেকে শুরু করে মানুষের উদ্ভব আর আজকের সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত সব বৈশিষ্ট্যকে। ঝরঝরে ভাষায় একেবারে গল্পের মতো করে শুধুই মানুষের কথা বইটির প্রতি পাতায় পাতায় তুলে ধরা হয়েছে। সহজ আর সাবলীল ভাষায় প্রকাশিত সমাজ বিকাশের লিখিত দলিল। বহু বছরের আগের কথা হলেও এগুলো আজও সত্য।

বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫১ সালে। স্বাভাবিকভাবেই তখনকার দিনের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে আজকের পরিস্থিতির ছিল আকাশ-পাতাল তফাত। তাই একসময় ভীষণ জনপ্রিয় এ বইটিতে সময়োপযোগী তথ্য বা বিজ্ঞান যোগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই দীর্ঘ ৪০ বছর পর, মানে ১৯৯১ সালে বইটি নতুন তথ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে ঢেলে সাজিয়েছিলেন লেখক। তবে সেটিও প্রায় ২৪ বছর আগের কথা। সে সময়ের তুলনায় বিজ্ঞান এগিয়েছে আরও অনেকটা পথ। তাই এ সময়ের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে বইটির খুব সামান্য হলেও কিছু অসংগতি রয়েছে, যা পড়ে পাঠক হোঁচট খেতেই পারে। যেমন : মৌলিক পদার্থের সংখ্যা এ বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৯২টি। কারণ, নব্বইয়ের দশকের আগে ও কটিই জানা ছিল মানুষের। এ রকম আরও ছোটখাটো কিছু তথ্যগত ত্রুটি আছে বইটিতে। এসব ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত না হয়ে উইকিপিডিয়া বা অন্য কোনো জ্ঞানকোষের সঙ্গে মিলিয়ে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এটুকু বাদ দিলে জোরের সঙ্গেই বলা হয়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'যে গল্পের শেষ নেই' এর আবেদন শেষ হয়নি এখনো। কারণ, বাংলা ভাষায় এ রকম সহজপাঠ্য বই খুব বেশি নেই বললেই চলে। তাই বইটি সবার জন্যই অবশ্যপাঠ্য। জনপ্রিয় বইটি বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। একটু খোঁজ করলেই পেয়ে যাবে আশা করি।

মুনিয়া মানতাসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোবন্ধু

উত্তর দিচ্ছেন
মনোবিজ্ঞানী
রুবাইয়া খান

আমার রাগ অনেক বেশি। খুব ছোট ছোট কারণেও আমি রেগে যাই। রাগ করে দুবার বাসা থেকে চলেও গিয়েছিলাম। আমার এই অনিয়ন্ত্রিত রাগ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি?

শেখ মো. আশফাক
নারিন্দা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা।

উত্তর : রাগ সবারই কমবেশি থাকে, তবে যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, সেটা সমস্যা। তুমি কী কী কারণে রেগে যাও তার একটা তালিকা করে নিতে পারো। রেগে গিয়ে তুমি যে ধরনের প্রতিক্রিয়া করো, তা-ও পর্যবেক্ষণ করো এবং নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করো। নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে। এমন হতে পারে রেগে গেলে তুমি তোমার পছন্দের কাজটা করতে পারো; হতে পারে সেটা ছবি আঁকা, হাসির সিনেমা দেখা, গল্পের বই পড়া, বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা—অর্থাৎ মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া। একটু একটু করে অনুশীলন করে দেখো, ধীরে ধীরে রাগ নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

আমি অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্র। পড়তে বসলেই অন্যান্য ব্যাপারে চিন্তা হয়। ফলে পরীক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ভালো ফল হয় না। সামনে আমার জেএসসি পরীক্ষা, খুবই চিন্তায় আছি।

মো. মমিনুর রহমান
চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

উত্তর : ধরো একজন পর্বতারোহী পাহাড়চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করল এবং চূড়ায় ওঠার আগেই সিদ্ধান্ত নিল আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি না। তাহলে কি সে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে? চেষ্টা কথাটা বাদ দিয়ে নিজেকে বলো আমি পরীক্ষায় ভালো করব। ভালো ফলের জন্য প্রথমে একটা পরিকল্পনা করে নিতে হবে। এখন তুমি কোন অবস্থানে আছ, নিজেকে কোন অবস্থানে দেখতে চাও—সবটাই পরিকল্পনা করে রুটিন করে লেখাপড়া শুরু করে দাও। ঠিকই তুমি ভালো ফল করবে।

ও আমার সহপাঠী। তার নাম বলতে চাই না। লেখাপড়ায় অনেক ভালো। নাচ, গান, ছবি আঁকা—সবকিছুতেই পারদর্শী। কিন্তু অনেক হিংসুটে, অহংকারী ও স্বার্থপর। ওর সঙ্গে আমার অনেক ঝগড়া হয়, ওকে আমি দুই চোখে দেখতে পারি না। কিন্তু আমার ক্লাসের অন্য মেয়েরা প্রচণ্ডভাবে ওর প্রশংসা করে আর আমার বিপক্ষে যায়। তাই আমার অনেক খারাপ লাগে। এখন আমি কি সবার মতো ওর প্রশংসা করব?

শাওরিন ফওজিয়া
অষ্টম শ্রেণি, বাকলিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

উত্তর : তুমি তোমার সহপাঠীর অনেক দক্ষতার প্রশংসাই করেছ। তোমার সহপাঠী লেখাপড়ায় অনেক ভালো। তবে ওর হিংসুটেপনা, অহংকার ও স্বার্থপরতা তোমার পছন্দ না। অন্যের অনেক কিছুই তোমার পছন্দ নাও হতে পারে। তুমি অন্যকে পাল্টাতে পারবে না, তবে নিজেকে পারবে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে সবকিছুই সহজ হয়ে যায়। তুমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারো। ওর ভালো গুণের প্রশংসা করতে পারো এবং যে ব্যাপারগুলো তোমার ভালো লাগে না, তা নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে পারো। ওরও হয়তো তোমার প্রতি কোনো অভিমান থাকতে পারে। আবেগপ্রবণ না হয়ে, অন্যের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে সচেতনভাবে পদক্ষেপ নাও।

আমার নামে একটা ঘূর্ণিঝড়ের নাম হওয়ায় আমার বন্ধুরা প্রায়ই বিভিন্ন কথা বলে খ্যাপানোর চেষ্টা করে। শুরুর দিকে পাত্তা দিতাম না। কিন্তু এখন ভালো লাগে না। বাবাকে জানিয়েছি। কোনো লাভ হয়নি। এখন আমি কী করব?

নার্গিস সুলতানা
যশোর

উত্তর : আমার তো মনে হয়, যার যার নামের সঙ্গে এ রকম ঝড়ের সম্পর্ক আছে, তাদের সবাইকেই কমবেশি কথা শুনতে হয়েছে। চেষ্টা করবে এগুলো হালকাভাবে নেওয়ার। ওসব কথায় পাত্তা দেওয়ার কোনো দরকার নেই। মানুষ কী বলবে বা করবে, তা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে হলেও তুমি ব্যাপারটাকে কতটা পাত্তা দেবে, তা কিন্তু একেবারে তোমার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে।

শুরু হলো তোমাদের জন্য নতুন বিভাগ। এই বিভাগে তোমরা তোমাদের নানাবিধ মানসিক সমস্যা যা তোমার শিক্ষক, বাবা-মা বা অন্য কাউকে বলতে পারছ না, তা আমাদের লিখে পাঠাও। পাঠানোর ঠিকানা—
মনোবন্ধু
কিশোর আলো, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র

দামি কাঠের তৈরি বাদ্যযন্ত্রটির দুই প্রান্তে নিকেল ও পিতল মিনা করা থাকে।

মন্দির, বিয়ে বা শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

এর ওপর দিকে স্বাভাবিক সারি থেকে একটু সুরে একটি ছিদ্র থাকে।

ভারতের ধ্রুপদি সংগীতের ভাবপ্রকাশক একক বাদ্যযন্ত্র।

ঘুঙুর : নৃত্যশিল্পীরা পায়ে ঘুঙুর পরেন।

মন্দিরা : পিতলের তৈরি এক জোড়া হাতে বাজানোর উপযোগী করতাল।

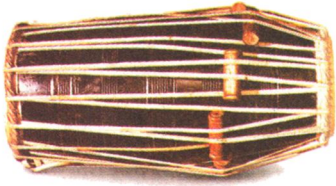

ঢোল : তবলার মতো বাদ্যযন্ত্রটি দুহাত দিয়ে বাজাতে হয়।

বীণা : এর আরেক নাম রুদ্রবীণা।

সরস্বতী বীণা : প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে বীণার অস্তিত্বের প্রমাণ

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ কোন বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতেন, জানো? সরোদ। আরও অনেক বাদ্যযন্ত্রই তিনি বাজাতে পারতেন, কিন্তু লোকে তাঁকে চিনত সরোদের জন্যই। তাঁরই শিষ্য পণ্ডিত রবিশঙ্কর বাজাতেন সেতার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে যে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' হয়েছিল, তাতে সেতার বাজিয়েছিলেন রবিশঙ্কর, তাঁরই সঙ্গে সরোদ বাজিয়েছিলেন আকবর আলী খাঁ এবং তবলায় ছিলেন আল্লারাখা।

ভারতীয় উপমহাদেশে যে বাদ্যযন্ত্রগুলো ছিল বা আছে, তা নিয়েই একটু কথা হয়ে যাক। বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে সেই যন্ত্র, যা সংগীতের উপযোগী শব্দ সৃষ্টি করে। এগুলো ব্যবহার করা হয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতে। সেই বহু আগে সিন্ধু সভ্যতার সময় বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গ ছিল এখানে। বৈদিক যুগে ছিল দুন্দুভি, ভূমি-দুন্দুভি, বেণু, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার।

বাদ্যযন্ত্রকে ভাগ করা হয় 'তত', 'শুষির', 'ঘন' ও 'আনদ্ধ'—এই চার শ্রেণিতে। তারযুক্ত যা, তা ততযন্ত্র। ফুঁ দিয়ে বাজানো হয় যেগুলো, সেগুলো শুষির, ধাতুনির্মিত যন্ত্র ঘন এবং চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে তৈরি যন্ত্রের নাম আনদ্ধ।

মজাটা হচ্ছে তত ও শুষিরযন্ত্র বাজানো যায় গানের সঙ্গে, আবার তা এমনি যন্ত্র হিসেবেও। যেমন : সেতার, সরোদ, বাঁশি। আলাউদ্দীন খাঁর সরোদ বা রবিশঙ্করের সেতার যে শুনেছে, সে-ই বুঝেছে কী অসাধারণ এই যন্ত্রগুলোর ভাষা!

কিন্তু যাকে আমরা ঘন ও আনদ্ধ যন্ত্র বললাম, তা কেবল গান বা অন্য যন্ত্রের সঙ্গেই বাজানো যায়। যেমন তানপুরা, মৃদঙ্গ।

হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণে ঢোল-কাঁসর-শঙ্খধ্বনি থাকবেই। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে সানাই বাজানো হয়, আর হিন্দু বিয়েতে বাজানো হয় সানাই, শঙ্খ, ঢোল, কাঁসর ইত্যাদি। কাড়া-নাকাড়া, শিঙ্গা, দামামা, বিউগল প্রভৃতি যুদ্ধের বাদ্যযন্ত্র।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক ফা-হিউয়েন প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র দেখে এ দেশকে সংগীত ও নৃত্যের দেশ বলেছিলেন। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে নির্মিত পাহাড়পুর-ময়নামতীর প্রস্তরফলক ও পোড়ামাটির চিত্রে নৃত্য ও বাদ্যরত মানুষের মূর্তি পাওয়া গেছে। এতে কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, মৃদঙ্গ, বাঁশি, মৃদ্ভাণ্ড প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের দেখা মেলে।

আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকে রচিত ধর্মপূজার গ্রন্থ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ amarboi.com

শূন্যপুরাণে ঢাক, ঢোল, কাড়া, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ডম্বরু, দুন্দুভি, শঙ্খ, শিঙ্গা, ঘণ্টা, জয়ঢাক, দামামা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে যেসব বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে স্বরমণ্ডল, রুদ্রবীণা, দোতারা, সানাই, শিঙ্গা; করতাল, মন্দিরা, ঘণ্টা, ঝাঁঝর, কাঁসর; আনদ্ধ দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, জয়ঢাক, ডম্বরু, পাখোয়াজ, ভেরি, ঢাক, ঢোল, মর্দল ইদ্যাদি। মঙ্গলকাব্যের যুগ শেষে বীণা, সারিন্দা, তানপুরা, এসরাজ, সরোদ, একতারা, সেতার, সুরমণ্ডল, সুরবাহার, বাঁশি, করতাল, তবলা-বাঁয়া, ঢোলক, শ্রীখোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

মধ্যযুগে ভারতীয় সংগীতকলায় মুসলমানদের অবদান অনেক। সুফি সাধকদের সাধন-ভজনে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল। সানাই ও নহবত-জাতীয় যন্ত্র মুসলমানদেরই আবিষ্কার।

এরপর ইংরেজ এল। পাশ্চাত্য সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব পড়ল। হারমোনিয়াম, বেহালা, গিটার, ফ্লুট, বিউগল ইত্যাদি পাশ্চাত্যের বাদ্যযন্ত্র।

এসব বাদ্যযন্ত্রের বেশির ভাগই এখনো টিকে আছে। সুরের মূর্ছনায় বিবশ করে তুলছে সংগীতপ্রিয় মানুষের মন।

জাহীদ রেজা নূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

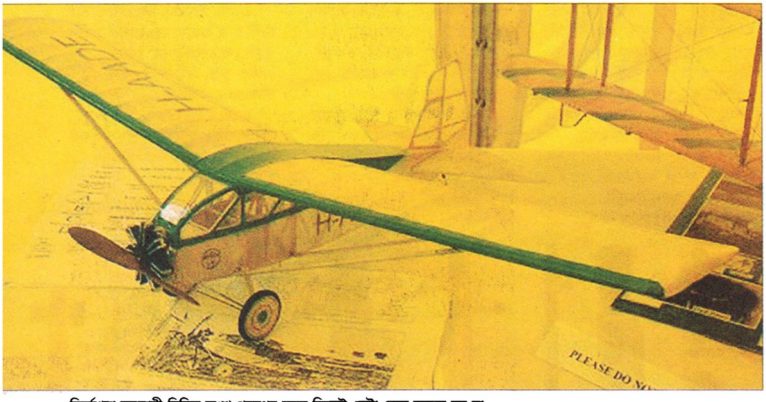

নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন অংশ পরস্পর জুড়ে দিলেই সেটা স্কেল মডেল হয় না

স্কেল মডেলিংয়ের ছোট দুনিয়ায়

ফয়সাল আকরাম

স্কেল মডেলিং হলো বড় আর ছোটর দুনিয়া

পৃথিবীতে কত যে মজার জিনিস আছে। তার মধ্যে অন্যতম মজার একটা জিনিস স্কেল মডেলিং। এ বিষয়টা নিয়ে যাদের অল্পবিস্তর জানাশোনা আছে, তারা ভালোই করে জানে, এটি মজার এক বিষয়। নাম শুনে স্কেল মডেলিং অনেকের কাছে একটু জটিল-কঠিন বিষয় মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। সোজা বাংলায় বলা যায়, কোনো একটা কিছুর মূল জিনিসটার একটা ছোট মাপের রেপ্লিকা বা নকল। এই রেপ্লিকা যত হুবহু হবে, স্কেল মডেলটিও হবে তত সুন্দর। যেকোনো কিছুর স্কেল মডেল হতে পারে। স্থপতিরা কোনো স্থাপনার নকশা করার পর এর যে ছোট্ট মডেল বানান, সেটাও আসলে একটা স্কেল মডেল। মূল স্থাপনার ছোট আকারের প্রতিকৃতি।

সে নাহয় বোঝা গেল, কিন্তু যারা স্থাপত্যবিদ্যায় পড়েনি, তাদের কী উপায়? তাদেরও কোনো চিন্তা নেই। এয়ারফিক্স, রেভেলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারে ছেড়েছে বিভিন্ন ধরনের স্কেল মডেল কিট। এই কিটের মধ্যে থাকে মূল জিনিসটার ছোট ছোট পার্টস, রং, ডিক্যাল ও ইন্সট্রাকশন ম্যানুয়াল। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। ধরো, তুমি বাজার থেকে একটা উড়োজাহাজের স্কেল মডেল কিট কিনলে। তাহলে এই মডেল কিটে তুমি পাবে উড়োজাহাজের ককপিট, ডানা, বডি (যাকে বলা হয় ফিউজলেজ), ল্যান্ডিং গিয়ারসহ বিভিন্ন রকম অংশ। এ ধরনের কিট প্লাস্টিক বা মেটালের হতে পারে। এখন সব অংশ একসঙ্গে জোড়া লাগানোর জন্য আগে সেগুলোকে আলাদা করে নিতে হবে। এরপর কীভাবে কোনটার সঙ্গে কোনটা জোড়া দেবে, সেটার নির্দেশনা পাবে নির্দেশিকা বা ইন্সট্রাকশন ম্যানুয়ালে। এ ছাড়া কোন জায়গায় কী রং আর কী ডিক্যাল বসবে, সেটিও পাবে ম্যানুয়ালে। রং আর ডিক্যালের ব্যাপারে একটু পরে বলছি।

নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন অংশ পরস্পর জুড়ে দিলেই সেটা স্কেল মডেল হয় না। কারণ, পার্টসগুলো সাধারণত এক রঙের (সাদা, নীল বা সবুজ) থাকে। বানানোর পর জিনিসটা দেখলে মনে হবে, মাত্র কারখানা থেকে বের করা হয়েছে, এখনো রং করা হয়নি। আসল জিনিসটার সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক জায়গায় ঠিক শেডের রং দেওয়া এবং সব সাইন, ফ্ল্যাগ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কিং ঠিকঠাক বসালে সেটা স্কেল মডেল হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে রং আর ডিক্যাল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যন্ত্রাংশগুলো লাগিয়ে মডেল বানানোর চেয়ে রং আর ডিক্যালে অন্তত চার গুণ বেশি সময় লাগে।

যে জিনিসটার স্কেল মডেল বানানো হচ্ছে, শুরুতেই সেটার যত বেশিসংখ্যক ছবি আর ডিটেইল খেয়াল করা যায়, স্কেল মডেল তত ভালো হয়। আসলটায় যেখানে যে রং ব্যবহার করা হয়েছে, সেই রঙের শেড ব্যবহার না করলে সেটি সঠিক স্কেল মডেল হয় না। আমাদের চোখ অনেক সংবেদনশীল। আমরা এক নজর দেখলেই একটা ভালো স্কেল মডেল আর আর একটা বাজে স্কেল মডেলের পার্থক্য ধরে ফেলতে পারি। রং ঠিকঠাক করার পর আসে ডিক্যালের ব্যাপার। ডিক্যাল অনেকটা স্টিকারের মতো একটি জিনিস। কিন্তু এর পেছনে স্টিকারের মতো আঠা থাকে না। মডেল কিটের সঙ্গে যেসব ডিক্যাল আসে, সেগুলো পানিতে সক্রিয়। অর্থাৎ পানিতে ভিজিয়ে জায়গামতো লাগিয়ে তারপর ঘষা দিলে নিচের সাদা অংশ উঠে এসে ডিক্যালটা লেগে যায়। স্কেল মডেলের গায়ে লোগো, সাইন, লেটার বা নম্বর মার্কিং ইত্যাদি ফন্ট, আকার, রং ঠিক রেখে দেখাতে হলে ডিক্যালের বিকল্প নেই। কারণ, এগুলো হাতে আঁকতে গেলে জীবনেও আসলটির মতো ভালো হবে না, উনিশ-বিশ হবেই। এমনকি আসল জিনিসটাতেও অনেক জায়গায় কম্পিউটারে নকশাকৃত ডিক্যাল ব্যবহার করা হয়।

নিখুঁত স্কেল মডেল বানানোর জন্য কিছু যন্ত্রপাতি লাগে। যেমন : হবি নাইফ, সিরিশ কাগজ, আঠা। কিন্তু এগুলোর চেয়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ স্কেল মডেল জোগাড় করা। বাংলাদেশে শুধু বসুন্ধরা সিটির মোস্তফা মার্টে এটি পাওয়া যায়। দামটাও একটু বেশি। স্কেল মডেল আসলে কোনো খেলা নয়, এটি আন্তর্জাতিক মানের একটি শখ। আর যেকোনো শখ মেটাতে অর্থ ছাড়াও আরও অনেক কিছুই ব্যয় করতে হয়। ফেসবুকে স্কেল মডেল-বিষয়ক বেশ কিছু গ্রুপ আছে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে সেসব গ্রুপে যোগ দিতে পারো। আর হাতের কাছে গুগল মামু তো আছেই।

কাজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে পার ম্যাগনিফায়িং গ্লাস

স্কেল মডেলিংয়ের কিছু কিছু কাজ দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়

স্কেল মডেলিংয়ের জন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়

AMARBOI.COM

মন খারাপ হলে ডায়েরি লিখি

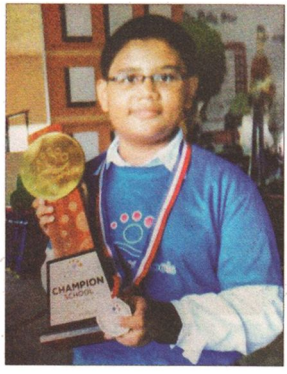

অর্ণব কান্তি সিংহ
সপ্তম শ্রেণি, ব্লু বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিলেট।

২০১৩ সালের কথা। অর্ণবের শরীরটা অসম্ভব খারাপ করেছিল। কোনো কাজই ঠিকমতো করতে পারছিল না। সবাই যখন ওর শরীরের সুস্থতা নিয়ে চিন্তিত, তখন ছেলেটি অংশ নেয় 'বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা'য়। সেখানে সবাইকে তাক লাগিয়ে জিতে নেয় দেশাত্মবোধক গানে প্রথম পুরস্কার। অর্ণব গান করতে ভালোবাসে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত 'জাতীয় গণসংগীত প্রতিযোগিতা'য় সিলেট বিভাগ থেকে সে জিতে নেয় প্রথম পুরস্কার। ঢাকা পর্বেও হয় যুগ্মভাবে প্রথম। শুধু তা-ই নয়, ২০১৫ সালে সে চ্যানেল আই আয়োজিত 'ক্ষুদে গানরাজ' প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম ২৫ জনের মধ্যে জায়গা করে নেয়। বিজ্ঞানমনস্ক অর্ণব ২০১৪ সালে '৩৬তম জাতীয় বিজ্ঞান মেলা'য় অংশ নিয়ে সিলেট বিভাগে প্রথম আর ঢাকা পর্বে চতুর্থ হয়। এখন সে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখে; তাই পড়াশোনাটাও ঠিকমতোই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-২০১৩-তে বৃত্তি লাভ করে ট্যালেন্টপুলে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে কুইজ, আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সে জিতে নিয়েছে স্বর্ণপদকসহ নানা পুরস্কার। অভিনয়ের প্রতি আগ্রহী অর্ণব বর্তমানে একটি ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করছে। তার প্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, প্রিয় বই *ইস্টিশন*। অবসরে ভালোবাসে গল্পের বই পড়তে আর ছবি আঁকতে। মায়ের হাতের সরষে-ইলিশ এই তারকার সবচেয়ে পছন্দের খাবার।

AMARBOI.COM

তোমার স্কুলের সবচেয়ে ভালো লাগা এবং খারাপ লাগা দিক কোনটি?
ভালো লাগা : শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।
খারাপ লাগা : শিক্ষার্থীদের মধ্যে একতার অভাব।

জীবনের অনুপ্রেরণা জোগায় কে?
বাবা ও মা।

যে কাজটি করতে চেয়ে এখনো করা হয়নি?
বাগান করতে চাই, কিন্তু করতে পারি না।

ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে যে স্থানে?
পাহাড় ও গাছপালায় ঘেরা জায়গায়।

প্রিয় ব্যক্তিত্ব?
মাদার তেরেসা।

তোমার স্কুলের মজার কোনো ঘটনা...?
আমি একদিন ভুল করে আমার পাশের বন্ধুর ওপর জলরং ঢেলে দিয়েছিলাম, যখন সে বেঞ্চের নিচে ঝুঁকে কলম খুঁজছিল।

এখন পর্যন্ত তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া কী?
টিভিতে অভিনয় করতে পারা।

টেলিভিশন চ্যানেলে যখন নিজেকে দেখো, তখন কেমন লাগে?
এক্সাইটেড লাগে।

গায়ক অর্ণবের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলে কী করতে?
অবশ্যই অনেক আনন্দিত হতাম। চিন্তা করেই এক্সাইটেড লাগছে।

নিজের যে পাঁচটি প্রিয় বস্তু ছাড়া তোমার চলা অসম্ভব?
বই, কলম, খাতা, হারমোনিয়াম, রংপেনসিল।

মন খারাপ হলে কী করো?
ডায়েরি লিখি।

গ্রন্থনা : **তানজিনা আলম**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানস

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

হাউ টু ট্রেইন ইয়োর ড্রাগন মুভির বার্ক দ্বীপের ভাইকিংদের কথা মনে আছে? ড্রাগনরা যাদের গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে আক্রমণ করত। পরে হিকাপ আর টুথলেসের জাদুতে ড্রাগন হয়ে যায় তাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু আর তারা মুক্তি পায় ড্রাগনের আক্রমণ থেকে। ভাইকিংদের গ্রামে হয়তো আর ড্রাগন আক্রমণ করে না, তবে তোমার গ্রামে কিন্তু যখন-তখনই ড্রাগন আক্রমণ করতে পারে। আবার তুমিও পারো ড্রাগন দিয়েই এর পাল্টা প্রতিশোধ নিতে। খুব অবাক হচ্ছ? বলছিলাম ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানসের কথা।

মোবাইল গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সুপারসেল সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনলাইন গেম এই ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানস মুক্তি দেয় ২০১২-এর আগস্টে। শুরুতে শুধু অ্যাপল ব্যবহারকারীদের জন্য হলেও বছর ঘুরতেই গেমটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য। গুগল প্লে স্টোর আর অ্যাপল অ্যাপস্টোরের সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড করা গেমের তালিকায় গেমটি এখন সবার ওপরে।

গেমটিতে তোমার একটি ভিলেজ বা গ্রাম থাকবে। যার মধ্যমণি হচ্ছে টাউন হল। সঙ্গে থাকবে গোল্ড মাইন, এলিক্সির কালেক্টর, গোল্ড এলিক্সির রাখার স্টোরেজ, ক্ল্যান ক্যাসেল। তোমার মূল্যবান গোল্ড আর এলিক্সির শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষায় থাকবে ক্যানন, মর্টার, উইজার্ড টাওয়ার, এয়ার ডিফেন্স আর নানা ধরনের লুকিয়ে থাকা মাইন, বোমা ও ফাঁদ। এর কোনোটা হয়তো আকাশপথের আক্রমণ রুখে দেবে আবার কোনোটা ভূমির। সঙ্গে পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলার জন্য দেয়ালও আছে।

শুধুই কি তোমার গ্রামেই আক্রমণ হবে? তুমিও আক্রমণ করতে পারবে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানস খেলোয়াড়ের গ্রাম আর নিয়ে আসতে পারবে তাদের গোল্ড আর এলিক্সির। আর তখনই তোমার প্রয়োজন হবে তোমার সৈন্যবাহিনীর। গেমে যাদের বলে ট্রুপস। তাদেরও আবার অদ্ভুত সব নাম। বারবারিয়ান, আর্চার, উইজার্ড, হিলার, পেক্কা, হগ রাইডার, উইচ। সঙ্গে থাকবে নানা রকম জাদুকরি স্পেল। শুরুতেই তো বলেছি ড্রাগনের নাম। আরেকটা খুব পরিচিত নামও কিন্তু আছে এই তালিকায়। *ডেসপিক্যাবল মি* মুভির দুষ্ট মিনিয়নদের তো তোমরা সবাই চেনো। এই গেমেও কিন্তু মিনিয়ন আছে। তবে তারা মোটেই তেমন ভালো, হাসিখুশি দুষ্ট নয়। ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানসের মিনিয়ন উড়তে পারে আর

ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানস গেমের বিভিন্ন ট্রুপস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

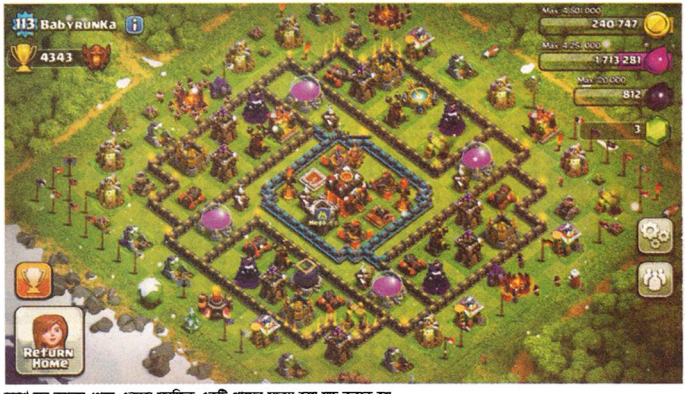

ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানস গেমে এরকম সুরক্ষিত একটি গ্রামের সদস্য হয়ে যুদ্ধ করতে হয়

উড়ে উড়েই প্রতিপক্ষের গ্রাম ধ্বংস করে। এত কিছু কিন্তু তুমি একেবারে খেলার শুরু থেকেই পাবে না। ধীরে ধীরে সবকিছু হালনাগাদ করতে হবে, নতুন নতুন ডিফেন্স আর ট্রুপ আনলক করতে হবে।

ক্ল্যাশ অব ক্ল্যান যারা খেলে তারা ক্ল্যাশার্স নামে পরিচিত। প্রতি ক্ল্যাশার্সই কোনো না কোনো ক্ল্যানের সদস্য। ক্ল্যানের সদস্যরা ক্ল্যানেই নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে আর একে অপরকে ট্রুপ ডোনেটের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকে। গেমের সবচেয়ে অসাধারণ অভিজ্ঞতা 'ক্ল্যান ওয়ার'-এর স্বাদ পেতে হলে অবশ্যই তোমাকে কোনো একটি ক্ল্যানের সদস্য হতেই হবে। ক্ল্যান ওয়্যারে তোমার অন্য কোনো ক্ল্যানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে এক মিলিয়নেরও বেশি ক্ল্যান। তবে ভয় নেই, সুপারসেল নিজে থেকেই এই যুদ্ধ খুঁজে দেয়। প্রায় সমশক্তির দুটি ক্ল্যানকেই মুখোমুখি করে।

সব কথা বলে দিলেই তো আর হবে না। ব্যাপারটা জানতে চাইলে খেলতে হবে গেমটি। ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানস খেলতে তোমার দরকার হবে অ্যান্ড্রয়েড অথবা আইওএস-সমৃদ্ধ একটি স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট সংযোগ। তবে যাদের স্মার্টফোন নেই তাদের মন খারাপ করার কিছুই নেই। পার্সোনাল কম্পিউটারে বা পিসিতে 'ব্লুস্ট্যাকস' সফটওয়্যার নামিয়েও খেলা শুরু করতে পারো। তবে এতে কম্পিউটারের র‍্যাম কিছুটা বেশি হওয়া চাই।

এত এত ভালো কথার সঙ্গে সঙ্গে গেমটি কিন্তু 'টাইমকিলার' নামেও পরিচিতি আছে। অনেকেই এতে আসক্ত হয়ে পড়ালেখা ও দৈনন্দিন কাজের অনেক ক্ষতি করছে। তবে আশা করতেই পারি তোমরা কেউ নিশ্চয়ই এমন করবে না। তাহলে আর দেরি কেন? এখনই শুরু করতে পারো ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানস আর আবিষ্কার করো কোটি ক্ল্যাশার্সের এক রোমাঞ্চকর দুনিয়া।

তোমাদের প্রিয় কিশোর আলোর নামেও কিন্তু ক্ল্যান আছে। কিছুদিন আগে কয়েকজন সদস্য মিলে 'Kishor Alo Gang' নামে একটি ক্ল্যান খুলেছে। ক্ল্যান ট্যাগ : #POCUJCY2 দিয়ে ক্ল্যানটি খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে।

পীয়্যান মুগ্ধ নবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহিদ হাসান অধরা কণার বিজ্ঞানী

মুনির হাসান

গবেষণাগারে সহকর্মীদের সঙ্গে জাহিদ হাসান (ডান থেকে দ্বিতীয়)

জন্মদিনের পাওয়া উপহারগুলো খুলে খুলে দেখছিল ছোট্ট জাহিদ। একটা ছোট্ট কাঁটা ওর সব মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। কাঁটাকে যেভাবেই ঘুরিয়ে দেওয়া হোক না কেন, সেটা সব সময় উত্তর-দক্ষিণ হয়ে থাকে! এরই মধ্যে জাহিদ জেনেছে এটাকে কম্পাস বলে। কিন্তু বুঝতে পারছে না কোন শক্তি এটাকে এভাবে একমুখো করে রেখেছে। খুলে দেখার জন্য জাহিদ কম্পাসের কাঁটাটিকে দুই টুকরো করে ফেলল এবং অবাক হয়ে দেখল দুটো টুকরোই কিন্তু অখণ্ডটার মতো উত্তর-দক্ষিণ হয়ে থাকে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন করে এর রহস্য ভেদ করা যায়?

ছোট্ট জাহিদ জেনে গেল বিজ্ঞানই হলো এই রহস্যভেদের মূলমন্ত্র। তখন থেকেই বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে জাহিদ। কিছুটা এগিয়ে বুঝতে পারে, কেবল পাঠ্যপুস্তকে তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নেই। শুরু হলো বিজ্ঞানের বই সংগ্রহ আর পড়া। সেই যে বিজ্ঞানের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি হলো জাহিদের মনে, সেটিই তাকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নিত্যনতুন সৃষ্টির অন্বেষণে। যে রহস্যময় ও অদৃশ্য শক্তি কম্পাসের কাঁটাকে উত্তর-দক্ষিণ করে রাখে, সে রকম নানা শক্তিই কিন্তু এই জগতের খেলার নিয়মগুলো মেনে চলছে।

কয়েক বছর পর আইনজীবী বাবা রহমত আলী এক ঈদে জাহিদ আর তার দুই ভাইবোনকে ৫০০ টাকা করে দিলেন নিজেদের ইচ্ছেমতো কিছু কেনাকাটা করার জন্য। সময়টা প্রায় ৩০ বছর আগের। কাজেই ৫০০ টাকা কিন্তু অনেক টাকা। টাকা নিয়েই জাহিদের ভাইবোন দৌড়াল মার্কেটে, কাপড়চোপড় কেনার জন্য। কিন্তু ছোট্ট জাহিদ অপেক্ষা করল তার গৃহশিক্ষকের জন্য।

সন্ধ্যাবেলা ঢাকার ২৯ সেন্ট্রাল রোডের ওই বাসায় হাজির হলেন জাহিদের গৃহশিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষার্থী মাহমুদ হাসান। জাহিদের জন্য বিজ্ঞানের বই খুঁজে এনে দেওয়া মাহমুদ সাহেবের আরেকটা কাজ। জাহিদ বাবার দেওয়া ৫০০ টাকা মাহমুদ সাহেবের হাতে দিয়ে বসে পড়ল বিজ্ঞানের বইয়ের তালিকা করতে! এই তালিকার অনেকটা জুড়ে ছিল আবদুল্লাহ আল-মুতীর লেখা বিজ্ঞানের নানান বই।

বিজ্ঞানের জগতের আকর্ষণে একসময় জাহিদের মনে হয় আইনস্টাইন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, সেই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে সে।

শেষ পর্যন্ত সেখানে পড়তে না পারলেও এখন সেখানেই পড়াচ্ছেন জাহিদ হাসান। আইনস্টাইনের মতো প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আমাদের জাহিদ হাসান। মাত্র কয়েক দিন আগে তাঁর

জাহিদ হাসানের লেখা বই

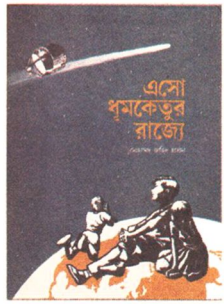

নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী খুঁজে পেয়েছেন ভাইল ফার্মিয়ন নামের কণা। সেই ১৯২৯ সাল থেকেই যে কণার সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা।

স্টিভেন ভাইনবার্গের সাহচর্য

২৯ সেন্ট্রাল রোড থেকে ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুল বেশি দূরের রাস্তা নয়। সেই স্কুলেই জাহিদের পড়াশোনা। স্কুলের বন্ধুদের কাছে জাহিদ 'তাপস' নামেই পরিচিত। আর শিক্ষকেরা জানেন, এই ছেলেটি নিশ্চিতভাবেই এসএসসিতে মেধাতালিকায় স্থান পাবে। যেকোনো গাণিতিক সমস্যা নানান পদ্ধতিতে করতে পারত সে। বিজ্ঞানের কঠিন সব বিষয়ও সহজে বোঝার ক্ষমতা ছিল। তাই ১৯৮৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় মাত্র ২ নম্বর কম পেয়ে যখন ঢাকা বোর্ডের মেধাতালিকায় সে দ্বিতীয় স্থান পেল, তখন তার বন্ধুরা সেটা মেনে নিতে পারেনি। তারা নেমে এল রাস্তায়! তাদের বক্তব্য ছিল বাংলাদেশে জাহিদের চেয়ে ভালো কোনো শিক্ষার্থী নেই। বন্ধুদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতেই যেন ১৯৮৮ সালে ঢাকা কলেজ থেকে কেবল ঢাকা বোর্ড নয়, সব বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে জাহিদ হলো প্রথম। এই সময় যে কেবল পড়েছে তা-ই নয়, জাহিদ নিজেই লিখে ফেলেছে বিজ্ঞানের বই—*এসো ধূমকেতুর রাজ্যে*।

তত দিন আইনস্টাইনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা বেড়েছে অনেকখানি। কিন্তু জায়গা হলো না প্রিন্সটনে। জাহিদ বললেন, 'আমি আইনস্টাইনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলাম না।' কিন্তু সুযোগ পেলেন বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মধ্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী স্টিভেন ভাইনভার্গের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ নিতে জাহিদ ভর্তি হলেন অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্টিভেন ভাইনবার্গের কারণে শুরুর দিকে মহাবিশ্বের জন্ম-মৃত্যুর তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন জাহিদ। তবে বিজ্ঞানী স্টিভেন ভাইনবার্গ জাহিদকে ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানে আগ্রহী করে তোলেন। তাঁর কাছ থেকেই জাহিদ জানতে পারেন, তত্ত্বীয় জগতে নতুন কিছুর সন্ধান যেমন আনন্দের, তেমনি বাস্তব জগতে সেই নতুনকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দও কম নয়। আইনস্টাইনের আলোর তড়িৎ ক্রিয়ায় ব্যবহৃত পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে নতুন এক জগতের সন্ধান পান জাহিদ। ভাইনবার্গের সঙ্গে কাজ করে জাহিদ পাড়ি জমান স্ট্যানফোর্ডে। সেখানেই তাঁর মাস্টার্স আর পিএইচডি। পিএইচডি করার সময় জাহিদ বের করেন কঠিন বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা বের করার একটি কৌশল।

এভাবে জাহিদ ক্রমাগত দক্ষ হয়ে ওঠেন। এই সময়টাতে, মানে ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত জাহিদ স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার এক্সিলারেটর সেন্টারে গবেষণা সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। এই সময় ডাক পেতেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের কাজ সম্পর্কে বলার।

স্বপ্নের আইনস্টাইনের বিশ্ববিদ্যালয়ে

'আমি একটা বক্তৃতা দিতে গিয়েছি প্রিন্সটনে। বক্তৃতা শেষেই তারা আমাকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। আমার তখন এমনকি কোনো জীবনবৃত্তান্তও তৈরি ছিল না। পিএইচডিও শেষ হয়নি।' আরাধ্য স্বপ্ন ধরা দেওয়ার কথা আমাকে বলেছেন এভাবে। 'না' বলার অবস্থা ছিল না। কেবল পিএইচডি শেষ করা বাকি ছিল।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, নিলস বোর, ওপেন হাইমারের স্মৃতিবিজড়িত প্রিন্সটন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিভার্সিটিতে ২০০২ সালে জাহিদ যোগ দেন আরএইচডিকে ফেলো হিসেবে। এটি একটি স্বতন্ত্র ফেলোশিপ। পরে সেখানকার পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দেন। ২০১১ সালেই জাহিদ বিভাগের পূর্ণাঙ্গ প্রফেসর হয়ে যান।

ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞানই জাহিদের কাজের ক্ষেত্র। এরই মধ্যে প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থী তাঁর তত্ত্বাবধানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাই কোনো না কোনো পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন।

এরই মধ্যে জাহিদ হয়ে উঠেছেন এই জগতের একেবারেই সামনের কাতারের বিজ্ঞানী। তাঁর প্রকাশিত শতাধিক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের দুই তৃতীয়াংশই ছাপা হয়েছে *নেচার, ফিজিকস টুডে, সায়েন্স, ফিজিক্যাল রিভিউ*-এর মতো বনেদি, অভিজাত ও বিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকীতে।

টপোলজিক্যাল ভ্যালি

কম্পিউটার, স্মার্টফোনসহ সব ইলেকট্রনিকস সামগ্রীর প্রাণভোমরা ছয় দশক আগে উদ্ভাবিত ট্রানজিস্টার। কিন্তু এরই মধ্যে ট্রানজিস্টার তার কর্মদক্ষতার প্রায় সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। বিজ্ঞানী-প্রকৌশলীরা খুঁজছেন নতুন কোনো বস্তু কিংবা বস্তুর নতুন কোনো অবস্থা যা দ্রুতগতির কম্পিউটিংয়ের সহায়ক হবে এবং পাশাপাশি তাতে শক্তির ক্ষয়ও হবে কম।

ঠিক এমনই 'একটা কিছু' খুঁজে পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, জার্মানি ও সুইডেনের একদল বিজ্ঞানী। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশের অধ্যাপক জাহিদ হাসান। বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত নতুন এই বস্তু-দশার (state of the matter) নাম দেওয়া হয়েছে 'টপোলজিক্যাল ইনসুলেটর' বা 'স্থানিক অন্তরক'। বস্তুর ভেতরে ঋণাত্মক বিদ্যুৎবাহী ইলেকট্রন কণার চলাচলের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা বস্তুকে কয়েক ভাগে ভাগ করেন। যার মধ্যে ইলেকট্রন সহজে চলাচল করতে পারে (পরিবাহী, যেমন তামা), যার মধ্যে পারে না (অন্তরক, যেমন কাঠ) এবং এই দুইয়ের মাঝামাঝি (অর্ধপরিবাহী, যেমন সিলিকন)। অর্ধপরিবাহীর ভেতরে ঋণাত্মক ইলেকট্রনের পাশাপাশি ধনাত্মক চার্জেরও ছোটাছুটি থাকায় এটি হয়ে উঠেছে ইলেকট্রনিকসের মূল উপকরণ। অর্ধপরিবাহী সিলিকনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ডিজিটাল কর্মকাণ্ডের এলাকাটি সিলিকন উপত্যকা নামে পরিচিত। এ ছাড়া রয়েছে অতিপরিবাহী বা সুপার কন্ডাক্টর। অতিপরিবাহীর ভেতর দিয়ে ইলেকট্রন কোনো শক্তি খরচ ছাড়াই চলাচল করতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এখনো কোনো অতিপরিবাহী পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, জাহিদ হাসান বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ, তথা বিসমাথ, থ্যালিয়াম, সালফার ও সেলেনিয়ামের সংমিশ্রণে যে যৌগ তৈরি করেছেন, সেটি এমনিতে অন্তরক। কিন্তু এটির উপরিতলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার জগতে ইলেকট্রন খুবই কম বাঁধার মধ্যে ছোটাছুটি করতে পারে। ফলে এটি হয়ে উঠেছে অতিপরিবাহী। 'এটি একটি বড় বিষয়।' বলেন জাহিদ হাসান। 'কারণ দেখা যাচ্ছে আগের বিসমাথ-নির্ভর বস্তুর তুলনায় নতুন এই বস্তুতে ইলেকট্রন প্রায় ১০ হাজার গুণ বেশি গতিতে চলাচল করতে পারছে।'

১৯৯৭ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ফিলিপ অ্যান্ডারসনের মতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। কেবল তত্ত্বের কারণে নয়, বরং এর কারিগরি দিকটিও তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে অনেক দিন ধরে তত্ত্বীয় পর্যায়ে থাকা

সপরিবারে বিজ্ঞানী জাহিদ হাসান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিন্সটনে বিখ্যাত তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড উইটেনের সঙ্গে জাহিদ হাসান

প্রিন্সটনে নোবেলজয়ী তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানী ফিলিপ ওয়ারেন অ্যান্ডারসনের সঙ্গে

কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করা যাবে।

জাহিদ হাসান আরও বলেন, 'কেবল কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের নতুন জোয়ার নয়, এর ফলে বস্তু জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে যেখানে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কাজ করে, সেটির অধ্যয়নও আলাদা গতি পাবে।' যেহেতু কার্যকর তাপমাত্রায় এটি বানানো যাবে। শুরু হবে এক নতুন ইলেকট্রনিকসের যুগের। যার কেন্দ্রে থাকবে এই স্থানিক অন্তরক। হয়তো তখন সিলিকন ভ্যালির নাম পাল্টে হবে টপোলজিক্যাল ভ্যালি।

৮৫ বছর পর অধরা কণার খোঁজ

দুনিয়ার সব বস্তুকণাকে বিজ্ঞানীরা দুই দলে ভাগ করেন। এক দলের নাম বসু কণা বা বোসন। আলোর কণা ফোটন এই দলের অন্তর্ভুক্ত। এই কণাগুলো বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সমীকরণ বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে। সেই তত্ত্বানুযায়ী, ২০১২ সালে বিজ্ঞানীরা এই দলের অন্যতম সদস্য হিগস বোসন, যা ঈশ্বর কণা নামে পরিচিত, তা খুঁজে পান।

অপর দলটিকে বলা হয় ফার্মিয়ন বা ফার্মি কণা। পরমাণুর গঠন-কণা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন হলো ফার্মি-কণা। এগুলো বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি ও.পল ডিরাকের ফার্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন মেনে চলে। ইলেকট্রন, প্রোটনসহ জানা প্রায় সব ফার্মিয়নের নিজস্ব ভর আছে। এগুলো বৈদ্যুতিক চার্জও বহন করতে পারে বা চার্জ নিরপেক্ষও হতে পারে। কিন্তু ১৯২৯ সালে গণিতবিদ ও পদার্থবিদ হারম্যান ভাইল ভরশূন্য কিন্তু বৈদ্যুতিক চার্জ বহনকারী ফার্মি-কণার ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং দাবি করেন এমন কণা বাস্তবে রয়েছে। পরে বিজ্ঞানীরা তাঁর নামেই এর নামকরণ করেন ভাইল ফার্মিয়ন। জাহিদ হাসান জানালেন, মোট তিন ধরনের ফার্মিয়নের মধ্যে ডিরাক ও মাজোরানা নামের বাকি দুটি ফার্মিয়ন বেশ আগেই আবিষ্কার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীরা ভাবছিলেন, মৌল কণা নিউট্রিনোই সম্ভবত ভাইল ফার্মিয়ন। কিন্তু ১৯৯৮ সালে আবিষ্কৃত হয় নিউট্রিনোরও ভর আছে। তখন থেকে আবার ভাইল ফার্মিয়নের খোঁজ শুরু হয়। অবশেষে জাহিদের নেতৃত্বে প্রিন্সটনের বিজ্ঞানীরা সেই ভাইল ফার্মিয়নের খোঁজ পান।

ভরশূন্য হওয়ার কারণে ধারণা করা যায়, ভাইল ফার্মিয়ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে বর্তমান অর্ধপরিবাহী ইলেকট্রনিক সামগ্রীর তুলনায় কমপক্ষে এক হাজার গুণ বেশি গতিতে চলাচল করতে পারবে। ভাইল ফার্মিয়নের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি একই সঙ্গে চৌম্বকের একক মেরু (মনোপোল) এবং বিপরীত একক মেরুর (অ্যান্টি-মনোপোল) বৈশিষ্ট্য বহন করে। অর্থাৎ, এর ফলে পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেগুলো ইলেকট্রনের মতো ছড়িয়ে পড়ে না, বরং সামনের দিকে তাদের গতি বজায় রাখে। ইলেকট্রনিকসের ভেতরে ইলেকট্রনের যে ট্রাফিক জ্যাম হয়, এখানে সেটা হবে না। ব্যাখ্যা করলেন জাহিদ। জাহিদের আশাবাদ, এর মাধ্যমে সূচিত হবে নতুন ধরনের ইলেকট্রনিকস, যাকে আমরা বলছি ভাইলোট্রনিকস।

দীর্ঘদিন ধরে ফার্মিয়ন নিয়ে কাজ করছেন কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী আন্তন ভার্খব। একটি আন্তর্জাতিক জার্নালে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উচ্ছ্বসিত ভার্খব বলেন, তত্ত্বীয় জগতের জিনিসপত্র বাস্তব জগতে খুঁজে পাওয়ার মতো আনন্দের বিষয় আর কিছু নেই।

জাহিদ হাসানের গবেষক দল এই কণাকে খুঁজে পেয়েছে একটি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

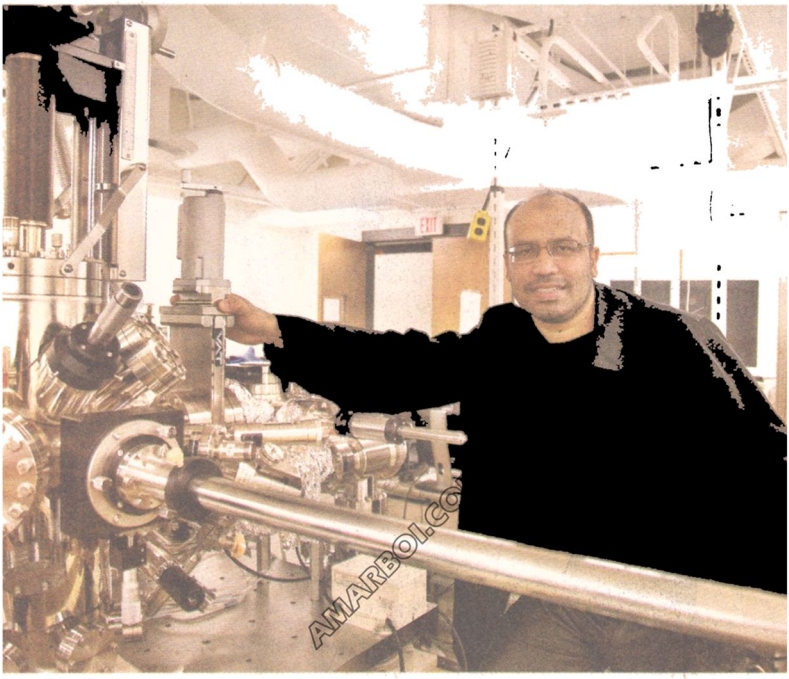

গবেষণাগারে জাহিদ হাসান

যৌগিক কেলাসের মধ্যে এবং কেলাসেই কেবল এটিকে পাওয়া যায়। তবে হিগস বোসনের সঙ্গে ভাইলের পার্থক্য হচ্ছে হিগস বোসনের অস্তিত্ব কেবল কণা ত্বরকেই (হ্যাড্রন কলাইডার) পাওয়া যায়। কিন্তু ভাইল ফার্মিয়ন দিয়ে বানানো যাবে নতুন ও কার্যকর কম্পিউটিং ডিভাইস। তবে জাহিদ হাসানের ধারণা নিত্যব্যবহারের ভাইলোট্রনিকসের জন্য আমাদের আরও ১০ থেকে ২০ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

নতুনদের জন্য

মাইক্রোসফট করপোরেশনে কর্মরত স্ত্রী প্রকৌশলী সারাহ আহমেদ, ছেলে আরিক ইব্রাহিম ও মেয়ে সারিনা মরিয়মকে নিয়ে জাহিদের সংসার। শিকড়ের টানে যুক্ত আছেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা বোর্ডে। সুযোগ পেলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার আগ্রহ রয়েছে জাহিদের। তবে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তোলা। এ কাজ করতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরে জাহিদ হাসানের এই প্রত্যয় হয়েছে যে আমাদের শিশু-কিশোরদের মেধা বিশ্বমানের। কাজেই তাদের সাফল্যের ব্যাপারে তিনি খুবই আশাবাদী।

কম্পাসের কথা এখনো ভোলেননি তিনি। এখনো ভাবেন, ছোট্ট কম্পাস যেভাবে তাঁকে আগ্রহী করে তুলেছে বিজ্ঞানে, তেমনি নতুনদের বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তোলার জন্য কাজ করে যাবেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরে কণাবিজ্ঞানে যুক্ত হয়ে যাওয়া বাংলার বিজ্ঞানী জাহিদ হাসান।

কিশোর আলোর পড়ুয়াদের জন্য জাহিদের পরামর্শ, 'তুমি পারবে—নিজের ওপর এই বিশ্বাস স্থাপন করো। কিসে তুমি আনন্দ পাও, কোনটা তোমার ভালো লাগে, সেটা খুঁজে বের করো। নিজের একটা লক্ষ্য ঠিক করে সেটার জন্য এগিয়ে যাও। পদে পদে বাধা আসবে, কিন্তু তোমার আশপাশের লোকের জ্ঞান-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সামনে এগিয়ে যাও। তোমার মতো যাদের লক্ষ্য, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করো। কঠিন পরিশ্রম করো। তবে সেই সঙ্গে ভারসাম্যটাও ঠিক রেখো, যাতে তোমার জীবন অর্থপূর্ণ হয়। তাহলেই একদিন তুমি তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াহিদ ইবনে রেজা

আমিও কাজ করি হলিউডে

স্যুটস তারকা প্যাট্রিক জে অ্যাডামসের সঙ্গে লেখক (বামে)

ঢাকায় আমার দিনকাল মোটামুটি ভালোই যাচ্ছিল। একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থায় চাকরি করি, সুযোগ পেলেই *উন্মাদ*-এর অফিসে গিয়ে পড়ে থাকি, বই পড়ি, গান শুনি। ফুর্তিময় জীবন বলতে আসলে যা বোঝায় সবই আছে। কিন্তু এর মধ্যেই আমার মাথায় চাপল সিনেমা বানানোর ভূত। মনে হলো দারুণ একটা ছবি বানিয়ে সবাইকে যদি চমকেই দিতে না পারলাম, তবে জীবন বৃথা। মোটামুটি হুট করে নেওয়া সিদ্ধান্তে চলচ্চিত্র বানানো নিয়ে পড়তে চলে এলাম কানাডা। প্রতিদিনই দারুণ দারুণ জিনিস শিখি আর হাত নিশপিশ করতে থাকে কিছু বানানোর জন্য। এর মধ্যেই বানিয়ে ফেললাম একটা ভিডিও। সেটা দেখানো হলো বিখ্যাত টিভি হোস্ট কোনান ও'ব্রায়ানের টক শো 'কোনান'-এ। এরই মধ্যে চলে এল সেকেন্ড ইয়ার। আমি ইন্টার্ন শুরু করলাম বিখ্যাত এনবিসি-ইউনিভার্সাল-এর শো 'স্যুটস' এবং 'ডিফায়েন্স'-এ। ফাইনাল ইয়ারে নিজেই বানালাম *হোয়াট অ্যাম আই ডুয়িং হেয়ার* নামে একটা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। মোটামুটি নামকরা একটা চলচ্চিত্র উৎসবে ছোটখাটো পুরস্কারও পেল এটি। আমার চোখে তখনো হলিউডের চলচ্চিত্র কাজ করার স্বপ্ন। এ দেশে বড় সিনেমাগুলোর সেটে কাজ করতে হলে ইউনিয়নের মেম্বার হতে হয়। আর ইউনিয়নের মেম্বার হওয়া যায় শুধু কানাডিয়ান হলে। আমি যেহেতু বাংলাদেশি, আমার সেই সুযোগ নেই। তখন খোঁজ নিয়ে জানলাম, অ্যানিমেশন ও ভিএফএক্স স্টুডিওগুলোতে ইউনিয়নের ঝামেলা নেই। যোগ্যতা থাকলেই চাকরি পাওয়া সম্ভব। তো, আমার সেই

ছবি শেষ না হতেই পল ওয়াকারের মৃত্যুর পর সিনেমাটা সিজি ডাবলের মাধ্যমে শেষ করেন তার দুই ভাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

াকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও বাঙালি
ংস্কৃতির ওপর দমননীতির অঙ্গ হিসেবে
বীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি তাঁর
রুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬১ সালে
বীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে তিনি 'সাংস্কৃতিক
াধিকার আন্দোলন' পরিচালনা করেন। ১৯৬৯
ালে 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' (বর্তমানে
ংলাদেশ মহিলা পরিষদ) গঠিত হলে তিনি
ার প্রতিষ্ঠাতাপ্রধান নির্বাচিত হন। আজীবন
তনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সুফিয়া
ামালের দুই মেয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন।
ারতের আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধাদের সেবার
ন্য একটি হাসপাতাল করা হলে তাঁরা সেখানে
াজ করেন। সুফিয়া, তাঁর স্বামী ও ছেলে দেশে
িলেন। যুদ্ধকালীন তিনি 'একাত্তরের ডায়েরি'
ামে একটি দিনলিপি রচনা করেন। এ সময়ে
লখা তাঁর কবিতাগুলো পরবর্তীকালে *মোর
াদুদের সমাধি 'পরে* নামে প্রকাশিত হয়।
কবিতাগুলোতে তিনি বাঙালিদের ওপর
াকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা বর্ণনা করেন।

স্বাধীনতার পরেও সুফিয়া কামাল অনেক
ংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। তিনি
যসব সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানের দায়িত্ব
ালন করেন সেগুলো হলো বাংলাদেশ মহিলা
ুনর্বাসন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন কমিটি
বং দুস্থ পুনর্বাসন সংস্থা। এ ছাড়া তিনি
য়ানট, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এবং
ারীকল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী ছিলেন।

কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭) সুফিয়া কামালের
ল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। *মায়া কাজল* (১৯৫১),
ান ও জীবন (১৯৫৭), *উদাত্ত পৃথিবী* (১৯৬৪),
অভিযাত্রিক (১৯৬৯) তাঁর উল্লেখযোগ্য বই।
াঁর কবিতা চীনা, ইংরেজি, জার্মান, ইতালিয়ান,
পালিশ, রুশ, ভিয়েতনামিজ, হিন্দি ও উর্দু
ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ২০
ভেম্বর তিনি মারা যান।

বিস্তারিত : gunijan.org.bd

সুফিয়া কামালের কবিতা
আজিকার শিশু

আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা
তোমরা এ যুগে সেই বয়সে লেখাপড়া কর মেলা।
আমরা যখন আকাশের তলে ওড়ায়েছি শুধু ঘুড়ি
তোমরা এখন কলের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি।
উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু সব তোমাদের জানা
আমরা শুনেছি সেখানে রয়েছে জিন, পরী, দেও, দানা।
পাতালপুরীর অজানা কাহিনী তোমরা শোনাও সবে
মেরুতে মেরুতে জানা পরিচয় কেমন করিয়া হবে।
তোমাদের ঘরে আলোর অভাব কভু নাহি হবে আর
আকাশ-আলোক বাঁধি আনি দূর করিবে অন্ধকার।
শস্য-শ্যামলা এই মাটি মা'র অঙ্গ পুষ্ট করে
আনিবে অটুট স্বাস্থ্য, সবল দেহ-মন ঘরে ঘরে।
তোমাদের গানে, কল-কলতানে উছসি উঠিবে নদী—
সরস করিয়া তৃণ ও তরুরে বহিবে সে নিরবধি
তোমরা আনিবে ফুল ও ফসল পাখি-ডাকা রাঙা ভোর
জগৎ করিবে মধুময়, প্রাণে প্রাণে বাঁধি প্রীতিডোর।

াসি রাশি রাশি

 ছেলে বাবার
কাঁধে বসে চুল
টানছে।
াবা : খোকা, চুল
টানা বন্ধ করো।
খোকা : চুল টানছি
া তো বাবা, আমার
চুইংগামটা ফেরত
নেওয়ার চেষ্টা
করছি!

■ খেলার মাঝপথে এক ফিল্ডারকে বললেন আম্পায়ার, 'অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি। এখন আর না বলে পারছি না। তুমি ব্যাটসম্যানকে ভেংচি কেটে বিরক্ত করছ কেন?'
ফিল্ডার : আমিও অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি। এখন আর না বলে পারছি না। ক্রিজে কী হচ্ছে, সেদিকে আপনার একেবারেই মনোযোগ নেই!

■ যুক্তিবিদ্যার ক্লাস চলছে।
শিক্ষক : আমি টেবিলটা ছুঁয়েছি, টেবিলটা মাটি ছুঁয়েছে, সুতরাং আমি মাটি ছুঁয়েছি। এভাবে একটা যুক্তি দেখাও তো।
ছাত্র : যেমন ধরুন স্যার, আপনি মুরগি খেয়েছেন। মুরগি কেঁচো খেয়েছে। সুতরাং আপনি কেঁচো খেয়েছেন।

■ শিক্ষক : বলো তো হাতি কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়?
ছাত্র : হাতি কখনো খুঁজতে হয় না। হাতি এত বড় যে কখনো হারায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউ হরাইজনের যাত্রাচিত্র

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

...্যালো প্লুটো!

...র, মঙ্গল পেরিয়ে সৌরজগতের সীমার শেষে বামন গ্রহ প্লুটোর আকাশে পৌঁছেছে মানুষের খেয়া নিউ হরাইজন। ...থিবী থেকে ৪০০ কোটি মাইল দূর এলাকায় বাস প্লুটোর। বামন গ্রহ না গ্রহ—দুই মতে বিভক্ত পৃথিবীবাসীর বার্তা ...য়ে নিউ হরাইজন পৌঁছে প্লুটোর দারুণ এক ছবি পাঠিয়েছে নভোযানটি। ছবিতে দেখা গেছে, বামন সেই গ্রহের ...ক বেশ কিছু বরফে ঢাকা পর্বত আছে। আমাদের গারো পাহাড়ের দ্বিগুণ উচ্চতার সমান সেই পর্বতগুলো। নিউ ...াইজনের পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, প্লুটোর পৃষ্ঠতলে মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড ও নাইট্রোজেন ...রফের হালকা আবরণও আছে। নিউ হরাইজন খেয়াযানটি ২০০৬ সালে যাত্রা করে প্লুটোর দিকে। ১০ বছরে প্রায় ...৮০ কোটি কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ১৪ জুলাই প্লুটোর সান্নিধ্য পায় নিউ হরাইজন। সাড়ে ১২ হাজার কিলোমিটার ... থেকে প্লুটোর ছবি তোলে খেয়াযানটি। ভালো কথা, মার্কিন জ্যোতির্বিদ ক্লাইড টমবার ১৯৩০ সালে প্লুটো ...বিষ্কার করেছিলেন। তাঁর সম্মানে নিউ হরাইজনের ছোট বাক্সে টমবারের দেহভস্ম রক্ষিত পাঠানো হয়েছে ...টোতে। তথ্যসূত্র : নাসা, স্পেস ডট কম

AMARBOI.COM

বুবলিদের এক বিকেল

AMARBOI.COM

আনিসুল হক

আম্মু, তোমার চুল কাটাটা ভালো হয়েছে। তোমাকে সুন্দর লাগছে।

থ্যাংক ইউ।

অবশ্য তুমি এমনিতেই সুন্দর। আগেও তোমাকে ভালো লাগত।

হঠাৎ তুই আমার এত প্রশংসা করছিস যে! ঘটনা কী, বল তো বুবলি।

না না, আমি বুঝি তোমার প্রশংসা করি না, আম্মু। কালকে যে তুমি ফ্রায়েড রাইস রাঁধলে, আমি কত প্রশংসা করলাম না। আব্বুই তো বরং বলল, লবণ কম হয়েছে। আমি বলেছি?

হুম। লবণ তো কম হয়েইছিল।

কে বলেছে? একদম ঠিক হয়েছিল। আম্মু, শোনো, আমার বন্ধুরা সবাই মিলে ঠিক করেছে সিনেমা দেখতে যাবে সিনেপ্লেক্সে। আমি যাই, মা!

কী সিনেমা?

আরে অনন্ত জলিলের একটা সিনেমা।

তুই বাংলা সিনেমা দেখিস?

দেখি না। এইটা দেখব। হেব্বি জোশ। সবাই মিলে দেখলে অনেক ফান হবে।

কে কে যাবে?

পড়শি যাবে, নাম্নু, শুক্লা, আইভি, বুশরা, নাসিম, আলভি...

ঠিক আছে। যাস।

টিকিটের দামটা কিন্তু তুমি দেবে।

তোর আব্বু দেবে না?

আব্বুর কাছ থেকেও নেব। ওইটা দিয়ে ডিনার করব।

ডিনার করবি মানে? কটায় সিনেমা ভাঙবে।

নটায়।

রাতে সিনেমা দেখার দরকার কী? দিনে দেখ।

সবাই ঠিক করেছে নাইট শো দেখবে। আমি কেমন করে বলব দিনে দেখতে?

তাহলে আমি তোর সঙ্গে যাব?

কী বলো। আমরা বাংলা সিনেমা দেখব আর তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে মানে?

হ্যাঁ। অসুবিধা কী?

আছে অসুবিধা। আমি যাবই না।

কেন যাবি না?

কারও গার্জিয়ান যাবে না। তুমি কেন যাবে?

কারণ তুই ছোট। ক্লাস সিক্সে পড়া একটা মেয়েকে আমি রাত্রিবেলা ছাড়ব না।

অন্যরা তো ছাড়বে।

মা রে, এইটা আমাদের ফ্যামিলির ভ্যালুসের ব্যাপার। মূল্যবোধ। আমরা তো বন্ধুর মতো মিশি। তুই আমার চুল কাটার প্রশংসা করিস। আমি কোন নায়ক হ্যান্ডসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

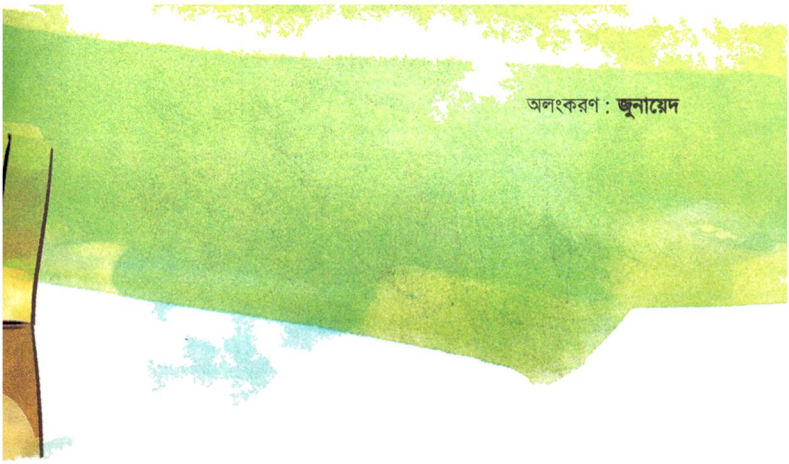

অলংকরণ : **জুনায়েদ**

ান নায়ক খ্যাত তোর সঙ্গে শেয়ার করি।
াবার তোর সেফটি সিকিউরিটি নিয়েও
নশনে থাকি। পত্রিকা খুললেই কত খারাপ
বর দেখতে হয়। বাবা-মা সব সময়
লেমেয়েদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করে।

কিন্তু আমি তো বড় হয়েছি।

হ্যাঁ। তুই বড় হয়েছিস। আরও বড় হবি।
র আমিও তো বড় হয়েছি। কিন্তু তোর নানির
ছ থেকে এখনো আমি পরামর্শ নিই। তিনিও
মাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন। টেনশন
রেন। এটা খারাপ কিছু না।

কিন্তু মা, আমি কি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি?

যা। এক কাজ কর। তোর ছোট মামাকে
ঙ্গে নিয়ে যা। ছোট মামা এমনভাবে যাবে
ন হবে হঠাৎ দেখা হয়েছে। তুই সবার সঙ্গে
রিচয় করিয়ে দিবি। এইটা আমার ছোট
মা।

মা, তুমি আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগাচ্ছ।

না, আমরা একটা ফান করছি। মজা।
খা যাক, তোর মামা কেমন অভিনয় পারে।
তো আবার মঞ্চে নাটক করে।

আচ্ছা। মামা যদি কাঁচা অভিনয় করে,
বাই যদি বুঝে যায়, তুমি আমার পেছনে
কটিকি লাগিয়ে রেখেছ, তাহলে কিন্তু দেখো।

তাহলে তোর মামাকে বলব, তোকে একটা
েস্টশন কিনে দিতে হবে।

আচ্ছা। তাহলে রাজি।

থ্যাংক ইউ, মা। আসলে আমি চাই
লেমেয়েরা একসঙ্গে মিশুক। বড় হোক।
াহলে তারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে।
াবার এও চাই, কতটুকুন ভালো, কতটুকুন
মন্দ সেটা তারা নিজেরাই বুঝতে শিখুক। কিন্তু
কোনো বিপদে যেন তারা না পড়ে, সেটা তো
মা হিসেবে আমাকে দেখতেই হবে।

আবার আমিও তো একটা পারসন। ছোট
হতে পারি, আমারও তো মত আছে। সেটাও
তোমাদের বুঝতে হবে আম্মু।

নিশ্চয়ই। তোর মতকে আমি অনার করব।
আমারটা তুই অনার করবি। এইভাবেই তো
চলতে হবে।

এমন সময় দরজায় নক...মা গো দুই ডলার
ভিক্ষা দেন না। বিদেশ যামু...

কে এইটা। মডার্ন ফকির? দরজা পর্যন্ত
চলে এল কীভাবে?

বুবলি আর মা এগিয়ে যান দরজায়। কি
হোল দিয়ে দেখেন, বিশাল দাড়ি-গোঁফওয়ালা
এক আগন্তুক।

কে আপনি? এই গেট পর্যন্ত এলেন
কীভাবে? মা চিৎকার করে ওঠেন।

আমি ডিসকো ফকির। আমেরিকা যামু।
ডলার ভিক্ষা দেন।

বুবলি ছুটে যায় ইন্টারকম ফোনে। গেটের
দারোয়ানকে ফোন করতে।

এই সময় আগন্তুক তার দাড়ি-গোঁফ খুলে
ফেলে।

মা দেখেন, এটা বুবলির ছোট মামা তপন।
তিনি হাসতে থাকেন হো হো করে। দরজা
খুলে দিলে মামা আবার দাড়ি-গোঁফ পরে নিয়ে
হাঁক পাড়েন, দুইটা ডলার দেন মা...বুবলি
চিৎকার করতে থাকে।

সহযোগিতায় UNFPA

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও একটা সিরিজ জয়। এ নিয়ে টানা চারটি ওয়ানডে সিরিজে এভাবে 'উইনার' লেখা বোর্ডের পেছনে ট্রফি হাতে দাঁড়াল বাংলাদেশ দল

স্বপ্নযাত্রা চলছেই

কখনো কখনো সত্যি ঘটনাও অবিশ্বাস্য মনে হয়। চোখ কচলে তাকাতে হয়। চিমটি কেটে দেখতে ইচ্ছে করে যা ঘটছে, সব কি সত্যি, না কল্পনা!

প্রথমে পাকিস্তান, এরপর ভারত। না, সেখানেই থামল না স্বপ্নযাত্রা। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলকেও ওয়ানডে সিরিজে হারাল বাংলাদেশ। সেটিও সিরিজে পিছিয়ে পড়ে, শেষ দুটো ম্যাচ জিতে।

ভারতের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডের পর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেও টানা তিন ম্যাচ হেরেছিল বাংলাদেশ। দুটো টি-টোয়েন্টির পর প্রথম ওয়ানডেতেও। শুধু হার নয়, বাংলাদেশের খেলায় লড়াইয়ের ছাপও ছিল না। এমন হলে যা হয়, চারদিকে কানকথা। কী এমন হলো হঠাৎ ছন্দ হারিয়ে ফেলল বাংলাদেশ দল!

সিরিজে পিছিয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন, তিন ম্যাচের সিরিজে চাপ আরও বেশি। সেখানে চাপের সঙ্গে বাড়তি বোঝা হয়ে পাল্লাটা ভারী করেছিল টানা চার ম্যাচ হারার পর নানা সমালোচনা।

এ দিক দিয়ে দেখলে সেই চারটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ হেরে যাওয়া বাংলাদেশ দলের জন্য শাপে বর হয়েই এসেছিল। চাপের মুখেও যে নিজেদের সেরাটা বের করে আনা যায়, সেটাও তো দেখিয়ে দিল মাশরাফি-বাহিনী।

শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশ একেবারে নাস্তানাবুদ করেই হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে গিয়েছিল মাত্র ১৬২ রানে। শেষ ম্যাচে ৯ উইকেটে তুলতে পেরেছিল ১৬৮। প্রথমে ৭ উইকেটে জিতে ১-১ সমতা ফেরায় বাংলাদেশ। সিরিজ জয়ের পথে মনে হচ্ছিল ১০ উইকেটেই জিতে যাবে দল। নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে বাংলাদেশ কখনোই সব উইকেট হাতে রেখে ম্যাচ জেতেনি। কিন্তু একটুর জন্য সেটি হয়নি।

দুটো ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে অল্পতেই গুটিয়ে ফেলার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশের বোলাররা। সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে। তবে শেষ দুটো ওয়ানডেতেই ব্যাট হাতে নায়ক হয়ে গেছেন সৌম্য সরকার। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৭৯ বলে ৮৮ রান করেছেন। তৃতীয় ম্যাচে ১৭০ রানের মামুলি লক্ষ্যে সেঞ্চুরি প্রায় তুলেই নিয়েছিলেন। কিন্তু ৭৫ বলে ৯০ রান করে আউট হয়েছেন।

নব্বইয়ে কেউ আউট হলে তাকে বলে 'নার্ভাস নাইনটিজ'। তবে দুটো ম্যাচেই ৯০ বা প্রায় ৯০ রানের দুটো ইনিংস খেলার পথে একটি মুহূর্তের জন্যও কিন্তু সৌম্যকে 'নার্ভাস' মনে হয়নি। দুটো ম্যাচেই ১৩টি করে চার ও একটি করে ছক্কা মেরেছেন। তাঁর মারকুটে ব্যাটিং, সেই সঙ্গে প্রথমে মাহমুদউল্লাহ ও শেষ ম্যাচে তামিমের যোগ্য সংগতে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদেরই মনে হচ্ছিল নার্ভাস।

সৌম্য নামের অর্থ যে কিনা খুব শান্ত, ধীরস্থির। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা সৌম্য নামের অর্থটা জেনে গেলে কিন্তু আপত্তিই করে বসবে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌম্যর সেই 'পেরিস্কোপ'

সৌম্যর 'পেরিস্কোপ'

পেরিস্কোপ যন্ত্রটাকে নিশ্চয়ই চেনাতে হবে না। কিন্তু এই পেরিস্কোপকে ক্রিকেট অভিধানে ঢোকালেন সৌম্য, অসমসাহসী এক শট নিয়মিত খেলে।

বিশেষ বিশেষ খেলোয়াড়কে আলাদা করে চেনায় কিছু শট থাকে। মুশফিকুর রহিমের প্রিয় শট যেমন স্লগ সুইপ। অবশ্য এ শটের আবিষ্কারক তিনি নন। যেটা বলা যায় মহেন্দ্র সিং ধোনির 'হেলিকপ্টার' শটের বেলায়। সাকিব বিখ্যাত করেছেন 'সুপারস্কুপ'কে। স্কুপ খুব ভালো খেলতেন আশরাফুলও। ২০০৭ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয় এনে দেওয়া ইনিংসে দুর্দান্ত কিছু স্কুপ খেলেছিলেন।

সেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আরও সাহসী শট খেলে আলোচনায় এলেন সৌম্য। প্রায় মুখ বরাবর ধেয়ে আসা বাউন্সারকে পেছনের দিকে ধনুকের মতো বেঁকে ব্যাটের আলতো ছোঁয়ায় উইকেটকিপারের মাথার ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দেন। তৃতীয় ওয়ানডেতে এই শটে চার মেরে তাক লাগিয়ে দেন।

মজার ব্যাপার হলো শটটি সৌম্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার দিনেই খেলেছিলেন। গত ডিসেম্বরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের পঞ্চম ম্যাচে, চাতারার বলে। কিন্তু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের চোখ ওই সিরিজে ছিল না। আরও মজার ব্যাপার, পেরিস্কোপ প্রথম আলোচনায় আসে যখন, সৌম্য ঠিকমতো বলটি লাগাতেই পারেননি!

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে এ শটটি খেলার চেষ্টা করেছিলেন। সেটিতে সফল না হলেও ওই শটের ছবিটা আইসিসি তাদের টুইটার পেজে দিনের সেরা শট হিসেবে পোস্ট করে। ক্যাপশনে লেখে, 'ধোনি যেমন "হেলিকপ্টার"-এর জন্য সুখ্যাত হয়েছেন, সৌম্য কি তেমনভাবে "পেরিস্কোপ"-এর জন্য সুপরিচিত হতে পারবেন?'

সৌম্য পেরেছেন। এবং এই পারার মধ্যে আছে আরও একটা গল্প। আগে ফাস্ট বোলারদের বাউন্সার মানে ছিল বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের জন্য আতঙ্ক। দক্ষিণ আফ্রিকারই বিপক্ষে বেশ আগে এমনই এক বাউন্সার 'ডাক' করতে গিয়ে ব্যাটটা নিচে নামাতে ভুলে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের এক ব্যাটসম্যান। উল্টো খাড়া করে ধরে রেখেছিলেন। সেই বাউন্সার খাড়া হয়ে থাকা ব্যাটে লেগে ক্যাচ হয়ে যায়। ভাষ্যকার ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, ব্যাটটা ব্যাটসম্যান যেন পেরিস্কোপের মতো করে ধরেছেন!

একসময় এই 'পেরিস্কোপ' ছিল লজ্জার প্রতিশব্দ। ধেয়ে আসা বাউন্সারকে ঠিকমতো সামলাতে না পারার উদাহরণ। সেটিই সৌম্য রূপ দিয়েছেন গর্বে। সাহসী সুন্দর বুঝি একেই বলে!

AMARBOI.COM

মাশরাফি-সাকিবের 'ডাবল সেঞ্চুরি'

কে আগে? মাশরাফি, নাকি সাকিব? প্রিয় বন্ধুটার সঙ্গেও 'কম্পিটিশন' হয় না, কে বেশি মার্কস তুলতে পারে, এ যেন অনেকটা সে রকমই। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ মাশরাফি-সাকিব দুজনই ছিলেন ওয়ানডেতে ২০০ উইকেটের মাইলফলকের সামনে। দুজনের নামের পাশেই ছিল ১৯৮ উইকেট।

দুজনের ভক্তরা তাকিয়ে ছিলেন, কে ফার্স্ট হয়? সাকিবই আগে ছুঁলেন। এরপর মাশরাফিও। দুজনই একই ম্যাচে, তৃতীয় ওয়ানডেতে। বাংলাদেশের হয়ে এর আগে ২০০ উইকেট ছিল কেবল আবদুর রাজ্জাকের। ওয়ানডে ইতিহাসে সাকিবের আগে মাত্র তিনজন বাঁহাতি স্পিনার পেয়েছেন ২০০ উইকেট। বাংলাদেশের রাজ্জাক ছাড়াও তালিকায় আছেন সনাৎ জয়াসুরিয়া ও ড্যানিয়েল ভেট্টোরি।

উইকেটের ডাবল সেঞ্চুরি পূরণের দিন অলরাউন্ডার হিসেবে আরেকটি গৌরবের 'ডাবল' পূরণ করেছেন সাকিব। ঢুকে পড়েছেন রেকর্ড বইয়ের আরও এক অধ্যায়ে। ওয়ানডেতে সাকিবের রান ৪ হাজার ৩৮২। চার হাজার রান ও দুই শ উইকেটের 'ডাবল' এর আগে ছিল মাত্র ছয় ক্রিকেটারের। জয়াসুরিয়া, ক্রিস হ্যারিস, ক্রিস কেয়ার্নস, জ্যাক ক্যালিস, শহীদ আফ্রিদি ও আবদুল রাজ্জাকের (পাকিস্তানের সাবেক অলরাউন্ডার)। এই ছয়জনের মাত্র দুজন কিন্তু স্পিনার- জয়াসুরিয়া ও আফ্রিদি। এঁদের মধ্যে সাকিবের অর্জন একদিক দিয়ে অনন্য। কারণ, এ মাইলফলক ছুঁয়েছেন ১৫৬ ওয়ানডে খেলে। এত দ্রুত এ 'ডাবল'-এর রেকর্ড গড়তে পারেননি কেউ।

হাই ফাইভ, থ্রি চিয়ার্স ফর টু হানড্রেড ক্লাব!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদা পোশাকেও রঙিন মুস্তাফিজ

চট্টগ্রাম টেস্টে তাঁর অভিষেক হচ্ছে এ আভাস আগেই মিলেছিল। পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখা। এরপর ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে কাটারের কচুকাটা দিয়ে আলোচনায়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও ওয়ানডেতে ভালো করার পুরস্কার পেলেন টেস্ট একাদশে জায়গা নিয়ে।

কিন্তু সংশয় জাগল, এত তাড়াতাড়ি টেস্টের কঠিন সমুদ্রে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে? বয়স মাত্র ১৯। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটই খেলছেন মাত্র কদিন হলো। শারীরিকভাবেও শক্তপোক্ত হননি। পাঁচটি দিনের টেস্ট যে আসলেই কঠিন এক 'টেস্ট', অগ্নিপরীক্ষা।

প্রথমে টানা ১৩ ওভার উইকেটশূন্য। কিন্তু এরপরই দেখা গেল জাদু। এক ওভারের জাদু। ৭৮ বলের অপেক্ষা শেষে ১৪তম ওভারের প্রথম বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ বানালেন হাশিম আমলাকে। পরের বলটা সুইং করল। জেপি ডুমিনি লাইন মিস করলেন। বল লাগল প্যাডে। জোরালো এলবিডব্লুর আবেদনে সাড়া দিলেন না আম্পায়ার। রিভিউ নিল বাংলাদেশ দল। এলবিডব্লুর আবেদনের বিরুদ্ধে রিভিউ নিলে সম্ভাবনার হার কম থাকে। কিন্তু হক আইতে যা দেখা গেল, তাতে আম্পায়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে পারলেন না।

পরপর দুই বলে দুই উইকেট। টেস্ট অভিষেকেই হ্যাটট্রিকের সামনে মুস্তাফিজ! টেস্ট ইতিহাসে অভিষেকে হ্যাটট্রিকের রেকর্ড মাত্র

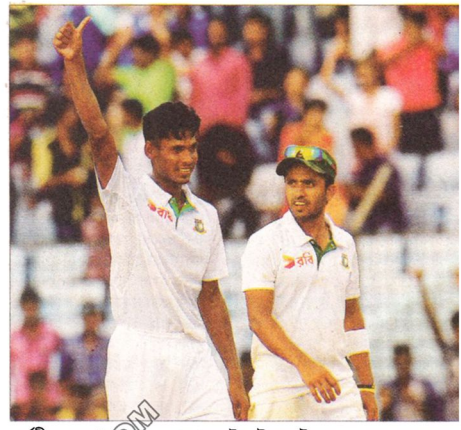

তর্জনী নয়, এখন থেকে বুড়ো আঙুলেই হাউস দ্যাট!

তিনজনের—মরিস অ্যালম, পিটার পেথেরিক ও ডেমিয়েন ফ্লেমিংয়ের। সেই তালিকায় নাম উঠবে তো মুস্তাফিজের? অলক কাপালি আর সৌহাগ গাজীর পাশে উঠবে তাঁর নাম?

তৃতীয় বলটাও দারুণ হলো। কিন্তু হ্যাটট্রিক বলটা কোনোমতে ঠেকিয়ে দিলেন ডি কক। অবশ্য চূড়ান্ত সর্বনাশ ঠেকাতে পারলেন না। এক বল পরেই ককের অফ স্টাম্প উড়িয়ে দিলেন মুস্তাফিজ। কেবল স্টাম্প উড়ছিল না, উড়ছিল গোটা বাংলাদেশ দলই!

এ দফা হ্যাটট্রিক না হলেও রেকর্ড বইয়ের আরেকটি অধ্যায়ে নাম লিখিয়েছেন মুস্তাফিজ। টেস্টের ১৩৮ বছরের ইতিহাসে চার বলে তিন উইকেট নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে মাত্র ৩৭ বার। কৃতিত্বটি যে কত বিরল, সেটা বোঝা যাবে আরেকটি তথ্যে। চার বলে তিন উইকেট নেওয়ার (হ্যাটট্রিক বাদে) আগের ঘটনাটি ছিল ১৮ বছর আগের।

মুস্তাফিজ সেটাই করেছেন অভিষেকে। অভিষেকে চার বলে তিন উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব এর আগে ছিল মাত্র তিনজনের।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার দিন থেকেই একের পর এক রেকর্ড আর অর্জনের পাশে নাম লেখাচ্ছেন। মুস্তাফিজের এই অর্জনের তালিকায় পরে যোগ হয়েছে ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডে ও টেস্ট অভিষেকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হওয়ার গৌরব।

মুস্তাফিজ-নামা

- ওয়ানডে সিরিজে অভিষেকে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার যৌথ বিশ্ব রেকর্ড
- ৩ ম্যাচের সিরিজে অভিষেকে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার একক বিশ্ব রেকর্ড
- ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার একক বিশ্ব রেকর্ড
- ব্রায়ান ভিটোরির পর ওয়ানডে ইতিহাসের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ক্যারিয়ারের প্রথম দুই ম্যাচেই ইনিংসে ৫ উইকেট
- প্রথম দুই ম্যাচে ১১ উইকেট। ক্যারিয়ারের প্রথম দুই ওয়ানডেতে এটাই সর্বোচ্চ, ভিটোরির ছিল ১০ উইকেট
- অভিষেকেই বাংলাদেশের পক্ষে দ্বিতীয় সেরা বোলিং
- ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডে ও টেস্ট অভিষেকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ

রাজীব হাসান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণ আফ্রিকায় সিরিজ জিতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল

অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে

নাইর ইকবাল

পিনাক ঘোষ নামের ছেলেটি কিন্তু এরই মধ্যে পরিচিতি পেয়েছে বিশ্বব্যাপী। কিন্তু এই ছেলেটির এখনো খেলা হয়নি বাংলাদেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। ক্রিকেট ইতিহাসে ১৫তম অনূর্ধ্ব-১৯ বর্ষীয় ক্রিকেটার হিসেবে এই পিনাক দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে খেলেছে ১৫০ রানের অনবদ্য এক ইনিংস। ক্রিকেটের রেকর্ড বলছে এবি ডি ভিলিয়ার্স, ক্রিস গেইল কিংবা রোহিত শর্মাদের মতো মারকুটে ব্যাটসম্যানরা তাঁদের উনিশের যৌবনে যা পারেননি, বাংলাদেশের নেত্রকোনার ছেলে পিনাক ঠিক সেটাই করে দেখিয়েছেন।

বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় ক্রিকেট দল সাম্প্রতিক কালে দারুণ হইচই ফেলে দিয়েছে চারদিকে। বাংলাদেশে তো বটেই, গোটা ক্রিকেট দুনিয়াতেই দেশের যুব ক্রিকেটারদের নিয়ে কথাবার্তা। কিছুদিন আগেই দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে নাস্তানাবুদ করা এই দলটি ফিরতি সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেও ছেলেখেলা করেছে প্রোটিয়া যুবাদের নিয়ে। ক্রিকেট দুনিয়ার অন্যতম সেরা দল এই দক্ষিণ আফ্রিকা। দেশটির উঠতি ক্রিকেটাররাও বেড়ে ওঠে আকাশচুম্বী সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়ে। সেই দক্ষিণ আফ্রিকার আগামীর তারকারাই কিনা নিয়মিত হারছে আমাদের ছেলেদের কাছে! ডারবান-কেপটাউন-জোহানেসবার্গ-প্রিটোরিয়া-বুমফনটেইন কিংবা কিম্বার্লির শক্ত-বাউন্সি উইকেটে, যেখানে এখনো উপমহাদেশের তাবৎ বাঘা ক্রিকেটারের চোখের পানি, নাকের পানি একাকার করে দেয়, সেখানেই কিনা নেত্রকোনার পিনাকের ব্যাট থেকে আসে ১৫০ রানের প্রত্যয়দীপ্ত ইনিংস! পুরো বিষয়টিই কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেটের আগামী দিনের স্বর্ণালি সময়ের ঘোষণাটা বড় গলায় দিয়ে দেয়। ক্রিকেট দুনিয়া সাবধান, উঠে আসছে বাংলাদেশের আগামী দিনের ব্যাঘ্র-শাবকেরা।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ক্রিকেট যে সৌম্য সরকারের ব্যাটের ঝলকানিতে আলোকোজ্জ্বল, সেই সৌম্য সরকারের শুরুর গল্পটা কিন্তু ওই অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়েই। কেবল সৌম্যর কথাই বলা কেন, হালের বোলিং সেনসেশন মুস্তাফিজুর রহমান এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত প্রতিনিধিত্ব করেছেন যুব দলের হয়ে। সৌম্য সরকারের কথায় আবারও ফেরত আসা যাক। এই সৌম্যর আছে যুবদলের হয়ে এক অনন্য ব্যাটিং-গাথা। ২০১২ সালের যুব এশিয়া কাপে এই সৌম্যই দুর্বল কাতারকে সামনে পেয়ে খেলেছিলেন ২০৯ রানের এক ইনিংস। প্রতিপক্ষ কাতার হওয়ার কারণেই খেলাটি অফিশিয়াল মর্যাদা পায়নি। নয়তো যুব ক্রিকেটের বিশ্ব ইতিহাসে এই সৌম্যই হতেন একমাত্র ব্যাটসম্যান, যাঁর ঝুলিতে আছে রোহিত শর্মা, বীরেন্দর শেবাগ কিংবা শচীন টেন্ডুলকারদের মতো ৫০ ওভারের ম্যাচে ডাবল সেঞ্চুরি। একই বছর অস্ট্রেলিয়ায় যুব বিশ্বকাপে এনামুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০১৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে একটি ম্যাচ জয়ের পর। ছবি : এএফপি

হক বিজয় কিংবা তাসকিন আহমেদরা কিন্তু জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের আগমনী বার্তা।

যেকোনো দেশের খেলাধুলা যদি উন্নতির পথে হাঁটতে চায়, তাহলে বয়সভিত্তিক দলগুলোকে যত্ন না করার কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর প্রায় সব দেশই বিভিন্ন খেলায় এই বয়সভিত্তিক দলগুলোকে অতি যত্নের সঙ্গে গড়ে তোলে। অন্য কোনো খেলায় না হলেও বাংলাদেশের ক্রিকেট-সংশ্লিষ্টরা দেশের ক্রিকেট উন্নয়নে এই বয়সভিত্তিক প্রতিভার লালনে দিয়েছে বিশেষ দৃষ্টি। বয়সভিত্তিক দলগুলোর পেছনে আমাদের ক্রিকেট সংগঠকেরা অর্থ ঢালছেন, বিদেশ থেকে আনা হচ্ছে উন্নতমানের কোচ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা প্রতিভাবান

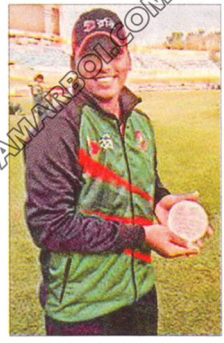

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৫০ করে হইচই ফেলে দিয়েছেন পিনাক ঘোষ। ছবি : এএফপি

ক্রিকেটারদের যেন পড়াশোনা বা অন্যান্য আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে ভাবতে না হয়, সেই ব্যবস্থাও তাঁরা করেছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অনেক যত্ন দিয়ে যে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রিকেট একাডেমি গড়ে তুলেছে, বছরের পর বছর ধরে চলছে সেখানে তরুণ প্রতিভার পরিচর্যা। দেশের ক্রিকেট বোর্ডের এই আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল আমরা অনেক আগে থেকেই পাওয়া শুরু করেছি। সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রয়াস যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে মহামূল্য সব মণি-মুক্তো। সৌম্য, মুস্তাফিজ, এনামুল কিংবা তাসকিনদের মণি-মুক্তোর সঙ্গে তুলনা তো করাই যায়।

বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সাফল্যের পথচলাও কিন্তু ঈর্ষণীয়। এরই মধ্যে 'ছোট বাঘেরা' আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি সমীহ জাগানিয়া একটি দলেই পরিণত হয়েছে। বড়দের অনেক আগেই যুবারা পেয়েছে বিশ্ব যুবকাপের সাফল্যের ছোঁয়া। আমাদের যুবাদের কাছে হেরেছে বিশ্বের প্রায় সব ক্রিকেট শক্তির যুবদলই। দক্ষিণ আফ্রিকা তো বটেই, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশের যুবদল নিয়মিতই হেরেছে বাংলাদেশের কাছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ দল ১০০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ জয়ের সাফল্য পেয়ে গেছে। বাংলাদেশের যুবারা ক্রিকেট দুনিয়ায় একটি সত্য দারুণভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছে—এ দেশ সত্যিকার অর্থেই সহজাত ক্রিকেট প্রতিভার উর্বর ভূমি।

এ দেশের ক্রিকেটের আগামী প্রজন্ম কতটা শক্তিশালী সেটা রেকর্ডপত্র বিশ্লেষণ করলেই

প্রতিভার জোগানদাতা

বয়সভিত্তিক দলগুলো সব সময়ই আশীর্বাদ হয়ে এসেছে বাংলাদেশের ক্রিকেটে। বলা যায় এই বয়সভিত্তিক কার্যক্রম বিরামহীনভাবে প্রতিভার সন্ধান দিয়ে গেছে এ দেশের ক্রিকেটকে। বয়সভিত্তিক দলগুলো বাংলাদেশের ক্রিকেটকে কী দিয়েছে, সেটা বোঝা যাবে ছোট্ট একটি উদাহরণেই, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ১৬ অধিনায়কের নয়জনই বয়সভিত্তিক দলের আবিষ্কার। আমিনুল ইসলাম, নাঈমুর রহমান, খালেদ মাসুদ, খালেদ মাহমুদ, হাবিবুল বাশার, মোহাম্মদ আশরাফুল, মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান, মাশরাফি বিন মুর্তজা—সবাই এসেছেন বয়সভিত্তিক দলে খেলে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর এখন পর্যন্ত প্রায় সব অধিনায়কের জোগানদাতাই ক্রিকেটের এই প্রজন্ম তৈরির কার্যক্রম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সিরিজ জয়ী বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ছবি : দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড

প্রমাণিত হয়ে যায়। যুবারা সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ১২টি ওয়ানডে ম্যাচের ১১টিতেই জয় পেয়েছে। এখন পর্যন্ত ২১টি দেশের সঙ্গে খেলে জয় পেয়েছে ২০টিতেই। ১১টি দেশ কখনোই বাংলাদেশের সঙ্গে জিততে পারেনি। পরিসংখ্যানই তো বলে দিচ্ছে ক্রিকেটে কী তীব্র হুংকার ছেড়েই না উঠে আসছে বাংলাদেশ।

এত কিছুর পরেও যুব বিশ্বকাপটা কেন যেন দুঃখই দিয়ে যায় বাংলাদেশকে। ছোটদের বিশ্বকাপের শিরোপার স্বপ্ন থাকলেও সেটা কেন যেন কখনোই সত্য বানাতে পারেনি বাংলাদেশ। ২০০৬ সালে মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসানদের দলটিই এই প্রতিযোগিতায় এনেছিল সর্বোচ্চ সাফল্য। বাংলাদেশ পেয়েছিল পঞ্চম স্থানটা। দক্ষিণ আফ্রিকাকে নাকানি-চুবানি খাওয়ানো পিনাক ঘোষদের নতুন বাংলাদেশ আগামী বছর দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত যুব বিশ্বকাপটা ছুঁয়ে দেখুক—এই প্রার্থনা শুরু হয়ে গেছে এখন থেকেই।

সৌম্য, মুস্তাফিজ, এনামুল, মুমিনুল, তাসকিনদের মতোই আগামীর তারকা হতে উঠে আসছেন এই পিনাক ঘোষরা। সঙ্গে আছেন আরও বেশ কয়েকজন তরুণ প্রতিভা, যাঁদের নিয়ে ইতিমধ্যেই ভাবতে শুরু করেছেন এ দেশের ক্রিকেট-বোদ্ধারা। বর্তমান যুবদলের নাজমুল হোসাইন শান্ত, সাদমান ইসলাম, মেহেদি হাসান মিরাজ,

আগামীর 'মাশরাফি' মেহেদি হাসান!

দক্ষিণ আফ্রিকায় অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় দলের সাফল্যের কান্ডারি ছিলেন মেহেদি হাসান মিরাজ। তাঁর অধিনায়কত্বে বিশ্ব যুবকাপ জয়ী প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ৫-০ অসাধারণ সাফল্যের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ যুব ক্রিকেট দল। খুলনায় জন্ম নেওয়া এই তরুণ ক্রিকেটার হয়ে উঠেছেন আগামী দিনের মাশরাফি। হতে চান কী, অনেকটা তা-ই হয়েই গেছেন। মাশরাফির নেতৃত্বে জাতীয় দল যেমন পাচ্ছে একের পর এক সাফল্য, ঠিক তেমনি মেহেদির নেতৃত্বেও সাফল্যযাত্রায় আছে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। ২০১৩ সাল থেকে তিনি আছেন যুবদলের নেতৃত্বে। সেবারই ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে সাফল্য, ৪-৩-এ সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। সাত ম্যাচে ১২৭ রান আর ১৩ উইকেট নিয়ে নিজেকে দারুণভাবেই প্রমাণ করেছিলেন এই মিরাজ।

জয়রাজ, সাইফউদ্দিনদের অনেকেই ভাবছেন আগামীর তারকা। খুব তাড়াতাড়িই হয়তো মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান কিংবা সৌম্য সরকার ও মুস্তাফিজদের মতো এই তরুণেরাও এ দেশের ক্রিকেটের গর্বের পতাকাটা নিজের কাঁধে তুলে নেবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭	৮			২	৬		৯	৫
৫					১		৬	
৬			৯	৮	৫		১	৩
৪		৭		৯	২			১
৩		৮	১		৪			৬
	২		৬			৯	৪	৮
২		৪	৫	১	৩	৬	৮	
৯		৩					২	
৮	১	৬	২		৯	৫	৩	

সুডোকু ২৩

প্রতিটি কলাম, সারি ও ছোট বর্গে (৩x৩) ১ থেকে ৯ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা একবার বসাতে হবে। নিশ্চিত হয়ে নিচের ঘরগুলোতে সংখ্যা বসাও। প্রয়োজনে পেনসিল ব্যবহার করতে পারো।

সুডোকু ২২-এর উত্তর

৪	৩	১	৫	৯	৭	৬	৮	২
২	৭	৯	৬	৪	৮	১	৫	৩
৬	৮	৫	১	২	৩	৯	৭	৪
৫	৬	৪	৩	১	৯	৭	২	৮
৩	২	৭	৮	৫	৬	৪	১	৯
৯	১	৮	৪	৭	২	৫	৩	৬
৮	৪	৩	৭	৬	১	২	৯	৫
৭	৯	৬	২	৮	৫	৩	৪	১
১	৫	২	৯	৩	৪	৮	৬	৭

কিসের ছবি ২১

এবারের পর্বটি সাজানো হলো সেকাল-একালের বার্তা প্রদানসংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে। নিচের ছবি দেখে বলো কোনটি কিসের ছবি। যদি না পারো, তাহলে এলোমেলো করে লেখা বর্ণগুলো সাজিয়ে নাও। তাহলেই নামগুলো জানতে পারবে।

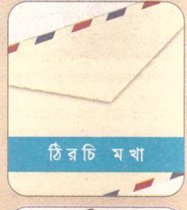

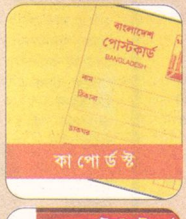

কিসের ছবি ২০-এর উত্তর

বেলি, বজ্রপাত, রেইন কোট, বন্যা, কদম, নৌকা, ছাতা, বৃষ্টি, জামরুল

গল্প পড়ো উত্তর দাও ১২-এর উত্তর

২. একবারে বেশি অর্জন করার চেষ্টা ভালো নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার শব্দ খোঁজো ১৩

থাকব নাকো ___ ঘরে
____ এবার জগৎটাকে
কেমন করে ___ মানুষ
____ ঘূর্ণিপাকে।

কবিতার শব্দ খোঁজো ১২-এর উত্তর

১. ফুল, ২. কদম, ৩. ঘোড়া, ৪. সোনামণির

বুদ্ধির ব্যায়াম ২৩

১. রনি কিছু আপেল কিনেছিল। আপেলগুলোর তিন ভাগের এক ভাগ সেদিন খেল রনি। পরদিন খেল বাকি আপেলের অর্ধেক। সোমবার আর মঙ্গলবার খেল একটি একটি করে। বুধবার খেল বাকি আপেলের অর্ধেক। আর বৃহস্পতিবার দেখা গেল তখনো একটা আপেল বাকি রয়েছে। রনি আপেল কিনেছিল কয়টি?

২. পাশাপাশি দুটি আমগাছে কয়েকটি টিয়াপাখি বসে। প্রথম গাছ থেকে একটি টিয়া যদি দ্বিতীয় গাছে গিয়ে বসে তাহলে দুই গাছেই টিয়ার সংখ্যা হবে সমান সমান। কিন্তু দ্বিতীয় গাছ থেকে যদি একটি টিয়া প্রথম গাছে বসে, তাহলে দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথম গাছে টিয়াপাখির সংখ্যা হবে দ্বিগুণ। কোন গাছে কয়টি টিয়াপাখি আছে?

৩. ধরো, তোমার কাছে এমন একটি প্যান আছে, যাতে একসঙ্গে দুটি রুটি সেঁকা যায়। একটা রুটির এক পিঠ সেঁকতে সময় লাগে এক মিনিট। তাহলে তিন মিনিটে তিনটি রুটির দুই পিঠ কীভাবে সেঁকা যাবে?

বুদ্ধির ব্যায়াম ২২-এর উত্তর

১. ২ নম্বর গ্লাসটা তুলে তার পানি ৫ নম্বর গ্লাসে ঢেলে দিয়ে আবারও আগের জায়গা রেখে দাও। ২. মাসে শূন্যবার। কারণে মাসে ন অক্ষরটি নেই। ৩. চারটে। সব কটিই একটা করে আছে।

AMARBOI.COM

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে... ৭

১. বিজ্ঞানী ফিলিপ অ্যান্ডারসন কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?
২. প্রজাপতি প্রকাশনের যাত্রা শুরু হয় কবে?
৩. ওয়াগনার ফন্ট্রোম্পারকটের পেশা কী?
৪. শুঁটকি টেরি চরিত্রটি থ্রি ইনভেস্টিগেটরসের কোন চরিত্র থেকে নেওয়া হয়েছে?
৫. বাংলাদেশের কোন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর ডাকনাম লালমিয়া?

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে ৬-এর উত্তর ১. জিমন্যাস্টিক, ২. ডিসি-০৭, ৩. সুফিয়া কামাল, ৪. ১৯৮৮ সালে।

কুইজের উত্তর চাইলে সব একসঙ্গে পাঠাতে পারো, অথবা তুমি যেগুলোর উত্তর পারো, সেগুলো আলাদা করে আলাদা কাগজেও লিখে পাঠাতে পারো। আগে কাগজে বড় করে কুইজের নাম লিখে পরে উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম-ঠিকানা লিখতে হবে। খামের ওপরে প্রথমে বড় করে লিখতে হবে 'কুইজ', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। আর যে কুইজই পাঠাও না কেন, নিচের ফরমটি পূরণ করে কেটে পাঠাতে হবে অবশ্যই। এই ফরম ছাড়া কুইজের উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে কুইজ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবে রকমারি ডটকমের সৌজন্যে **২০০ টাকার বই**। কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ **২০ আগস্ট ২০১৫**।

নাম ....

বয়স .... শ্রেণি.................. ফোন ....

স্কুল-কলেজ ....

ঠিকানা ....

এখানে কাটো

পাঠাবে এই ঠিকানায়

কুইজ, কিশোর আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দজব্দ ২৩

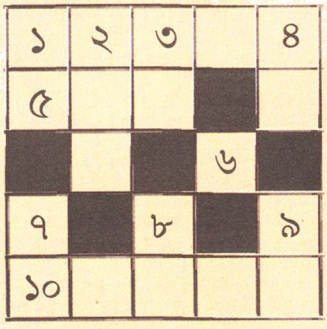

ওপর-নিচ : ১. টাকা, অঙ্গভঙ্গি; ২. বাংলাদেশের একজন নারী ফুটবলার; ৩. বাঁকা; ৪. প্রামাণিক কাগজপত্র, রবিন মিলফোর্ডের নামবিশেষ; ৭. শিরোস্ত্রাণ; ৮. গাত্রচর্ম, ছাল, বাকল; ৯. পাপ, অপরাধ।

পাশাপাশি : ১. *তিন গোয়েন্দার* অন্যতম চরিত্র; ৫. প্রাচীন ভারতের একটি জাতি; ৬. ঘৃত, দুধ থেকে তৈরি স্নেহজাতীয় পদার্থ; ১০. বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের একজন ব্যাটসম্যান।

তোমরাও চাইলে এমন ৫x৫ ঘরের শব্দজব্দ তৈরি করে পাঠাতে পারো কিশোর আলোর ঠিকানায়।

শব্দজব্দ ২২-এর উত্তর

AMARBOI.COM

কিআ জুলাই সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

তোমাদের পাঠানো অনেক উত্তরের মধ্য থেকে লটারিতে এই ২৬ জনের নাম উঠে এসেছে। তোমরা প্রত্যেকে পাবে ব্লকমারি -এর সৌজন্যে ২০০ টাকার বই।

সুডোকু
- **আরমান হোসেন,** যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা
- **অদিতি বৈরাগী,** ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ঢাকা
- **সুদীপ্ত কুমার নাগ,** সরকারি এমএম সিটি কলেজ, খুলনা

কবিতার শব্দ খোঁজো
- **নয়ন দেবনাথ,** ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, সিলেট
- **মো. জালিচ মাহমুদ,** মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা
- **কিণ্ডেক চক্রবর্তী,** রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

বুদ্ধির ব্যায়াম
- **চৌধুরী মাহির মুহিবুল্লাহ,** টিআ্যান্ডটি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা
- **সুস্মিতা সরকার,** রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- **সারাহ্ মাযরুবা,** বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

শব্দজব্দ
- **শর্মিষ্ঠা ঘোষ,** হলি ক্রস বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা
- **আনিকা নওশীন,** ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা
- **অদিতি ঘোষ,** রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

সাহিত্য ধাঁধা
- **সিরাজুল আরিফিন,** সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, সাতক্ষীরা
- **নাসিম সারওয়ার,** দক্ষিণ সন্দ্বীপ উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
- **ইশরাত জাহান,** আর সি পি আই পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর

কবিতার শব্দ খোঁজো
- **লুসিয়া যূথিকা কুইয়া,** হলি ক্রস বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা
- **মো. রায়হান গনি,** সেন্ট মেরিস স্কুল, চট্টগ্রাম
- **মেহেদী হাসান,** বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমি, কক্সবাজার

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে
- **মো. মমিনুর রহমান,** চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
- **সামিহা তাসনীম,** অ্যাবাক পাবলিক স্কুল, ঢাকা
- **মাবরুর খান চৌধুরী,** শহীদ বাবুল একাডেমি, ঢাকা

ধাঁধা
- **রামিসা মুসাব্বরাত,** ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম
- **নাফিসা আহমাদ নাওয়ার,** কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কক্সবাজার

গল্প পড়ো উত্তর দাও
- **রেহান খান,** কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ
- **ফাহমিদা জান্নাত,** রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী
- **নুদরাত তাহিয়া,** সূর্যমুখী কিন্ডারগার্টেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সবাইকে অভিনন্দন। অচিরেই তোমাদের ঠিকানায় পৌঁছে যাবে পুরস্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প পড়ো উত্তর দাও ১৩

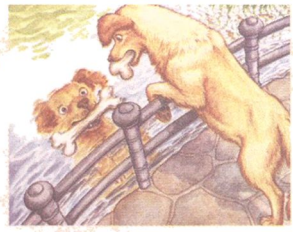

একটি কুকুর মুখে এক টুকরো গোশত নিয়ে সেতু পার হচ্ছিল। হঠাৎ সে নিচে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। সে ভাবল, আরেকটা কুকুর বুঝি মুখে আরেক টুকরা গোশত নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরটা প্রতিবিম্বের মুখ থেকে গোশতটা কেড়ে নেওয়ার জন্য ঘেউ ঘেউ করতে করতে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সে তার প্রতিবিম্বকে তো স্পর্শ করতে পারলই না, বরং নিজের মুখের টুকরোটিও হারাল।

এই গল্প থেকে আমরা কী শিখলাম?

১. অতি লোভ ভালো নয়।
২. কুকুরেরা বোকা হয়।
৩. গোশত খাওয়া ভালো নয়।
৪. মারামারি করলে ডাঙায় করতে হয়, পানিতে নয়।

ধাঁধা ২৩

১. এতটুকু মিঠাই
ঘর ভরে ছিটাই।

২. পাহাড়ের দুই ধারে দুই ভাই।
কারও সাথে কারও দেখাদেখি নাই।

৩. একই বৃত্তে তিন ভাই খেলে,
ছোট ভাই দ্রুত চলে।

ধাঁধা ২২-এর উত্তর

১. ল বর্ণ ২. ঝাঁটা ৩. রমজান মাস।

সাহিত্য ধাঁধা ২৩

১. 'বুক পকেটে জোনাকিপোকা' বইটি কে লিখেছেন?
২. 'ডেভিড কপারফিল্ড' চরিত্রটি কার সৃষ্টি?
৩. 'জর্জ ডেইল' কার ছদ্মনাম?

সাহিত্য ধাঁধা ২২-এর উত্তর

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২. পাঁচকড়ি দে ৩. চাইল্ড উইসপার।

AMARBOI.COM

কিআ

কিশোর আলোর
এক বছরের গ্রাহক হও

৬০০ টাকায় বিনা ডাকখরচে গ্রাহকের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হবে পরবর্তী ১২টি সংখ্যা। সঙ্গে বিনা মূল্যে পাবে স্টিকার ও রিস্টব্যান্ড।

প্রাপকের নাম ....
পূর্ণ ঠিকানা ....
....
টেলিফোন..............................
নগদ/ ডিডি (বরাবর : মিডিয়া স্টার) ৬০০ টাকা (ছয় শ টাকা মাত্র)
ডিডি নম্বর .... তারিখ ....

অথবা আমাদের বিকাশ নম্বরে (০১৭৮৭১৯৯৮৯৭) ৬০০ টাকা পাঠাও। তারপর ওই একই নম্বরে আলাদা একটি এসএমএসে তোমার নাম, পূর্ণ ঠিকানা, ফোন নম্বর ও বিকাশ ট্রানজেকশন আইডি পাঠিয়ে দাও। এই কুপনের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য।

যোগাযোগ
কিশোর আলো গ্রাহক চাঁদা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১। ফ্যাক্স : ৯১২১০৫২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ারালোভী কাঠবিড়ালি

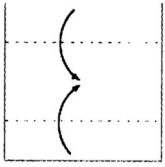

১ একটি বড় আকারের বর্গাকার কাগজ নাও। চিত্রের মতো ডটলাইন বরাবর কাগজটি ভাঁজ করে, তিরচিহ্নিত মাঝলাইন বরাবর মিলিয়ে নাও।

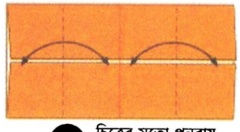

২ চিত্রের মতো পুনরায় দুই পাশ থেকে ডটলাইন বরাবর ভাঁজ করে মাঝের লাইনে মিলাও। আবারও ভাঁজ ফিরিয়ে নাও।

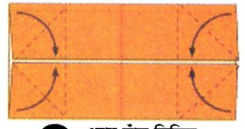

৩ এবার ভাঁজ ফিরিয়ে নেওয়া দুপাশের ত্রিভুজাকার অংশ চারটি তিরচিহ্ন বরাবর মাঝলাইনে এনে মিলাও।

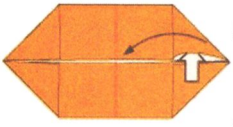

৪ মোটা তিরচিহ্নিত অংশটির ভাঁজ খুলে খাড়া করে ধরো। এবার খাড়া অংশটি নিচের দিকে চাপ দিয়ে এমনভাবে মিশিয়ে নাও, যাতে মাঝলাইন স্পর্শ করে।

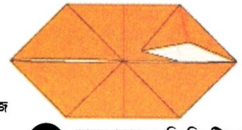

৫ অনুরূপভাবে বাকি তিনটি অংশও খোলো এবং চাপ দিয়ে এমনভাবে মিশিয়ে নাও, যাতে কাগজটি হবে ৬ নম্বর চিত্রের মতো।

AMARBOI.COM

৬ এবার ডটলাইন বরাবর তিরচিহ্নিত অংশ দুটি পেছনের দিকে ভাঁজ করো।

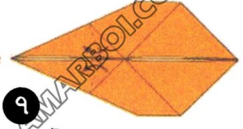

৭ এবার ডটকৃত অংশ দুটি তিরচিহ্ন বরাবর ভাঁজ করো।

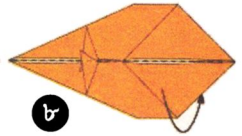

৮ মাঝ বরাবর পুরো কাগজটিই অর্ধেক ভাঁজ করো।

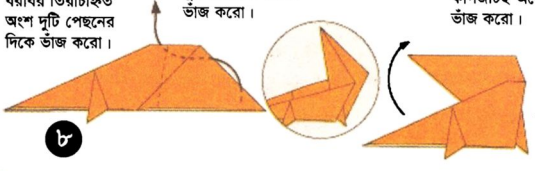

৮

৯ কাগজটি ঘুরিয়ে নাও।

১০ ওপরের ডটকৃত অংশটি ডটলাইন বরাবর ভাঁজ করে নিচে নামাও।

১১ এবার মাথার ছোট ডটকৃত অংশটি বাঁকিয়ে ভেতরের দিকে ভাঁজ করো।

১২ নিচের ডটকৃত অংশটি বাঁকিয়ে ভেতরের দিকে ভাঁজ করো।

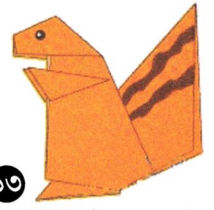

১৩ সবশেষে রঙের ছোঁয়ায় দুপাশে দুটি চোখ ও ডোরাকাটা লেজ বানিয়ে নাও। ব্যস, বানিয়ে ফেললে এগাছে-ওগাছে টইটই করে লাফিয়ে চলা কাঠবিড়ালি!

গ্রন্থনা : **এম এ হান্নান**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~